সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य आंगन // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889 Vol : VI, Issue : XIV 31 July 2021

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

প্রযত্নে ঃ বি. এন. ঘোষ

শিমূল ডিহি, তেলিপাড়া, হীরাপুর,

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal

ISSN : 2394 4889 Vol. VI, Issue : XIV, 31July 2021

Chief Editor :
Dr. Jaygopal Mandal

© Publisher

Type Setting :
Manik Sahu
Mob : 9830950380 / 9433157172

Printing and Binding :
Ekush Satak

Price : 250.00

Published By :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A.
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-828127
Phone : 09830633202 / 09570217070
E-mail : joygopalvbu@gmail.com,
sahityaangan@gmail.com
Website : www.sahityaangan.com

Advisory Board :

Prof. Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam
Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata
Prof (Dr) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.
Amar Mitra, (Katha Sahityik: Bankim & Ananda Awarded)
Nalini Bera (Katha Sahityik. Bankim & Ananda Awarded)
Professor (Dr.) Bikash Chandra Paul, Dept. of Bengali, University
Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata
Tapas Roy (Poet & Kathasahityik), Kasba, Kolkata

Members from the other Countries :

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh) Afroza Shoma (Dhaka, Bangladesh)
Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

Assistant Editor :

Dr. Samaresh Bhowmik, Associate Professor, Dept. of Bengali, Yogmaya Devi College, Kolkata
Dr. Mausumi Saha, Dept. of Bengali, Chakdaha College, Nadia
Dr. Kutub Uddin Molla, Dept. of Bengali, Singur Govt. College, W.B.

Working Editorial Board :

Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata
Dr. Soma Bhadra Roy, Associate Professor, West Bengal State University, West Bengal
Dr. Sampa Basu, Associate Professor, Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure
Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.
Dr. Nabanita Basu, Assistant professor, Singur Govt. College, West Bengal
Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata-84
Dipankar Arosh, Dept. of Bengali, B. C. College, Asansol
Panchanan Naskar, Scholar, Binod Bihari Mahto Koyalanchal University, Dhanbad
Swapan Kumar Paramanik, SACT, Magrahat College, Bankura

শ্রদ্ধার্ঘ্য গুরুশ্রেষ্ঠ ড. তাপস বসুকে : ব্রাহ্মমুহূর্ত

জয়গোপাল মণ্ডল

কিরে কেমন আছিস? তোর বাড়ি কোনটা?...... ঠিক আছে। ভালো আছিস তো?

ঘরশুদ্ধ একগাদা লোকের সামনে ঝুপ করে প্রণাম ঠোকে জয়। তারপর বহুদিনের অসাক্ষাতের স্বাদ মিটিয়ে গল্প শুরু। স্যার, আপনি কেমন আছেন আগে বলুন। বৌদি ভালো আছেন? আপনার শরীর আগের চেয়ে ভালো লাগছে।

আরে বোস।

না স্যার। ঠিক আছে।

বন্ধু কার্তিকের বাড়িতে গৃহপ্রবেশে জয়ের স্যার ড. তাপস বসু। সেই অনার্সের পাশের পর এই দেখা। খুব ভালো লাগছে। অদ্ভুত একটা আবেশ মনের গহনে অস্থির আনন্দ। মনে পড়ছে স্যারের আন্তরিকতা। স্বপনবাবু, গৌরমোহনবাবু এবং তাপসবাবুর ক্লাস ভোলার নয়। বিশেষ করে তাপসবাবুর পাঠদান আর স্বপনবাবুর ভাষাশৈলীর অমোঘ আকর্ষণ আজও চোখের সামনে যেন অনন্য চিত্রনাট্য। কিরে, কী ভাবছিস?

না স্যার কিছু না। মনে পড়ছে আগের কথা। চলুন স্যার আমার বাড়িতে। জাস্ট দুটো বাড়ির আগে।

চল। এই ভিড়ে কী আর করব। প্রসাদ খেয়েছি। আর কিছু খাব না। কার্তিককে ডাক।

এ্যাই কার্তিক, স্যার আমার বাড়ি যাচ্ছেন। দৌড়ে এল সে।

স্যার একটু খেয়ে যান।

না রে, প্রসাদ খেলাম তো।

স্যার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে দীক্ষিত। রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ নিয়ে তাঁর ডি. লিট। সাধারণভাবে স্পাইসি খাবার ছুঁয়ে দেখেন না। স্যারের উষ্ণ সান্নিধ্যে জয়ের মন উচাটন। বাইরে থেকে চিৎকার করে সোনাই, দরজা খোলো, আমার স্যার এসেছেন।

একেবারে সাদামাঠা এক শিক্ষিকা মঞ্জুশ্রী। সেও পূর্ণাত্মানন্দের ভাবশিষ্য। কথায় কথায় মায়ের কথা উদ্ধৃত করে। স্যারের কথা সে আগেই শুনেছে। তাই তার অতিথি আপ্যায়নে আপত্তি নেই। আসলে মঞ্জুশ্রী যাকে পছন্দ হয় শুনে অথবা দেখে তার জন্য সময় দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। স্যারকে প্রণাম জানিয়ে বলে, স্যার বসুন, আমি আসছি।

আরে শোনো আমার জন্য কিছু করো না। আমি তো ওর বাড়িতে খেয়েছি। জয়গোপাল বোস। শোন, তোর পড়াশোনার কী খবর? যতসব আলতুফালতু ছেলেরা কলেজে ঢুকছে। আর তুই স্কুলে পড়ে থাকবি? পি এইচ ডি কর।

কার কাছে করব স্যার? মনোজ মিত্রের নাটক নিয়ে নির্মলেন্দুবাবুর কাছে করব বলে বেশ কিছুদিন ঘুরলাম। তারপর স্কুলে চাকরি পেয়ে এগোতে পারলাম না।

রেজিস্ট্রেশন হয়নি?

না স্যার।

আচ্ছা তোর এম ফিল-এর ডিসার্টেশন পেপার তো সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিয়ে?

হ্যাঁ স্যার।

আরে এই বিষয় তো এখন হটকেক। গত পরশু চলে গেলেন পদাতিক। ওনার ওপর এখনও কোনও কাজ হয়নি। তুই তো ওনার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলিস?

হ্যাঁ স্যার।

তাহলে কাজটা করে ফেল।

কার কাছে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে করব? সত্যবতীদিও কিছুদিন ঘোরালেন।

আমার কাছে কর। আগামী শনির সকালে তুই একটা সিনোপসিস করে চলে আয়। আমি ফর্ম তুলে আনব।

সেদিন স্যার কারেকশন করে দিলেন। তারপর আবার রবিবারে। সোমবার জমা এবং ঐদিনই বিভাগীয় রিসার্চ কাউন্সিলে পাশ। তারপর একটা শিশুকে যেভাবে মা কোলে তুলে খাওয়ান, হাতেখড়ি দেন, তারপর আকাশের সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র চিনিয়ে দেন সেভাবেই স্যারের হাত ধরে আকাশ ছুঁয়ে ফেলল। গবেষণার কাজ 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ঘর ও বাহির' শেষ, তারপর বই আকারে বইমেলায় কবি-অধ্যাপক তরুণ সান্যালের সৌর্যস্পর্শে মুক্ত হলো। প্রথমে সাহিত্য সরণির সম্পাদনা, তারপর সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকার লালন সবটাই ড. ডাপস বসুর আশীর্বাদ। সাহিত্য অঙ্গন পত্রিকার পঞ্চমবর্ষ পালন অনুষ্ঠান পালিত হয় বাংলা অকাদেমি সভাঘরে—ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় এই সময়ের ব্যতিক্রমী প্রাবন্ধিক অধ্যাপক ড. তাপস বসু মহাশয়কে। তাঁরই সৌজন্যে সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় ফলাও করে ছাপাও হয়।

গত ১ জানুয়ারি ২০২১ জয়গোপালের দীক্ষাগুরু আকাশে বিলীন হলেন শরীর নিয়ে। না। পুরোপুরি যেতে পারেননি। আত্মপ্রত্যয়ের আত্মা রয়ে গেল অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মণিকোঠায়। জয়গোপাল তাঁর প্রথম গবেষক ছাত্র।

হে গুরুশ্রেষ্ঠ তোমার চরণ তলে চিরকাল রেখো আপন সন্তানের মতো, রেখো বীতনিদ্র, সৃজনশীল কাজে আমরণ। এই যে দিয়ে গেছেন 'মুখের ফেনা তুলে', 'শেষ পালক ঝরানো অবদি' যেন ছন্দে বুনে যাই।

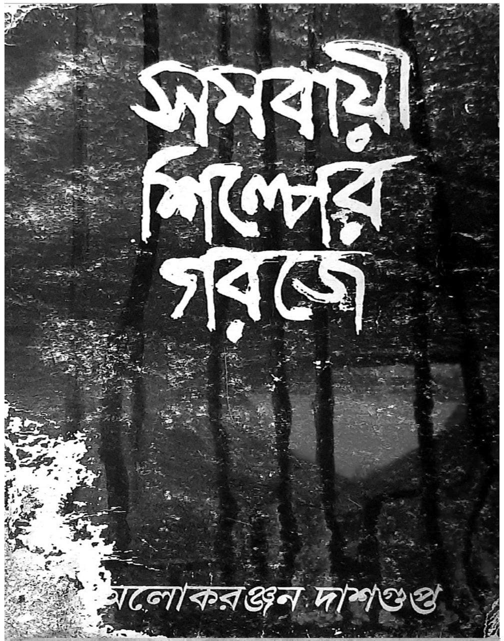

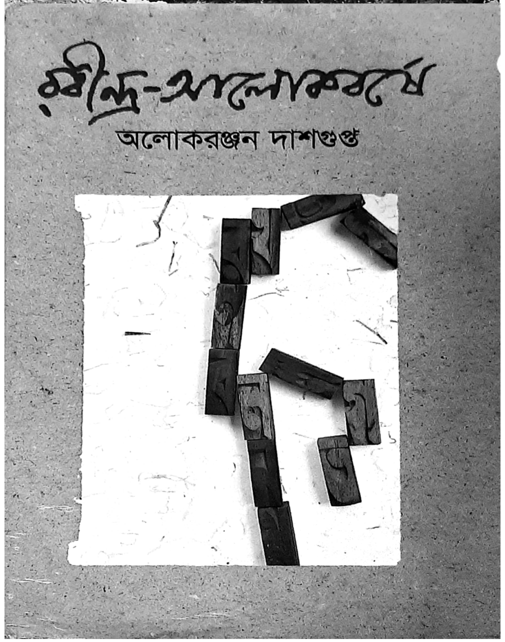

সূচি

সম্পাদকীয়, কবির কথায় 'বিভাব'		৯
'শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি'	শঙ্খ ঘোষ	১১
অলোকদা	পবিত্র সরকার	১৯
নব্য ভারতচর্যার উন্মেষ :		
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—বক্তৃতার বাংলা ভাষান্তর	রন্তিদেব সরকার	২৪
অলোকরঞ্জন : হয়তো একটু অন্যরকম	গণেশ বসু	৩০
অলোকরঞ্জনের সঙ্গে যেটুকু পরিচয়	সুমিতা চক্রবর্তী	৪৪
প্রবাসে, দৈবের বশে...	উদয়ন ভট্টাচার্য্য	৪৯
মৃত্যুত্তীর্ণ প্রহরের স্তব্ধতায় অলোকরঞ্জন	কালীকৃষ্ণ গুহ	৫৩
আলোকসামান্য অলোকরঞ্জন	সুজিত সরকার	৬৭
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : আবহমানের ভুবনে	জহর সেনমজুমদার	৭৪
অলোকরঞ্জনের কবিতা :		
ইকোলজির নন্দনতত্ত্ব	ঋতম মুখোপাধ্যায়	৮৩
পদধ্বনিময় আরাধনা :		
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতা	সুমন গুণ	৯১
ঈশ্বর-প্রকৃতি-মানুষের কবির রক্তে অমূর্ত		
আগুনের কথা : আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতা	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	১০৩
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা : পুনঃপাঠ	দেবকুমার সোম	১১০
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতাবৃত্তে	জয়গোপাল মণ্ডল	১১৫
বেলাশেষের গান	বরেন্দু মণ্ডল	১২৭
অলোকরঞ্জনের গোধূলিলগ্নের		
কবিতা : একটি মূল্যায়ন	সঞ্জীব দাস	১৩৫
সংবর্তের বারান্দায় বিশ্বনাগরিক অলোকরঞ্জন	ড: অজন্তা মিত্র (বিশ্বাস)	১৪৩
বাংলা কবিতার অন্যতম কারিগর ও শিক্ষক		
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	অঞ্জনা দেব রায়	১৪৯

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় চিত্রকল্প :		
বৈশিষ্ট্য ও বৈভব	রজতকান্তি সিংহচৌধুরী	১৫৪
অলোকরঞ্জনের জীবনানন্দ : সেমিওটিক অনুধাবন	রমাপ্রসাদ দে	১৭৭
অনুবাদে কাব্যনাটক ও কাব্যনাট্যকার		
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	তরুণ মুখোপাধ্যায়	১৮৮
অনুবাদকের ভূমিকায়	শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত	২১১
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র প্রবন্ধ-প্রাঙ্গণে		
প্রসঙ্গ : গদ্যশৈলী	দেবারতি জানা	২১৬
অলোকরঞ্জনের বাঁশি	অভীক মজুমদার	২২৮
'বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য'		
একটি অভিনব সাহিত্যের ইতিহাস	বিশ্বজিৎ পাণ্ডা	২৩৫
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি		২৪১
গণেশ বসুকে লেখা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের চিঠি		২৫২

সম্পাদকীয়, কবির কথায় ‘বিভাব’

মাঝে মাঝে ঘাই দেয় রাঘববোয়াল সব প্রশ্ন। আমরা কি বেঁচে আছি? শুধুই কি শরীর সর্বস্ব? মনের ভেতরে কে বসবাস করে? চলতে চলতে কখনো কখনো বিভ্রান্তিকুয়াশা ঘিরে ধরে ঘিলু। নাকি বিশ শতকের বিশ্বাসহীনতায় ভুগতে ভুগতে মূল্যবোধের হদিশ পাওয়ার আশা নিরাশার মাস্তুলে ঝুলছে। কবিও নিয়ন্ত্রিত! রাজরোষে কে, কে বা গণতন্ত্রের হোতা? সব কেমন গঙ্গাজলের মতো ঘুলিয়ে যাচ্ছে। মুখে মুখে, পথে-ঘাটে শান্তির মরমী বাণী সবার মুখে মুখে ফেরে। অথচ শান্তি না আছে ঘরে, বারান্দায় কিংবা ব্যালকনিতে। নীল আকাশ কি এখনো নীল আছে? তবু এলেন জ্যোতির্ময়। প্রতিদিন নিয়ম মেনে ফুলের কুড়ি আসে, ফোটে আর ধর্ষিতা হয়। ঐ ছাপাখানায় সেসব ছাপতে নিষেধ, কেননা আমরা সবাই রামগরুড়ের ছানা হাসতে মোদের মানা। তবুও এখনও কেউ কেউ আছেন, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত হলেও তাঁর কলমে শিশির ধরা থাকে। প্রকৃতির, জনপদের, নানা ব্যক্তিমানুষের সান্নিধ্যে কতকিছুই করেন। যাঁরা প্রতিবাদের স্পন্দন সৃষ্টি করেন, শব্দের খেলায় মাতিয়ে দেন, চমৎকার মায়াডোরে বেঁধে ফেলেন চেতনার রঙ, প্রজ্ঞা আর প্রকৃতিতে যাঁর কবিতালালন চলে, ‘জাতপাতে বিভক্ত, জীবিকায় বিভক্ত, উপাসনায় বিভক্ত’ ভারতবর্ষকে চিনিয়ে দেন, ‘চন্দ্র, সূর্য, ঝড় বৃষ্টি নিয়ে’ যাঁর যাত্রা ছিল মৌলিকতা ও সৌন্দর্য শিল্পীত, তেমন মানুষও এই পৃথিবীর। শঙ্খ ঘোষের কথায় “কে লিখেছেন কবিতাগুলি/ কে আর, অলোকরঞ্জন ছাড়া?/ দেখতে দেখতে ভাবি,/ কতকিছুই যে পারে অলোক,/ কতকিছুই যে করে।”

‘কবিতা লেখার গরজে’ তাঁর জীবনের অদলবদল। না, তেমন কিছু ভাববেন না। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত একটু গুড়ের লোভে নিজের আত্মাকে বিসর্জন দিয়েছেন এমন সহজ করে ভাবার অবকাশ নেই। যাঁরা তাঁর ঈশ্বরকথা শোনেনি, যাঁরা অকাদেমিতে বসে ধানের ক্ষেতে দেখা হতেই ক্ষমতাসীন নেতাকে প্রণাম করেন, কবি তাঁদের রেয়াত করেননি। তবে তাঁর অরণ্যকোণে সবাই গিয়েছেন আর পাত পেতে আতিথ্য নিয়েছেন, এও শোনা কথা, ছাপার অক্ষরে কেউ কেউ গুণমুগ্ধ হয়ে ছেপেছেন। বন্ধু শঙ্খ ঘোষের কথায় এ সংবাদও আছে ঃ “ ছোটদের সঙ্গেই নয়, সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গেও কখনো তাকে শিশুসারল্যে জড়িয়ে নেওয়া, কৈশোর চপলতায়, এরও যে কত ছবি জমে আছে আমার কাছে।”

জীবনের এই সংকলনে কবিতাই শেষ নয়, প্রবন্ধ, অনুবাদ, জীবনী গ্রন্থ, সম্পাদিত গ্রন্থ, ভ্রমণ সাহিত্য এবং পৃথিবীর বহু ভাষায় মৃত্যুত্তীর্ণ প্রহর রেখে গেছেন। দর্শন-সাহিত্যে তিনি আগামীকালের দুর্জয়লিপি। তাঁর কথার ধ্বনি আজও প্রতিধ্বনিত হয়, সেকারণেই তো আমরা তাঁর ‘সমবায় শিল্পের গরজে’ দেখি ছবি ও কবিতার দ্বন্দ্ব সমন্বয়। তাঁর কথা কেবল শব্দের মেলা নয়, ভীষণ শক্তিধর মিশাইলও, অথচ কী বিনয় বিন্যাস :

“মধ্যরাত্রে বুখানন তৈরি করে দিলেন ষড়যন্ত্রের স্বরলিপি, একসঙ্গে খুশি করতে হবে প্রেসিডেন্ট বোথা আর মুক্তিযোদ্ধা নেলসন মাণ্ডেলাকে, মাছটাকে ধরতে হবে জল না ছুঁয়ে।”

দূর থেকে যে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের দ্রিমদ্রিম মৃদঙ্গ বেজে উঠেছিল, এখনও বাজে। আমাদের হৃদয়েও প্রশ্ন জাগে : “এরা কি কোনোদিনই বুঝতে পারবে আমাদের যন্ত্রণা? আর ক'হাজার মানুষ মরে গেলে এরা আমাদের কান্নার আদল ঠাহর করতে পারবে?” তাই কবির ভাষ্যে ‘তবু আমি নশ্বরের তেজে/এখন খুব ঝুঁকি নেবার দিকে/ রয়েছি ঝুঁকে’। এই যে বোধ ও বোধির জমায়েত ‘লেখক আর প্রত্নতাত্ত্বিক’-এর মনন পত্রিকার পাতায়, সে তো শুধু ‘মৃত্যুও অক্ষুন্ন থেকে যায়’ বলেই। কবির আশাবাদ আমাদেরও। সেই যে কবি বলেছিলেন, “কথা হচ্ছে আমার আশাবাদে/তুমি একদিন অবসন্ন হয়ে/বলবে কিনা ‘চিড় খেয়েছে আজ/আকাশটাতে, বিষন্নতা বয়ে/ কিন্নরীরা চলেছে খড় কাঁধে,/তোমার আত্মবঞ্চনা যাক ক্ষয়ে।”

বিশ্বপথিক কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁর শিল্পচর্চায় হয়তো সে স্বাদ পেতে পারেন, যেমন গরানহাটির কীর্তনীয়া পৌঁছে দেন কোনও এক বৈতরণীর পাড়ে। সেখানে কোনো মৌলবাদীর ভয়ও নেই, আছে মশাল জ্বালাবার প্রতীতী। বিচিত্র সুরে ও স্বরে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মোহন বাঁশি মুক্ত করতে পারে অমানবিক স্বৈরাচারী শাসন, পাশবিক পীড়ন কিংবা ভয়াবহ জীবনযন্ত্রণা থেকে। এই প্রত্যাশার সংকলন এই সংখ্যা, কিছু কিছু মুহূর্তঘন ক্ষণে প্রকাশিত কোনো কোনো উৎস থেকে নেওয়া—যেখানে মূল্যহীন জীবনের সামনে ভেসে ওঠে নান্দনিক সুর :

‘আফ্রিকার একটি মেয়ে বসে রয়েছে অসীম প্রান্তরে
আকাশ থেকে নীল
ঝরছিল তার নগ্ন উদার ক্রোড়ে
সবাইকে সে শরণ দেবে,”

৩১ জুলাই, ২০২১ — জয়গোপাল মণ্ডল

‘শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি’

শঙ্খ ঘোষ

অল্প কয়েকদিন আগে বিবেক গুহ নামের বিশিষ্ট এক আলোকচিত্র-শিল্পী ছোটো একখানা বই তুলে দিলেন আমার হাতে। আটান্নটি ছবিতে ভরাট সে-বইয়ের পাতা উলটে গেলে চোখে পড়ে প্রকৃতির বা জনপদের বা নানা ব্যক্তিমানুষের স্নিগ্ধ সুন্দর কিছু ছবি। কিন্তু সেটাই মূল কথা নয়, প্রতিটি ছবিরই সঙ্গে জড়ানো আছে দু-লাইন থেকে দশ লাইন পর্যন্ত — এমনকী কখনো কখনো পনেরো লাইনের কবিতা, স্বভাবতই ছবির সঙ্গে মানানসই।

কে লিখেছেন কবিতাগুলি
কে আর, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ছাড়া?
দেখতে দেখতে ভাবি, কতকিছুই যে পারে অলোক, কতকিছুই যে করে।
কিন্তু বিশেষ এই বইটি নিয়ে কথা বলব একটু পরে।

২.

নিজেরই কাছাকাছি বয়সের কিংবা অতি পরিচিত মানুষজন ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে স্বচ্ছন্দ হতে পারেন না কিছুতেই, আমার মতন এমন আড়ষ্টস্বভাবের মানুষ আশা করি আরো কয়েকজন আছেন। তাঁরা নিশ্চয় দেখে অবাক হন যে উলটোদিকে এমনও অনেকে আছেন যাঁরা বয়সের বা অল্পপরিচয়ের গণ্ডিটাকে নিমেষে ভেঙে দিয়ে অন্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, তাঁদের স্বভাবের মধ্যে এমনকিছু দরজা-জানলা খোলা থাকে যার মধ্য দিয়ে চারদিকের আলো-হাওয়া সহজ একটা প্রবেশপথ পেয়ে যায়। আমার পরিচিতজনদের মধ্যে এমন মানুষ দেখেছি বন্ধুবর সৌরীন ভট্টাচার্যকে। আর সুদীর্ঘকাল ধরে দেখে আসছি আমাদের আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় আছে :

আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো
তবু শিশির টুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।

ওরকম মানুষদের দেখতে দেখতে এ লাইনকটার কথা কেবলই মনে পড়ে আমার। যে-অলোক তখন বাংলা কবিতার যুবরাজ বলে চিহ্নিত আবার অন্যদিক থেকে যে অলোক যাদবপুরের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের রসজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক হিসেবে বিপুল সমাদৃত, যে-অলোক দেশ-বিদেশের ভাষা আর সাহিত্যের অন্ধিসন্ধিতে ঘুরে লিখে পাঠাতে পারে এইরকমের এক ছন্দে-মিলে ভরাট কবিতালিপি :

মিঠি তোমার এক আষাঢ়ের চিঠি

পেলাম আমি আরেক শাঙনে,
তুমি ভাবছো রাজা কোথায়! রাজা
এখন ঘোরেন ভিক্ষা মাঙনে।

সেই রাজা কি অলোককাকু, ভাবিস?
ভাবলে সেটা নিতান্ত মিথ্যে না।
সেই রাজা কি এখন একটা রাবিশ?
ঠিক বলেছিস, কেননা, তার দেনা

কত সেটা শুনলে মূর্চ্ছা যাবি;
রাজাকে তাঁর পুরোনো বন্ধুরা
বলেছিলেন শুধে দেবেন পুরা,
তারা এমন করেন খুন-খারাপি।

ব্লাডপ্রেসারে কেউ-বা দেহ কাহিল
প্রচার করে ছুটিচপল ডানায়
বন্ধ ঘরে বিদ্যে করেন জাহির
যেখানে লোকে ডিক্সনারি বানায়।

তাঁদের ছাতি মহেন্দ্র দত্তের,
তাঁদের গুরু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল,
আমি ওঁদের মহান তহবিল
ভাঙতে গিয়ে ফিরে এলাম ফের

পথের কাছে, সহজ পথের কাছে

যেখানে সেই রাজার রাজন আছে
যার আদরের নীল আগুনের আঁচে
বাঁচে রে সব রাজভিখারি বাঁচে।

সেই পথে তুই আমার সঙ্গে, মিঠি!

যখন সবার ফুরিয়ে যায় মেলা
কিটিপিসির সঙ্গে কড়িখেলা
শুরু করিস, বাঁধাস খিটিমিটি,

খেলা দেখাস আমাকে, লক্ষ্মীটি!

এ-লেখার ঠিক তিনমাস আগে আরেকখানা চিঠিতে সে তাকে লিখেছিল : 'এখন কি তুমি পুতুল খেলছ?' শেষোক্ত এই চিঠিটিতে সে নেমে এসেছিল প্রাপকের ঠিক ওই বয়সেই। আর প্রথমটিতে সে যেন একটা মর্যাদা দিয়ে তাকে তুলে নিতে চাইছিল নিজেরই পরিণত বয়সের কাছাকাছি, আবার সেই একইসঙ্গে নিজেকে নিয়ে যেতে চাইছিল কিটি-মিঠির খিটিমিটির জগতে। এই কিটি ছিল অলোকের আদরের ছোটো বোন, তখনও সে নিতান্ত কিশোরীবেলায়। সেই চিঠির মর্ম কি বুঝতে পারছিল মিঠি নামের মেয়েটি? এই প্রশ্ন অলোককে বিচলিত করেনি। মেয়েটি কি বুঝেছিল সবটা? হয়তো বা বোঝেনি। কিন্তু সেই চিঠি পড়বার পর তার আনন্দোজ্জ্বল গর্বিত মুখখানির ছবি আজও ভুলতে পারি না আমি।

শুধু ছোটোদের সঙ্গেই নয়, সমবয়সি বন্ধুর সঙ্গেও কখনো কখনো তাকে শিশুসারল্যে জড়িয়ে নেওয়া, বা কৈশোরক চপলতায়, এরও যে কত ছবি জমে আছে আমার কাছে। তখন আমাদের চল্লিশে পৌঁছতে বেশি দেরি নেই আর, অলোক এর অল্প কিছুদিন পরেই চলে যাবে জার্মান দেশে, দুজনেই আমরা যাদবপুরের বাংলা বিভাগে পড়াচ্ছি, নিত্য দেখাশোনা হয়, তারই মধ্যে মাঝে মাঝে কোনো গুরুতর সংবাদকেও খেলাচ্ছলে সে পাঠিয়ে দেয় আমাকে :

বাবু শ্রীল শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষ
নামান্তরে, ঐশ্বরিক অসন্তোষ,
নামান্তরে আত্মসুখী মন-তাপস—
১০৩ই বিধান সরণী
শ্যামবাজার, কলকাতা -৪
পূজনীয়েষু,
বোঝোনি কিস্যু,

পুলিশ ব্যাপারী শ্যেন
কী এমন করিলে;

পুলিন বিহারী সেন
শান্তিধামে গেছেন;
(ফোন তো করেছিলেন?)
আমি, অজ্ঞাতনাম
কী দোষ করেছিলাম?
অশ্লীল চেকছবি?
ইটালিয়া বান্ধবী?
বন্ধুকে ছেড়ে মিঞা

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

পালালেন বলিডিয়া?
ছুটিও গেল চলিয়া

।। প্রেরক: ১৭ই জুন
কিমধিকমধম
অলোকরঞ্জন
১৪৬ই
প্রিন্স গোলাম হুশেন শাহ রোড
ভূভারত।।

এই চিঠির শেষদিকে যে কথাকটি আছে 'অশ্লীল চেকছবি', 'ইটালিয়া বান্ধবী", সেই প্রসঙ্গে বোধহয় দু-একটি কথা এখানে বলা দরকার।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের উৎসাহে কখনো কখনো ব্যবস্থা হতো ভালো কোনো বিদেশি ফিল্ম দেখানোর। কিন্তু দেখানোর আগে রেওয়াজ ছিল অধ্যাপকদের মধ্যে কাউকে দিয়ে একবার পরখ করিয়ে নেওয়া যে ছবিটি তাদের দেখানোর যোগ্য কিনা। একটি চেকছবি দেখানোর আয়োজন চলছে, হঠাৎ শোনা গেল তাতে নাকি এমনকটি দৃশ্য আছে, প্রগতিশীলতার পথে যা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেটা সত্যি কি না, ছবিটি দেখানো যাবে কি না বিচার করে তা রায় দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। বাধ্যত রাজি হতে হয়েছে আমায়।

দিনটা ঠিক হয়েছে পয়লা মার্চ। প্রতিমা তখন হাসপাতালে, সন্তান-সম্ভাবনায়। এ নিয়ে খানিক ছোটাছুটি চলছিল ঠিকই, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে কোনো বাধা ঘটছিল না তাতে। দৈবে এমন কাণ্ড হলো যে সেই পয়লা মার্চেই, চিকিৎসক বলে পাঠালেন হাসপাতালে আমাকে থাকতেই হবে। নিরুপায় দশায়, অগত্যা অলোককে ফোন করে জানালাম আমার অবস্থাটা। জিজ্ঞেশ করলাম আজ যাদবপুরের দায়িত্বটা ও সামলে দিতে পারে কিনা। কারণ শুনে অলোক নিমেষেই রাজি হয়ে গেল। কিন্তু তার ফল যে এত বিপর্যয়কারী, এত সুদূরসঞ্চারী হয়ে উঠতে পারে আমরা কেউই তা আন্দাজ করতে পারিনি তখন।

ছবিটি দেখে অলোক জানিয়েছিল যে খুবই ভালো কাজ সেটা। দেখানোর পথে কোনো বাধা হতে পারে না। কিন্তু অলোক ভাবতেও পারেনি যে ওই সময়টাতেও ফিল্মের মধ্যে একবার একটি নগ্ন নারীর উপস্থাপনা ছিল বলে এতদূর অশ্লীলতার রব উঠতে পারে! শুধু অশ্লীলতাই নয়, বিদ্যায়তনের অন্তরবর্তী ছাত্রসমাজের প্রগতিচিন্তাকে ধ্বংস করবার এ এক নিশ্চিত সুচতুর আয়োজন। এ নিয়ে শুরু হলো তুমুল কাণ্ড। প্রধানত কারিগরি বিভাগের ছাত্রদল এসে অপরাধের জন্য উপাচার্যের কাছে ক্ষমা চাইবার কাজে অলোককে নিয়ে কলা বিভাগ থেকে অরবিন্দভবন পর্যন্ত দীর্ঘপথ তাকে নিয়ে চলছে প্রায় মিছিল করে, বিকট

সমস্ত দুর্বাক্যের ধ্বনি তুলতে তুলতে। অলোকের স্ত্রী তখন এক জার্মান মহিলা। ফলে বহরমপুরে আমাদের দলবলকে শুনতে হয়েছিল মার্কিন মহিলাদের নিয়ে বেলেল্লাপনা চলবে না, আর এখানে হয়তো তিনি হয়েছেন "ইটালিয়া বান্ধবী"। কিন্তু সে যাই হোক, উপাচার্যের ঘরে গিয়ে অলোক সবাইকে হতবিহ্বল করে পেশ করল একটি পদত্যাগপত্র। তারপর শুরু হলো ভিন্ন এ নাটক। উপাচার্য আর ছাত্রদলের সমবেত অনুনয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে প্রত্যাহার করেও নিতে হলো ওই চিঠি।

কিছুদিন গড়িয়ে যাবার পর এ নিয়ে পারস্পরিক এক ঠাট্টা চলত আমাদের যে সেই দিনটাতেই আমাদের ছোটো মেয়েটির জন্ম না ঘটলে এই ভয়ংকর ব্যাপারটা তার গালিগালাজ সুদ্ধ বর্ষিত হতো আমারই ওপর। কীভাবে তার থেকে অলোক বাঁচিয়ে দিল আমায়! একেই ব্যাপারটা না বলে বন্ধুকৃত্য?

সময়টা ছিল ১৯৬৯।

আর, মনে রাখতে হবে আগে-পরের ছল কথাগুলি ছেড়ে দিলে চিঠির বক্তব্য ছিল শুধু এইটুকু যে পুলিনবিহারী সেন শান্তিনিকেতনে চলে গেছেন, কিন্তু যাওয়ার আগে আমার কাছ থেকে নির্দেশিত আর প্রতীক্ষিত ফোনটি পেয়েছিলেন কিনা তিনি। যদি তা পেয়ে থাকেন তবে ওকেও কেন একবার ফোন করিনি আমি। এদিকে গরমের ছুটি তো শেষ হয়ে এল। এই উপেক্ষার কারণ কি তবে সেই অশ্লীল চেকছবি? নাকি ইটালিয়া বান্ধবী?

৩.

কিন্তু বলছিলাম বিবেকের বইটির কথা। আর সেখানে অলোকের কবিতা কণিকাগুলির কথা। সে কবিতার মধ্যে এমনও দু-একটি আছে যা অলোকের পূর্বতন কোনো লেখার সামান্য পালটানো রূপ :

তবু কি আমার কথা বুঝেছিল, মুনিয়া পাখি?
যদি বুঝতে পারতে
নারী হতে।

আমাকে বুঝতে পারা এতই সহজ?
কারুকেই বোঝা যায় নাকি!

সবারই নিশ্চয় মনে পড়বে মূল লেখাটিতে আছে বেনেবউ পাখির কথা। কিন্তু অল্প কিছু সবুজ পাতার মধ্যে ডালের ওপর যে পাখিটি বসে আছে বিবেকের ছবিতে, সে তো বেনেবউ পাখি নয়। তাই ঈষৎ ছন্দস্খলনের ঝুঁকি নিয়েও তাকে করতে হলো মুনিয়া। পাখির ছবি অবশ্য এ বইতে আছে আরো অনেক, আরো অনেকভাবে। পিছনে মুক্ত আকাশ আর সামনে আড়াআড়ি দু চারটে লোহার গরাদের আভাস--- তার একটির ওপর স্থির বসে আছে এক পাখি। তার পরিচয়ে লেখা হলো:

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

একটি পাখি ডেকে উঠল উনিশ মিটার ব্যান্ডে;
একটি শিশু কঁকিয়ে ওঠে : 'আমায় ভাতের ফেন দে';

সবুজ আভায় জড়ানো সে-ছবির পাশেই ডান পৃষ্ঠায় আছে স্ট্যাচু অব লিবার্টির মূর্তি, নীলে শাদায় মাখামাখি বিরাট আকাশের নীচে। তার সঙ্গে কবিতার এই টুকরো:

শাদার সঙ্গে নীলে মিলেছে
নীলের সঙ্গে শাদা,
শাদার ওপর জোর দিলে তা
নীলের অমর্যাদা।

পাখির বিপরীতে, ভাস্কর্য বা স্থাপত্যের সাজানো ছবি আরো আছে বইটিতে। বাঁদিকে যদি দেখা যায় গুচ্ছ গুচ্ছ সবুজ পাতার মধ্যে উঁকি দিচ্ছে সবুজ রঙের পাখি, তবে ডানদিকে হয়তো মিলবে বিরাট কোনো স্থাপত্যের অন্তর্গত স্তম্ভগুলির গায়ে চমকপ্রদ খুদে খুদে ভাস্কর্যের কাজ, খয়েরি শাদার মধ্যবর্তী কালো অন্ধকারের গায়ে লেখা আছে :

আমারই সত্তার
এই উত্তরাধিকার
আজ শুধু থেকে গেছে
ট্যুরিস্টের আকর্ষণ হয়ে।

নিজের কবিতাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাইলে অলোক কি এখানে লিখতে পারত। 'পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা?' না, তা পারত না। এমনকী একান্তে, যে পাখিটি চেয়ে আছে প্রায় ওই ট্যুরিস্টের 'আকর্ষণ'-এর দিকে তার জন্য বরাদ্দ হলো এই গদ্যকথাগুলি :

পৌরসমিতিকে বলে মহামান্য মনীষীদের জায়গায় পাখিদের নামে এক একটা ছোটো ছোটো রাস্তা চিহ্নিত করার কাজটা প্রায় শেষের দিকে এসে গিয়েছে। পাপিয়া হরিয়াল আর চন্দনারা বেজায় খুশি। এমন সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটা বসন্তবৌরী এসে হাজির।

ভাস্কর্য স্থাপত্যের বিপরীতে পাখির উপস্থাপন আবারও আছে রং-বাহারে লালচে রঙের ফুলভর্তি ডালের ওপর বসে একটি শালিখ পাখি, যেন তাকিয়ে দেখছে কোনো এক ক্যাথিড্রালের সিলিং-জোড়া হলুদ ভাস্কর্যের কাজ তখন :

স্বচ্ছ এই শালিকের মতো
কবে হবে আমার হৃদয়?
হার মেনে হয় না আহত
নিয়তি করে না যারে ক্ষয়।

বাঁদিকের এই লেখাটির সঙ্গে জোড় মিলিয়ে ডানদিকে পুরোপুরি এক কবিতা :

আমি তখন ইটালিতে

একটি দুতাবাসে এসেছিলাম
ভিসা আদায় করে নিতে
এমন সন্ধিক্ষণে
টেবিল কেঁপে গেল, চেয়ারটাও;
দেয়ালটার যকৃতে

রক্ত ঝরে পড়ে, যেই
প্রাণের দায়ে সরু ব্যাল্কনিতে
ছুটে গেলাম দেখি তার

আচ্ছাদন নেই, আর
চোখের সামনেও ঘরবাড়ির
চিহ্ন এতটুকু নেই—
শুধু ক্যাথিড্রালটার
উপরটুকু আছে, আর
কপাল জুড়ে আধখানা

এ পর্যন্ত প'ড়ে কারো হয়তো মনে হতেও পারে যে গোটা এই ছবির বইটি বুঝি শুধু পাখির চোখেই দেখা। তা কিন্তু নয়। ঠিকই, বিপ্রতীপে সাজিয়ে নেওয়া পাখি আছে আরো। কিন্তু তা ছাড়াও আছে বাঁদিকে তুষারাবৃত পটভূমি থেকে ডানদিকের কোনো জনপদে নেমে আসা, একদিকে :

প্রথম প্রথম মসৃণ লেগেছিল
তুষারকীর্ণ এই নিসর্গ শোভা;
এত সুন্দরের আমার আস্থা নেই—
এইবারে আমি নেমে যাব জনপদে।

ডানদিকের সমতলে শীর্ণ এক জলধারার পাশেপাশে আর সমান্তরালে চলেছে উর্ধমুখ এক উট :

পিপাসা মেটেনি, তবু চলেছে যেন রাজাধিরাজ,
তার এই মুদ্রাটুকু অপরাহ্নে শিখে নিই আজ।

এসব কবিতাংশ এমনভাবে মুদ্রিত হয়েছে যেন ছবির ই অংশ। তাই সব মিলিয়ে রঙে-রেখায় পূর্ণ এই ছবির বইটি দেখতে দেখতে মনটা অনেকখানি ভরাট হয়ে যায়। কবিতাগুলি আগে না ছবিগুলি আগে? কবিতার জন্য ছবি, না ছবির জন্য কবিতা?----

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

এসব প্রশ্ন তখন নিরর্থক হয়ে যায়। শুধু মনে থাকে এক পারস্পরিক তার ঐকতানে তৈরি হয়ে উঠেছে এই বই। বিবেক লিখেছেন আমার আলোকচিত্রেরও অভিঘাতে চটজলদি কবিতা লিখে দিতে রাজি হয়ে যান অলোকরঞ্জন। রাজি হয়ে যান, তার কারণ তিনি শিশিরটুকুকেও ধরা দিতে পারেন স্বচ্ছন্দে, সহজে।

এই সহজ স্বচ্ছন্দ্যই অলোকের চরিত্রে মস্ত এক বিভা হয়ে ছড়িয়ে থাকে সবসময়।

উৎস : কবিসম্মেলন, ডিসেম্বর ২০২০

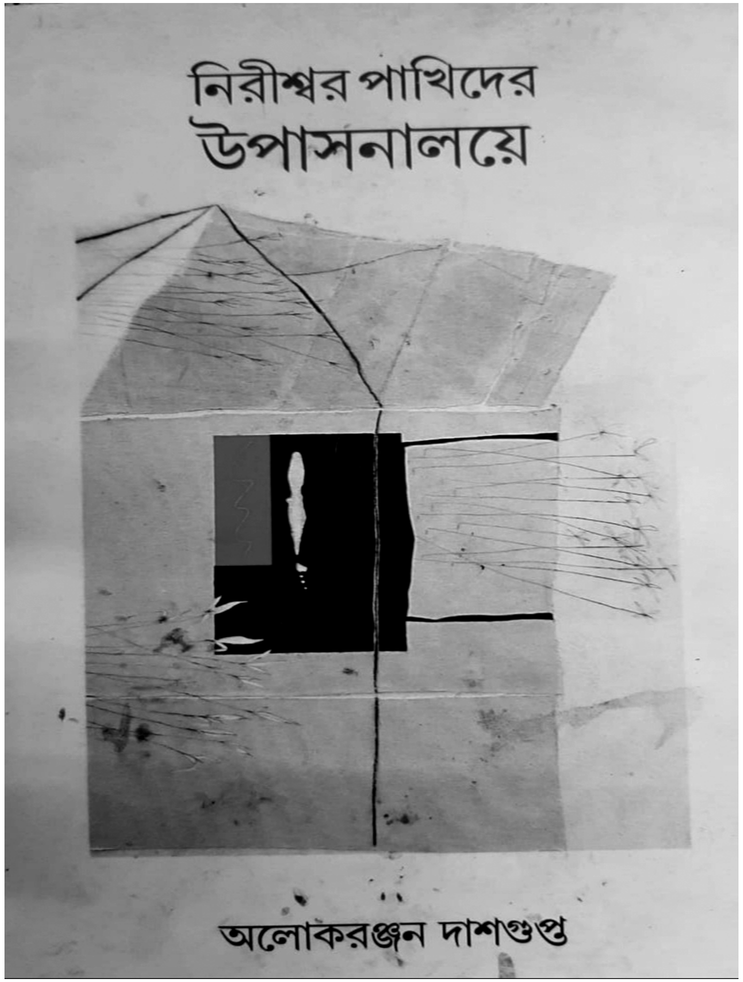

অলোকদা

পবিত্র সরকার

বুড়োবয়সের স্মৃতি এমনই বিশ্বাসঘাতক যে, অলোকদার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম মুহূর্তটা আর মনে নেই। তবে সেটা গত শতকের পঞ্চাশের বছরগুলির মাঝামাঝিই হবে, বা শেষদিকে। তখন কলকাতায় ছাত্রজীবন তুঙ্গে, কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢোকবার চেষ্টা হচ্ছে, সাহিত্য ও নাটকের সৃষ্টিক্ষেত্রে উকিঝুঁকি দেওয়ারও চেষ্টা করছি। কোনো কবিসম্মেলনের সূত্রে, না কফিহাউসের আড্ডায় কোথায় আলাপ হয়েছিল তা আর হাজার মাথা চুলকেও মনে আনতে পারছি না। শুধু এই পড়ন্ত বেলায় ভাবি, এরকম একজন মানুষের সঙ্গে আলাপ না হলে কত না দরিদ্র হত আমাদের অনেকের জীবন।

তাঁকে যখন প্রথম দেখি তখন প্রথম দেখায়, শুধু দেখামাত্র, খুব বিমোহিত হয়েছিলাম এমন বলতে পারব না। অবশ্যই তার ছিপছিপে, তীক্ষ্ণ ও শ্যামবর্ণ চেহারার মধ্যে একটা কিছু বিশিষ্টতা ছিল, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই বংশগত উত্তরাধিকার, কবিত্ব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র এইসব লক্ষণের মিলিত যোগফল। তাঁর কবিত্বে আমরা তখনই মুগ্ধ—'যৌবনবাউল' আমাদের সকলের মনোহরণ করেছে, সহজ উচ্চারণের স্বচ্ছলতা ও স্বাতন্ত্র্যে। মানুষটির চোখদুটিতে উজ্জ্বলতা ও দুষ্টুমিও তাঁকে আলাদা করত। কিন্তু যতক্ষণ না তিনি মুখ খুলছেন ততক্ষণ তাঁর অসামান্যতা (বা অলোকসামান্যতা) বোঝবার উপায় ছিল না। মুখ খুললেই ফুলঝুরির মতো অনর্গল যেসব শব্দাবলি নির্গত হত তা আমরা জীবনে শুনব বা বলব বলে ভাবিনি। বলার কথা তো এখনো ভাবি না। তাঁর ওই বাগ্‌বিভূতি সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের অস্তিত্ব এবং অব্যবহিত পরিপার্শ্বকে আলোকিত করে তুলত! আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবতাম, ইনি কি রবীন্দ্রনাথের অমিত রায়ের কোনো উত্তরবিগ্রহ? আমি জানি না, কোনো চর্চা বা অনুশীলনে এই চমকপ্রদ কথাকৃতি তৈরি করা সম্ভব কি না। এটা লক্ষ্য করে দেখেছি যে, অলোকদাকে এক লহমাও থমকে ভাবতে হয় না এসব উচ্চারণের আগে, যেন তার মস্তিষ্কে সাজানোই আছে অভাবিত অভাবনীয় নানা বাক্‌চমৎকার, এবং উপলক্ষ্যমাত্রেই তা ফোয়ারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরোয়। উচ্ছ্বসিত কথাটা একটু অতিকথন, কারণ অলোকদার বলার সময় সবই বেরোয় অত্যন্ত স্বাভাবিক বাগব্যবহারের মতোই ভাবভঙ্গি, কখনোই মনে হয় না একটা চটকদার বা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মতো কিছু করছেন, বা "কেমন বাহাদুরি করলাম দেখলে!" গোছের কোনো দুরতম ইঙ্গিত। যেন ওটাই তাঁর নিজস্ব সহজাত ভাষা। এইজন্যই অলোকদার শিক্ষক এবং আমার শিক্ষকপ্রতিম প্রয়াত দেবীপদ ভট্টাচার্য এ ভাষার নাম দিয়েছিলেন 'অলৌকিক'। এ নাম অন্যদের মুখেও এসে থাকবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি গেলাম ১৯৬৩-র আগস্টে। অলোকদা সেই মুহূর্তে তুলনামূলক সাহিত্যে। শুনেছি বাংলা বিভাগেই তিনি প্রথমে যোগ দিয়েছিলেন, তারপরে, তার

এক প্রাক্তন সহকর্মীর কথায় 'পাখা মেলে পড়াতে পারবেন' বলে তুলনামূলক সাহিত্যে চলে গিয়েছিলেন। তা একথা অলোকদা বলতে পারতেন নিশ্চয়ই। শান্তিনিকেতনের উদার মেধাপরিবেশে অমর্ত্য সেন প্রভৃতির সঙ্গে বেড়ে উঠেছিলেন, ফলে তাঁর মতো বিপুল ব্যাপ্ত অধ্যয়ন আমি খুব কম মানুষের ক্ষেত্রে দেখেছি। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের কবিতা ও সাহিত্য সমালোচনা ছিল তার নখদর্পণে, এবং তারই ফলে তার সমস্ত কাজের মধ্যেই একটা আলোকিত ও সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ আমরা লক্ষ্য করেছি তা সে Lyrics in Indian Poetry নামক গবেষণাকর্মই হোক, কিংবা বাংলা কবিতার ইতিহাসই হোক। যাকে ইংরেজিতে insight বলে, তার মুহুর্মুহু ঝলকে তাঁর সমস্ত গদ্যই অতিশয় ঐশ্বর্যময়, যে জন্য আমরা তাঁর সমস্ত গদ্যের সযত্ন পাঠক। এই গদ্য আমরা কখনো লিখতে পারব না, কিন্তু তার মধ্যে প্রতিভাত আলোকরশ্মির উৎসও আমরা কখনো হতে পারব না।

কবি হিসেবে অলোকদার ভাষা কিন্তু তার গদ্যের মতো নয়। তা শিল্পিত, কিন্তু কোথাও তার মধ্যে একটা বাউলধর্মী সহজতা আছে, যা দুর্বার আকর্ষণ তৈরি করে দেয়। আমার মনে পড়ে, 'যৌবনবাউল', 'রক্তাক্ত ঝরোখা' বা 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ' বা অন্য কোনো বইয়ে গ্রন্থিত হিসেবে নয়, সম্ভবত কবিপত্র-এর পৃষ্ঠাতেই পড়েছিলাম অলোকদার একটি কবিতা, যা মুহূর্তে স্মৃতিতে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল, আর তাকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। তার নামটিও ভুলে গেছি, শুধু ছত্রগুলি মনে আছে —

> 'আমি কোনোদিন পাগল বলি না ওকে
> বেসুরো গলায় রামপ্রসাদের কলি
> গেয়ে ঘুরে গেল জনক রোডের গলি
> সময়ের ছায়া পড়ে না তো ওর চোখে।
> ও কিছু বলতে চেয়েছিল কোনোদিন
> রৌদ্রের মতো পরিচ্ছন্ন করে;
> বলতে পারেনি, আকাশে আত্মলীন
> সময় পড়েছে বৃষ্টির মতো ঝরে।
> এখানে আমিও বলতে এসেছি কিছু,
> সম্ভাবনায় আজো আমি অরুণাভ;
> বলতে যে আমি পারব না, তাও জানি।
>
> আমি একদিন উন্মাদ হয়ে যাব।

জানি না, দুর্বল স্মৃতি ছত্রগুলি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করল কি না, কিন্তু এটা বলতে পারি যে, যে অল্প দু-চারটি কবিতা আমার সম্পূর্ণ মুখস্থ আছে, অলোকদার এই কবিতাটি তারই একটি। বলাবাহুল্য, এ কবিতাটি আমি প্রায় আমারই লেখা, কিংবা আমারই কথা বলে আত্মসাৎ করে নিয়েছি। অলোকদা এখন চাইলেও তা আর ফেরত নিতে পারবেন না। নিজের সম্বন্ধে

এই নির্মমতা যেন আমিও নির্মাণ করতে পারি—একথা আমি কবিতাটি পড়ামাত্র স্থির করে নিয়েছিলাম।

সম্ভবত ১৯৬৬ থেকে অলোকদা আবার যাদবপুরে বাংলা বিভাগে ফিরে এলেন। তারপর শুরু হল আমাদের এক দীর্ঘ আনন্দময় সাহচর্যের পর্য্যায়, যার ছেদ পড়ল ১৯৬৯-এ আমার বিদেশ যাত্রায়, তারপর অলোকদার অপ্রবাস-প্রবাস প্রকল্পে। আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল অলোকদার প্রণয় ও জার্মান ভাষাশিক্ষা, এবং শেষে টুড্‌বার্টা বউদির সঙ্গে বিবাহবন্ধন। কিন্তু এগুলি তো ঘটনামাত্র। টুড্‌বার্টা বউদি ছিলেন এক অসামান্য মহিলা, অত্যন্ত স্নেহশীলা এবং প্রশ্রয়প্রবণ। তিনি অনায়াসে অলোকদাকে জার্মান সংস্কৃতির ভিতর মহলে ডেকে নিতে পেরেছিলেন। দু হাজার সালে বার্লিনে এবং হাইডেলবার্গে গিয়ে দেখে এসেছি অলোকদা কীভাবে সেদেশে এক সম্মানিত অতিথি হয়ে আছেন ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা। টুড়ার্টা বউদি ভুরিপরিমাণ ভারতীয় আমিষ-নিরামিষ ব্যঞ্জনে এই অধমকে আপ্লুত করে দিয়েছিলেন। এই মহীয়সী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, এ ঘটনাটা জীবনের এক নিষ্ঠুর অবিচারের মতো মনে হয়।

টুকরো-টাকরা স্মৃতি অনেক আছে। জানি না কবে, হয়তো যাদবপুরে আমি যাবার আগেই, আমার বউবাজারের রেনবো ক্লাবের (১৬৬ বউবাজার স্ট্রিট) মেসে একবার অলোকদা এসেছিলেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক কপি Partisan Review নিয়ে। এরকম একটি সাময়িক পত্র প্রকাশে আমি তাঁদের সহযোগী হতে রাজি আছি কি না। আমি এক পায়ে খাড়া ছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা তার পরে আর বেশি এগোয়নি। যাদবপুরে যাবার পরে পরেই সম্ভবত অভিনীত হল অলোকদার চমৎকার একটি কাব্যনাট্য 'উত্তরমেঘ' (জানি না এ কাব্যনাট্যটি পরে আর অভিনীত হয়নি কেন)। তাতে আমার একটা ক্ষুদ্র অভিনয় ছিল। নায়কনায়িকার ভূমিকায় ছিলেন অতি সুন্দর তরুণ দম্পতি (খেয়াল নেই তাঁরা তখনই দম্পতি হয়েছিলেন কি না) কবি মানস রায়চৌধুরী, সুতপা। তাদের কেউ আর নেই। জ্যোতির্ময় ও মীনাক্ষী দত্ত এই নাটকে ছিলেন, না আর একটিতে, সে কথা আর স্পষ্ট মনে নেই। অলোকদাদের বাড়িতে মহড়া একটা বিশেষ পরিতৃপ্তির ব্যাপার ছিল, আর অতি স্নেহশীলা মাসিমা (তাঁর চমৎকার আত্মজীবনীটি যাঁরা পড়েননি তাঁরা অসম্পূর্ণতা ভোগী), অলোকদার বাবা ও ভাইবোন সকলেই এত সহজে আপন করে নিয়েছিলেন যে আমি কখনোই ও পরিবারে বহিরাগত বলে নিজেকে ভাবতে পারিনি।

এই পারিবারিক ও ব্যক্তিগত উষ্ণতা অলোকদার সহজাত। ফলে যাদবপুরে কয়েকটা বছর আমাদের দারুণ কেটেছে। ছিলেন শঙ্খ ঘোষ, পিনাকেশও এসে যোগ দিলেন। একটু পরে এলেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ। আমরা তরুণরা বেশ একটা ছোট্টো দল তৈরি করে ফেললাম। শঙ্খদা-অলোকদার অভিভাবকত্বে। আলাদা হলাম এই কারণে যে, বাকিরা সকলেই ছিলেন অনেকটা জ্যেষ্ঠ। কবি অজিত দত্ত, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, মদনমোহন গোস্বামী। ছিলেন

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বয়সে মাঝামাঝি কিন্তু এই দলের নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁরা সদস্য তারা মেজাজ ও মনোভঙ্গির কারণেই হতে পারেন নি।

এই দলটির তারুণ্যের নানা কীর্তি আছে। প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পাজামা পরে আসছেন পড়াতে—এ এক দুর্ধর্ষ অনাচার, এইরকমই ধারণা ছিল। কিন্তু সম্ভবত অলোকদাই পাজামা পাঞ্জাবি পরে এলেন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং আমরা তার চ্যালা হিসেবে ঘটনাটা চালু করে দিলাম। অজিত দত্ত তখন অসুস্থ, প্রায়ই তাঁর মেজাজ ভালো থাকত না। এক-একদিন যেমন নানা রকম আলাপ আলোচনায় হাস্যপরিহাসে আমাদের মাতিয়ে দিতেন, আর একদিন হয়তো অকারণে আমাদের কোনো একটা ভুলত্রুটি 'অনুমান করে' সবাইকে ধরে তুমুল বকুনি দিলেন। ফলে আমরা খুব মুষড়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ফ্যাকাল্টি ক্লাবে চা ও জলখাবারে সান্ত্বনা খুঁজে নিলাম। পরদিন যখন দেখা হতো তখন অলোকদা হয়তো বলতেন, আজকের আবহপ্রতিবেশ কেমন? অর্থাৎ অজিতবাবুর মুড কেমন? কিন্তু সেদিন হয়তো অজিতবাবুকে অত্যন্ত ঝলমলে দেখা গেল, তবে শেষদিকে এটা এমনই ব্যতিক্রম ছিল যে, আমরা মাঝে মাঝেই ভাবতাম যিনি বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের উপর অমন চমৎকার বই লিখেছেন তার ব্যক্তিগত আচরণে হাস্যকৌতুকের ব্যাপারটা অত অবহেলিত কেন?

অবশ্যই শঙ্খদা আর অলোকদার মাস্টারমশাই দেবীবাবু (দেবীপদ ভট্টাচার্য) ছিলেন। ছাত্রদের প্রতি তার স্নেহ তো কিংবদন্তিসঞ্চারিত, কিন্তু ভারিক্কি লোক ছিলেন, তাঁকে আমরা একটু সমীহ করতাম। অজিতবাবু আর দেবীবাবু দুজনেই অবশ্য প্রচুর মজার গল্প বলতেন। পাজামা পরাটা নিয়ে তারা প্রথম ক-দিন একটু ভ্রু কুঁচকে ছিলেন, কিন্তু শেষে নিরুপায় হয়ে মেনে নেন। এখানে হয়তো উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে, এই উত্তরাধিকার বহন করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েও এ ব্যক্তি পাজামা-পাঞ্জাবির ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। অবশ্য সেখানেও সে মৌলিকত্ব দেখাতে পারেনি। তার আগেই অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাস সম্ভবত সে কাজ করেছিলেন।

দেবীবাবু, এবং সম্ভবত আর্টস কলেজের প্রিন্সিপাল অসীমকুমার দত্ত, শেষের জন ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন আমরা পাঞ্জাবিতে যাতে সবচেয়ে উপরের ঘরের (চতুর্থ) বোতামটা এঁটে আসি সেদিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। দুজনেই শুনেছি অলোকদার ওই বোতাম লাগিয়ে দেবার জন্য আর্টস কলেজের বারান্দায় একাধিক দিন তার পাঞ্জাবির বোতামের ফিতে ধরে অনেকটা পথ এগিয়েছিলেন, কিন্তু অলোকদা এঁকেবেঁকে তাঁদের হাত ছাড়িয়ে পালাতে পেরেছিলেন। পরে নিরুপায় হয়ে আমাদের পাঞ্জাবির বোতামের চার ঘরের নীচের তিনটি ঘরে বোতাম লাগানো মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অলোকদার গানের গলা ছিল চমৎকার, এবং সবরকমের গানই গাইতেন, শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয়। সেই বাঁশির মতো গলা নিশ্চয়ই এখনো অটুট আছে। তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গেয়েছি বহুবার, কিন্তু তাঁর স্কেল ছিল আমার স্কেলের চেয়ে উঁচু। এ গুণটি তিনি মাসিমার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁর গলায় 'বসন্তে কি শুধু কেবল', 'যা ছিল কালো

ধলো" ইত্যাদি গান এখনো আমার কানে লেগে আছে। যেটা ভালো লাগত, গানের বিষয়ে তাঁর রুচি ছিল আমারই মতো সর্বন্ধর। আমি খড়্গপুরের রেলওয়ে শহরে বড়ো হয়েছি ফলে সেখানে হিন্দি বা মুম্বই (তখনকার বোম্বাই) ছবির ও রেডিয়ো সিলোনের গানে খানিকটা মুগ্ধ; আর অলোকদা শান্তিনিকেতনে বেড়ে উঠেছেন। পরে রবীন্দ্রসংগীত আমারও 'অধনের ধন' হয়ে উঠেছে, কিন্তু হিন্দি ছবির প্রচুর গান এখনো আমার ভালো লাগে। এম.এ পড়ার সময় একবার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে ট্রেনে হোটেলে যত্রতত্র হিন্দি গান গেয়ে আমাদের সহযাত্রী এক কবিকে পীড়িত ও প্রায় মূহ্যমান করে দিয়েছিলাম মনে পড়ে। সে কথাটা অলোকদাকে কী এক সূত্রে বলতে উনি বলেছিলেন, ভালো হিন্দি গানের পক্ষ নিয়ে তিনি 'অ্যাকাডেমিক বিতর্কে' নামতে প্রস্তুত। তাঁর মুখে ওই 'অ্যাকাডেমিক বিতর্ক' কথাটি শুনে আমি তখন খুব ভরসা পেয়েছিলাম।

এখন যখন বসে বসে এ লেখা লিখছি, তখন অনেকগুলি মৃত্যুর দাগ এ লেখার আশেপাশে ফুটে উঠছে। মেসোমশায় মাসিমা আর নেই, মেসোমশায় দীর্ঘদিন চলে গেছেন। মাসিমাকে এই সেদিন শয্যাগত দেখেছিলাম রায়পুরের ফ্ল্যাটে, তিনিও চলে গেলেন। বোন কিটিও অসময়ে চলে গেছে, তার মৃত্যু হিসেবের মধ্যে ছিল না। অলোকদার মেজো ভাইটিও বিদায় নিয়েছে। চুড্‌বার্টা বউদিও তার অভাবিত বাঙালিত্ব নিয়ে হঠাৎই বিদায় নিলেন বছরখানেক আগে। এঁদের থাকা যেমন আমাদের নির্মাণ করে, ঋদ্ধ করে, এঁদের চলে যাওয়াও কি আমাদের নির্মাণ করে? না ভাঙে? কার ক্ষেত্রে কোনটা ঘটবে বলা মুশকিল। আশা করি অলোকদার ক্ষেত্রে প্রথমটাই ঘটেছে। তাঁর নির্মাণ এখনো শেষ হয়নি। আরো দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে থেকে তিনি আমাদেরও নির্মাণে সক্রিয় থাকুন, তার সৃষ্টি ও উষ্ণ সাহচর্য দিয়ে।

'অলোকায়ন' গ্রন্থ থেকে পুর্নমুদ্রিত—উৎস : অহর্নিশ

নব্য ভারতচর্চার উন্মেষ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বক্তৃতার বাংলা ভাষান্তর —রন্তিদেব সরকার।

প্রথমেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলা যাক যে আমার এই উপস্থাপনা একেবারেই আনুসারিক-ধর্মী ; জার্মানির -ডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউট-এর Neure Sprachen and Literatures বিভাগে অর্থাৎ আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনার সময়ে অভিজ্ঞতালব্ধ ধ্যান ও ধারণার ভিত্তিতেই গড়া।

ব্যাপারটা শুনলে অদ্ভুত লাগবে যে এই বিশেষ বিভাগটির জন্মলগ্ন, যা পুরোনো এক চাঁদোয়ার নিচে, প্রাচীন ভারততত্ত্বের উৎসমুখ হতে উৎসারিত হয়েছিল একদিন; যে বিদ্যাটিকে আদৌ মৌলিক বলা যায় না বরং বেপথুমান বলা যেতে পারে; রক্ষণশীল ধ্রুপদীজনেরা যে বিদ্যাটিকে Fachrichtung —অর্থাৎ নিছক এক সহযোগীবিদ্যা বলে অভিহিত করেছিলেন; যা নাকি বিদ্যার মূলস্রোতে পরিগণিত হবার মত নয় বলে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তা এখন আপন যোগ্যতায় মান্যতা পেতে শুরু করেছে এবং এতদসত্ত্বেও, আপন অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে এমন এক প্রতিকূল পটভূমি, যেখানে বিদ্বজ্জন এবং পন্ডিতমহলের অবজ্ঞা এবং সদাজাগ্রত ভ্রূকুটি নিরন্তর সঞ্চরমান, সেখানে দাঁড়িয়ে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের এই শাখা Neue Indologie- র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যার অবিসংবাদী প্রভাব তদানীন্তন পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলি (Eastern Block) যেমন পোল্যান্ড এবং চেকোস্লোভাকিয়া-র উপর পড়েছিল।

এই নন্দিত সমাপতনের কারণ খুঁজতে বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। একটা কারণ অবশ্যই যে ধ্রুপদী ভারততত্ত্ব বিষয়টি সর্বতোভাবে সংহত এমনকি এর মধ্যে একমেবদ্বিতীয়মগোছের অন্তর্নিহিত একটা ভাব ছিল। এর অন্তর্গত ভারত-জার্মানি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের যে জোয়ার হিটলারের জার্মানিকে প্লাবিত করেছিল, সেই প্রবাহে ১৩টি (তখনও সংখ্যাটির গায়ে 'অপয়া' তকমাটি আঁটেনি) সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদ, তুমুল উদ্দীপনায় সৃষ্টি করা হয়েছিল। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানিতে সংস্কৃত ভাষার প্রতি এই অন্ধ অনুরাগ দেশের এক সংস্কার-এ পর্যবসিত হয়েছিল যা তখনও প্রান্ত কথ্যভাষার মধ্যে গণ্য করা হতনা তবুও 'প্রাকৃত' বা 'পালি' ভাষার থেকে কিছুটা হলেও বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

ক্রমবিকাশশীল ভারততত্ত্ব, যাই হোক না কেন, সে সময় যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল বিভিন্ন ভারতীয় কথ্যভাষার উপর, বিশেষ করে ইন্দো-এরিয়ান এবং দ্রাবিড়, উভয় ভাষা-ভাষীদের উপর। এই প্রয়াসকে কমবেশী বহুধামুখী ছক বলে চিহ্নিত করা যায়। সরকারি-ভাবে তখনকার দিনে ১৫টি স্বীকৃত ভারতীয় ভাষা-ভাষীরা (এখন ২৪টি) নিজেদের

মধ্যে চমৎকার এক যোগাযোগের সেতু তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল, যা প্রায় এক যৌথ মিলন-মেলার সঙ্গেই তুলনীয়; যা খ্রিষ্টীয় পার্বণ '**Pentecost**'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়- যেখানে বহুদেশ থেকে আগত প্রবাসীদের সমাবেশে তারা আবিষ্কার করে যে তারা ভিনদেশের কথ্য ভাষা বুঝতে সক্ষম হচ্ছে।

একটি মিশ্র শব্দবন্ধন হয়ত বা আধুনিক ভারততত্ত্বের অন্যতম মেরুরেখা কেননা যে পঠনবিন্যাস আমরা অনুসরণ করতাম তার মূল উপজীব্য ছিল বিভিন্নতা এবং বহুবাচনিক; এ ভাবে শুধুমাত্র কোন একটি সাহিত্যবিশেষের নয়, পাশাপাশি অন্যান্য অনেক, যার প্রতিটি মূল থেকে বেজে উঠত নিখাদ ভারতীয়তার সম্মেলক সুর। এখানে 'বিভিন্নতা' বলতে সেই মান্ধাতার আমলের রূপরেখাটি নয়, যা শুধুমাত্র প্রকৃতি, তা থেকে বিভাজিত ভিন্নতর শ্রেণীবিন্যাস, তা থেকে মহাজাতি, প্রজাতি ইত্যাদি নয়, আমি সেই মারাত্মক অনুশাসিত বিন্যাসের কথা বলতে চাইছি, এক বৈচিত্রময় বিরোধাভাসের উপস্থিতি, যা আমি ভারতীয় সংস্কৃতিতে পেয়েছি। পক্ষান্তরে, এটা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অতীব সম্ভাবনাময় সৃজনশীলতা যা তাকে কর্তৃত্বময়তা প্রদান করে। অন্য কোন ধর্মের পক্ষে কি কোনদিন তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে সৃষ্টি করা কল্পনাতেও স্থান পেয়েছে ?

এই যে ছড়ানো বিশালত্ব, মহাবিশালত্বও বলা যায়- রক্তে সত্যিই এক নেশা ধরিয়ে দেয় এবং কোন পাশ্চাত্যবাসীর কাছে তা হয়ত এক বিভ্রান্তিকর ব্যাপার। সব কিছুর মধ্যে সে চায় পরিপাটী; সাজানো টেবিল, চিহ্নিত এলাকা। মেরুকরণটাই মুখ্য সেখানে, মেলামেশাটা বাহ্য! পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'সীমানা' বয়ে আনে তাকে অতিক্রম করার হাতছানি কেননা, আকার কখন হয়ে ওঠে নিরাকার, কখনও বা সাকার আবার কখনও তা মিলেমিশে একাকার হয়ে অন্য কোনো আকৃতিতে স্বপ্রকাশ, এক অনিশ্চিত লক্ষের দিকে ছুটে যাওয়া, যা দেখে নীতিবাগীশরা তাকে অসম্ভব বলে সাব্যস্ত করতে চাইবে। কিন্তু তা বলে সৃজনশীলতা কি উচ্ছন্নে যাবে ? তা হবার নয়, কেননা একে দৃঢ়হাতে ধারণ করেছে, এক সদাপ্রবাহী সাম্যাবস্থা, যেখানে সংস্কার এবং স্বকীয়তা একটি সূত্রে গ্রথিত হয়ে যাচ্ছে। যেখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা এক যুগলনৃত্যে সামিল হয়ে পড়ছে এবং নিরন্তর এক সূক্ষাতিসূক্ষ শৈলী রচনা করেই চলেছে।

শুধুমাত্র হেগেলীয় দর্শনে সূত্র বা বিরোধাভাস নয়, তার থেকেও অনেক গভীর অধ্যাত্মবোধ নরনারীর জীবনে সপ্রতিভ রয়েছে। বিদ্বেষপ্রসূত মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতার আরোপিত প্রাণশক্তি-নিংড়ানো যন্ত্রব্যবস্থা নয় বরঞ্চ হৃদয়তন্ত্রীতে অর্কেস্ট্রার ঝঙ্কার তোলা সুরমূর্ছনা ছড়িয়ে বহুরূপী ঈশ্বরের বন্দনা। অধ্যাত্মরূপের বিভিন্ন প্রকাশের প্রতি কোন নিয়মনিষ্ঠ ছকের শৃংখলা নয়, পক্ষান্তরে, স্বতঃস্ফূর্ত সমর্পণের অঙ্গীকার যেখানে পরস্পর গান ও ভাষণ, সংগীত ও গতিময়তা, দেহ ও পার্থিবতা এবং পৃথিবী ও আকাশ,

বাতাস ও উপলখন্ড এবং মহাশূন্য খুঁজে ফেরে, প্রাণের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, নিদারুণ আনন্দের উল্লাসে।

এমনতর তুরীয় আনন্দে আমার সতীর্থবন্ধুরা মশগুল ছিলেন, যারা রসদ সংগ্রহে ব্রতী হয়ে যোগাযোগ ঘটাতেন নিত্য এবং অনিত্য সাহিত্যের সঙ্গে, এমনকি তারাও, যারা লিখিত এবং অলিখিত সাহিত্য সামগ্রীর সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন। মৌখিক সাহিত্য (আপাতবিরোধী শব্দ হচ্ছে না তো?) বহুভাষাভাষী ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পটভূমিতে এক বিশেষভাবে আবশ্যিক উপাদান-যে ভান্ডার থেকে এই উপমহাদেশের কতশত সৃজনশীল সাহিত্যরচনা এখনও আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের যোগানদার। ভারতীয় উপমহাদেশের আর যাই হোক, অন্তর্মুখিনতার অপবাদ নেই। উদ্দীপ্ত বাঙ্ময়তা, তা সে গপ্পোই হোক বা বাজারে দরাদরি, নিছক কেনাকাটা হোক বা আটপৌরে সুখদুঃখের পাঁচালি,বকবকানি বা আড্ডা-এ সবই এই উপমহাদেশের চালচিত্র। এই সজীব উর্বরশীলতার মধ্যেই 'লিখিত' সাহিত্যের জন্ম; তা হয়ত কোনো চূড়ান্ত বা নিখুঁত রূপরেখা নয়, কিন্তু আরও পাঁচটি বিকশিত ফুলের মধ্যে গণ্য করার মত একটি তো নিশ্চয়ই। সে অর্থে এটা হয়ত ক্ষুদ্রাকার কেননা লিখিত সাহিত্যের সুযোগ — সুবিধে মুষ্টিমেয় লোকেদের নাগালেই ছিল তখন। সে সব উচ্চৈঃস্বরে পঠনের মাধ্যমে অথবা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে অঙ্কনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হত। সম্ভবত এখানেই, আশ্চর্যজনকভাবে, ইংরেজি ভাষায়, কৃত্রিম সুরভিযুক্ত ভারতীয় সাহিত্যের নমুনা মেলে। এ সব অবশ্যই ভারতীয় সমাজের গভীর ব্যাপ্তি থেকে উৎসারিত আলো নয় বা সৌরভ নয় কিন্তু সমাজের মূলস্রোতের সাধারণ শ্রেণীর দ্বারা লালিত, অভিজ্ঞতালব্ধ নির্য্যাস বলা যেতে পারে। এটা বলা যেতে পারে, মার্কিন মুলুকে **Indian Studies** নামে যে বিষয়টি পড়ানো হয়ে থাকে, তা মূলত নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত লোকায়ত জীবনের উপাদানগুলির উপর আধারিত। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যগুলি তো পুঁথিগতই থেকে যাচ্ছে। তবে যাই হোক না কেন,-ডেলবার্গ সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউট-এ আমরা কিন্তু আমাদের অধ্যাপনার সময় শুধুমাত্র মেধামনস্কতায় আচ্ছন্ন থাকতাম না। পক্ষান্তরে, যেটার উপর গুরুত্ব দিতাম তা হল গিয়ে —সৃজনশীল মননের সঙ্গে আমাদের নিরন্তর দ্বৈরথ। তাদের মধ্যে অনেকেই দলবেঁধে এসে নৃত্যগীত পরিবেষন করত এবং আমরা তৎক্ষনাৎ সেগুলিকে পরবর্তী অধ্যয়নের বিষয়বস্তুতে পরিণত করতাম।

ডেলবার্গে, আমরা বিচ্ছিন্ন কোন পুঁথিগত বিশেষত্বের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বরং শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণের এই চিরায়ত প্রক্রিয়াটির সামগ্রিক অন্বেষায় জোর দিতাম। আমাদের কেন্দ্রিত অনুপ্রাণনা ভাষাসাহিত্যমুখী নির্ভরতার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকত, যার মূল ভাবধারাটি ছিল জৈবিকবৃত্তি দ্বারা চালিত মানুষের যুগপৎ ভাষা ও সাহিত্যের স্বরায়ণ। তাই আপনারা বিস্মিত হতেই পারেন যে আমি প্রায়ই প্রারম্ভিক স্তরে কাজ শুরু করতাম রবীন্দ্রনাথের

'সহজ পাঠ' দিয়ে। শিশুদের এই চমৎকার বইটি পড়ানো হত তাঁর শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক বিদ্যালয়ে। বইটিতে 'বর্ণপরিচয়' ঘটানো হয়েছে 'বাগধারা'-র সাহায্যে, ছড়ার মাধ্যমে বা গদ্য দিয়ে যেখানে ছড়ার মেজাজটি রাখা হয়েছে। বিশ্বখ্যাত মনীষীরা, যেমন লোথার লুৎসে বা নরিহিকো উচিদা — এঁরা ছোটদের পড়ার ক্লাশে গিয়ে নিজেরাই কখন শিশু হয়ে উঠতেন। আমার কাছে এ এক অমেয় প্রাপ্তি যেদিন দু-একটা ক্লাশ নেবার পর লোথার আমার রুমে ঢুকে বললেন- " অলোকরঞ্জন, চলো আমরা দুজনে মিলে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার জার্মান-অনুবাদের একটা সংকলন বের করে ফেলি"। আর সত্যি সত্যিই এমন একটি বই প্রকাশিত হল— 'GANGESDELTA' (১৯৭৪) নাম দিয়ে, যে সংকলনটিতে স্থান পেয়েছিল সমসাময়িক বাংলার তথা ভারতের নির্বাচিত কিছু কবিতা সহ বাংলাদেশের কবিতা, পরবর্তী সময়ে যা জার্মানিতে একটি উচ্চতর সিলেবাসে পাঠ্যবই-এর মর্য্যাদা লাভ করেছিল এবং আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও অন্যত্র সবার জন্য এই বইটি অবশ্য-পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

তুলনামূলক সাহিত্যের মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে আমাদের অন্যান্য ভাষা-ভাষী অনুষদবর্গের কাছে নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বস্তুতপক্ষে কারো পক্ষেই সমস্ত ভারতীয় ভাষাগুলিতে দক্ষ হওয়া সম্ভব নয় যার ফলে আমাদের ক্লাশগুলি একাধিক ভাষার অধ্যাপক-এ অধ্যুষিত হয়ে থাকত। যেমন ছোটগল্পের ক্লাশে অথবা উপন্যাস ক্লাশে দেখা যেতে লাগল, যুগ্মভাবে বাংলা-তামিল কিংবা মারাঠী-কন্নড় অথবা হিন্দী-উর্দু ক্লাশগুলি একযোগে চলছে। সে সব ক্ষেত্রে, যে সব ছাত্রছাত্রী এ ধরণের যুগ্মক্লাশে অভ্যস্ত হচ্ছে তাদের স্নাতকোত্তর বিভাগের পরীক্ষায় অথবা গবেষণার কাজে কমপক্ষে দু-দুটি সাহিত্যে/ভাষায় কাজ করার প্রবণতা এসে যেত। এই প্রবণতার ফলে এমন প্রণোদনা তৈরী হয়েছিল যে একটি কর্মশালায় বাংলাভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যার পরিচালনভার ছিল Institute of Sinology and Japanese Studies'-এর হাতে এবং সেটা উৎসর্গীকৃত হয়েছিল ভারত, চিন ও জাপানের তিন আধুনিক লেখকের নামে।

যে ব্যাপারটা আমাদের কাছে গুরুত্ব পেত, তা ছিল — সমকালীন ভারতীয় লেখনের মাতৃভাষাশ্রিত লেখাপত্তরের গভীর অধ্যয়ন। একদিন পন্ডিত আইথাল, কন্নড় ভাষায় বিরচিত অনন্থমূর্থি-র গল্প-'সূর্যের ঘোড়া' আমাদের পড়ে শোনাচ্ছিলেন। সেখানেই তিনি আমাদের জানালেন —'কন্নড় ভাষা ৪ কোটি দক্ষিণ-ভারতীয় লোকের মাতৃভাষা তথাপি শুধুমাত্র একটি অঞ্চলের অধিবাসীরাই এই ভাষা বোঝে। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত কন্নড়-সাহিত্য ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হচ্ছে এবং তার থেকে অন্যান্য ভাষায়, সারা দুনিয়ার কাছে কন্নড়-ভাষার দরজা বন্ধ; যদিও এই ভাষায় সাহিত্য হাজার বছরেরও বেশী পুরোনো। এ প্রসঙ্গে আমাদের মারাঠী ভাষার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সোনঠাইমার এই লেখকের উপর একটি জ্ঞাতব্য পাদটীকা

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

সংযোজন করলেন —"অধ্যাপক অনন্থমূর্থি এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন — হিন্দু জাতির মধ্যে কুলীনশ্রেষ্ঠ; যার অর্থ, এক নিবিড় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে বেড়ে ওঠার এক নিশ্চিন্ত আশ্বাস। তাঁর লেখা বই 'সংস্কার'-ই তাকে প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে। তারপর তিনি আরো দুটি উপন্যাস, বহু ছোটগল্প এবং কবিতা, একটি নাটক এবং একাধিক সাহিত্য সমালোচনা রচনা করেন। একজন লেখক হিসেবে তিনি বারে বারে বর্তমানের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতা টেনে এনেছেন, পারস্পরিক বিরোধিতাপূর্ণ ঐতিহ্যের লড়াই, তিনি নিজের জীবনযাত্রায় অনুভব করেছিলেন, প্রায়শই। অধ্যাপক অনন্থমূর্থির মতে বেশ কিছু শতাব্দীর এই সহাবস্থানই সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন এই ভাবে----

"আমার ঠাকুমা মধ্যযুগের, তার সঙ্গে তাঁর মূল্যবোধ ও স্মৃতিও। আমি সেদিক দিয়ে অনেকটাই আধুনিক। কিন্তু আমার শৈশব কেটেছে চসার- এর সমসাময়িক চতুর্দশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি সরাসরি 'ক্যানটারবেরি টেলস' থেকে টেনে বের করার মতই। আমি প্রথম যখন তা পড়লাম, তাদের লেখককে আমার সমকালীন বলেই মনে হয়েছিল। ডিকেন্স- ও প্রায় আমার সমসাময়িক কেননা ভারতবর্ষে তখন আমরা অনুরূপ সামাজিক অবিচার এবং শ্রমিক অসন্তোষ-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। শ্রীহীন শহরতলি- আরও সব কিছুই, যা দ্রুত শিল্পায়নের পায়ে পায়ে এসে পড়ে, সে সব লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। তথাপি পাশাপাশি চন্দ্রপৃষ্ঠে কী কী হচ্ছে তাও আমরা জানতে পারছিলাম। কয়েক শতাব্দীর এই যে সহাবস্থান, তা ভারতীয় সাহিত্যকে ধনী করেছে, বিভিন্ন ভাষায় তা প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষ কোন আগ্রহকে ঘিরেই।"

এহেন এক পটভূমিতে ঋদ্ধ হয়ে আমরা তাঁর মূল গল্প-সূর্যের ঘোড়া- র সহযোগী গল্পগুলি গভীর মনযোগ নিয়ে শুনতে শুরু করলাম এবং সে সময় আমাদের অনুভূতি হচ্ছিল, যেন কোন মন্ত্র মন্দ্রিত হচ্ছে। আমরা আবিষ্কার করলাম, বস্তুতপক্ষে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই, লেখক অনন্থমূর্থি তাঁর লেখার মধ্যে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু 'অনন্ত'-কে সবরকম সামাজিক সংস্কার এবং প্রথার জাল থেকে মুক্ত করতে চাইছেন-ভারতীয় ব্যাপার-স্যাপারও রয়েছে এর মধ্যে, এক প্রতীকী জঙ্গল, যা সমগ্র মানবসত্তার স্মৃতিভান্ডার হিসেবে প্রতীয়মান করতে চেয়েছেন-

"অনন্ত, অনন্ত, এখন তুমি জঙ্গলে প্রবেশ করেছ। জঙ্গলে প্রবেশ, জঙ্গলে প্রবেশ......বৃক্ষ, বৃক্ষ, বৃক্ষ... বৃক্ষের মাঝখানে ...একটি টিয়ে। সবুজ টিয়ে......পাতার আড়ালে এক সবুজ, সবুজ টিয়ে......এক সবুজ টিয়ের বাঁকানো ঠোঁট, বাঁকানো ঠোঁটে একটি লাল ফল, লাল, লাল ফল......"

আমি এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্মৃতি রোমন্থন করছি যেখানে আন্তআঞ্চলিক অথবা আন্তবিষয়ক ভাষার শিক্ষাদান নিয়মিতভাবে করে থাকে Department of Modern

Languages & Literatures, যেখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রী, সমস্ত ভাষার অনুষদবর্গ, অতিথি অধ্যাপক এবং মানববিদ্যা, ধর্মতত্ত্ববিদ্যা, শিল্প-ইতিহাস বিভাগের অংশগ্রহণকারীরা-সবাই এই বন্ধুত্বপূর্ণ বিতর্কে যোগদান করেছেন এক বিশেষ মহৎ অনুসন্ধিৎসায় অংশীদার হতে, যৌথভাবে।

আমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে, চিরশিক্ষার্থী এক শিক্ষকের ভূমিকায় এমন একটি সৃজনমুখী আকাদেমিক তথা নান্দনিক ঐতিহ্যের শরিক, যাকে আমি, গ্রহণযোগ্য শিক্ষায়তনের কাঠামো হিসেবেই দেখতে ভালোবাসি; যা শুষ্ক, প্রথাজীর্ণ বিদ্যার্জনের বালাই থেকে মুক্ত।

১৭ই মার্চ ২০০৮ কলকাতার 'ম্যাক্স মূলার ভবন'-এ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রদত্ত ইংরেজি ভাষণটি দিয়েছিলেন। জার্মানির -ডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভারততত্ত্ব' ছিল তাঁর অধ্যাপনার বিষয়। সেই বিষয়টি বাস্তবজমির উপর অগ্রসৃতি ঘটেছে। নবায়ন ঘটেছে। তার উপর এই কথন।

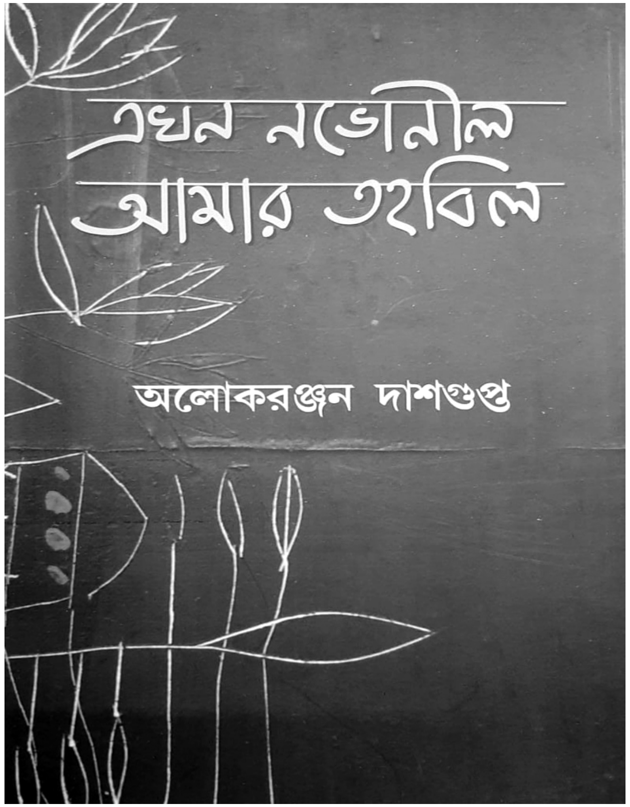

অলোকরঞ্জন : হয়তো একটু অন্যরকম
গণেশ বসু

এইতো ছিলেন ! আজ তিনি স্মৃতিতেই।
শব্দে ভাষ্যে সুরবাহারেই শ্রুত
স্বাভিমানী রোদ, সৌম্যতা স্থানচ্যুত।
বৌধিচর্যার যৌবনবাউলেই
কবে যে প্রথম আশ্রয়ে আপ্লুত
ভুবনডাঙায় মনে নেই, মনে নেই।

১.১. তবে, মনে আছে প্রথম পরিচয়েই অপরিচয়ের আঁধার আবরণ খসিয়ে উজাড় করে দেন অগ্রজের অলৌকিক প্রশ্রয়, অবারিত আনুকূল্য দেখান স্নেহের কোমলগান্ধারে। খণ্ড সময়ের নিরিখে সেটা হয়তো ছিলো উনিশশো ষাটের গোড়ার দিক। সেই থেকে ঘটে তাঁর কাছে জ্ঞানভিক্ষুর মতো আমার উপস্থিতি। উনিশশো চৌষট্টিতে আমার 'বনানীকে কবিতাগুচ্ছ' প্রকাশিত হ'লে তিনি সেই প্রথম প্রস্থানকে অযাচিতভাবেই অভ্যর্থনা জানিয়ে আকর্ষক আলোচনা করেন 'অমৃত' সাপ্তাহিকে, যা সমবয়সী কোনো কোনো কবিকে করে তুলেছিলো অসূয়াক্রান্ত।

১.২. কাছাকাছি সময়ে তৈরি হয়েছিলো 'কবিতা সংসদ'। বহুমুখী সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখানো নানা বয়সী কবিদের নবনির্মিত সংগঠনটির শিকড়স্থপতি ছিলেন কবি মণীন্দ্র রায়। তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বিশেষভাবে তরুণ সান্যাল, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায় সহ একঝাঁক কবি। ঘরোয়া আলোচনা হ'তো—কবিতার পাঠক বাড়ানোর জন্যে কী কী করা যায়। করা দরকার। প্রকাশ্য অধিবেশনও হ'লো। সেই উপলক্ষে বেরুলো নয়নশোভন মুদ্রণে একটি মূল্যবান কবিতাসংকলন। প্রকাশনাকেন্দ্রিক দেখভালের দায়িত্বে আলোকদার ভূমিকা ছিলো অন্যতম অগ্রনায়কের। আমি ছিলাম খানিকটা ছায়া সহচর। সেই সময়েই লক্ষ্য করি তাঁর কথনশৈলীর অনন্যতা। উষ্ণতার ভাঁজে ভাঁজে কখনো তির্যকতার তীক্ষ্ণতা, আবার ধ্রুপদীয়ানার মুখচ্ছদ সরিয়ে অনুজের প্রতি অগ্রজের মোলায়েম উৎসাহ। অধ্যাপনার বলয়স্থিত হ'য়েও কর্মিষ্ঠ অলোকরঞ্জনের 'আমি তোমাদেরই লোক'-এর সহজ, স্বচ্ছন্দ চলাফেরা, বাউলস্বাভাবিকতা।

১.৩. মধ্যষাটের হেলেপড়া অপরাহ্ন। বলা নেই, কওয়া নেই, আগাম আভাস নেই, একেবারে আকস্মিকভাবেই তিনি সান্দ্র আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের বাসায়। তখন থাকতেন যাদবপুর সেন্ট্রাল পার্কসলগ্ন এস. সি. মল্লিক রোডের ভাড়াবাড়িতে। উপলক্ষ ছিল বাগ্‌যত,

তবে আভাসিত ছিলো রসনাতৃপ্তির সন্তোষসাধন প্রয়াস। ভিতরে ভিতরে চিন্ময় অস্থিরতায় সন্ধ্যান্তে যথাবিধি উপস্থিত। কথায় কথায় অনাবৃত হয় সুবিনীত সমাচার। শিঞ্জিত সুগন্ধিত অহার্যের মরমি আয়োজন। পোড়া মাটির সুশোভন পাত্রেই চর্ব্যচোষ্যের পরিবেশন। সেদিন টের পেয়েছিলাম অলোকদার মর্মে মর্মে লোকায়ত মুঞ্জরণের আ-সন্তাবিস্তার। স্মৃতি থেকে যায় স্মৃতিতেই। ক'বছর বাদে বাতাসে বাতাসে বিষাদবার্তা। শ্রুতি কি গুজবসঞ্চারী? প্রাণিত পূর্ণিমা কি নিষিদ্ধ কোজাগরী?

১.৪. অলোকরঞ্জন ছিলেন অনেকেরই শরণ্য স্বভাবিক। উদার ছিলেন শিল্পীমাত্রকেই সহায়তা তুলে দিতে। হৃদয় ছিলো তাঁর উপচিকীষুর আশ্চর্য আধার। লোকরণ্যে মিশে যাবার সহজ স্বভাবে ছিলেন ঋদ্ধ। একবার কানে এলো তিনি আমার খোঁজ করছেন। দেখা করলাম তড়িঘড়ি। সেখানে তখন হাজির ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরেক অধ্যাপক। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। অলোকদা তাঁর শুভানুধ্যায়ী এক কাঠগোলার মালিকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। এও জানালেন সেই মানুষটি থাকেন কাঁকুলিয়া রোডে, কবি সুশীল রায়ের বাড়িরই প্রায়-লাগোয়া। তিনি বক্তার হিশেবে এক সময় যথেষ্ট খ্যাত ছিলেন এই বাংলায়। বিচিত্র এই মানুষটি অনেক ছোটোগল্প লিখেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি উপুড় করে। 'অমৃত' সাপ্তাহিকে তাঁর দু-একটি গল্প ছাপা যায় কি না, সেটাই ছিলো অলোকদার বাসনা। একদিন তাঁর বাড়ি গেলাম। সঙ্গী অলোকদা। অতি সজ্জন পরিবার। কয়েকটি গল্প পড়লেন গোপালদা, গোপাল সামন্ত। অবাক হয়ে গেলাম। কবিতার মতো ঠেকলো সেসব মণিমুক্তো। একেবারে টাটকা। অনাবিষ্কৃত ছোটো ছোটো দ্বীপের দেখা পেলাম। কয়েকটি গল্প নিয়ে গেলাম কাঠবেড়ালির ভূমিকায় মণিদার জন্য। 'অমৃতে'র কার্যকরী সম্পাদক, কবি মণীন্দ্র রায় চমকে গেলেন সে-সব পড়ে। গল্প ছাপা হতে লাগল ব্যবধানে ব্যধানে। অলোকদা খুশি, আমার স্বস্তি, পাঠকেরা পেলেন তাজা গোলাপের গন্ধ। অবশ্য গোপালদা আর আমাদের মধ্যে নেই, অলোকদাও পঞ্চভূতে লীন। গোপালদার গুদাম-ও আজ উধাও। সেখানে বহাল এখন 'মেঘদূত', পঞ্চাননতলার ব্রিজে ওঠার মুখে, ঢাকুরিয়ার অভিমুখে। এভাবে অলোকদা অনেক তরুণ কবি-গল্পকারদের জন্যই বাড়িয়ে দিতেন সাহায্যের হাত বিনিময় প্রত্যাশী না হ'য়ে, অনুরাগী বৃদ্ধির কৌশল ধরে রাখার সপ্তাহান্তিক আসর বসিয়ে। তা ছাড়া তিনি তো ছিলেন কোলকাতায় নিয়মিত অনিয়মিত, গ্যোয়েটের দেশেও পূর্ণতার সন্ধানে।

১.৫. প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক অলোকরঞ্জনকে দেখেছি একজন দরদি পরীক্ষক হিসাবেও। সালটা হবে হয়েতো ১৯৭৬। গিয়েছি তাঁর প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ্ রোডের বাসায়। আচমকাই আগমন। দাঁড়িয়ে রয়েছি বারান্দার গেটের বাইরে। সজাগঘন্টিতে দ্বিধা ছিল, কেননা তিনি তন্নিষ্ঠ ছিলেন কিছু খাতাপত্র দেখতে। আলতো করে গলা খাঁকারি দিতেই চমকে তাকালেন। মুহূর্ত বিলম্ব না করে অন্দরে আহ্বান জানান। শুনলাম, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের

স্নাতকোত্তর বিভাগের চূড়ান্ত পরীক্ষার মূল্যায়ন করছিলেন। লজ্জিত আমি। মুহূর্তেই বিদায় নিতে চাইলাম। উঠলো ওজর। বাধ্য যুবক। কথায় কথায় কৌতূহলী। কলেজের একজন অধ্যাপক হিসেবে জানতে চাইলাম, নম্বর কেমন উঠছে? স্মিত হাস্যে উত্তর এলো ন্যূনতম নম্বর পঞ্চাশ। ঊর্ধ্বতম একশোর কাছাকাছি। এটাই নাকি তাঁর দস্তুর।

১.৬. এক সময়ে 'অমৃত' সাপ্তাহিকে দেশ-বিদেশের সাহিত্যকেন্দ্রিক কাণ্ডকারখানার ওপর টুকরো-টুকরো খবর দিতাম 'সিদ্ধার্থ' নামের আড়ালে। জানতাম না অলোকদা ছিলেন সেই পৃষ্ঠাটিরও নিবিষ্ট পাঠক। ধরা দিলেন অবশেষে একটি মিত পত্রে। স্নেহার্থীর প্রতি অকৃপণ অনুরাগে রৌরকেল্লা থেকে ৮.১.৬৫-তে লিখলেন, "ভাই গণেশ, আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদর্শনীসূত্রে আমাদের ছোট্ট ছুটি চলছে—সেজন্যেই সম্ভবত টেলিফোনে আমাকে পান্‌নি।

আমি আস্চে সপ্তাহে ফিরবো ভাবছি। ও সপ্তাহের শেষ দিকে শুক্রবার/শনিবার সকালে যদি আমার বাড়িতে আসতে পারেন, আপনার পত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়।

আশাপূর্ণা দেবীর বক্তব্য অংশত সমর্থন করি, অংশত অস্বীকার করি। কিন্তু অমৃতের এ সংখ্যায় 'সাহিত্যজগৎ'-এ সিদ্ধার্থ কেন স্পষ্ট ভাষায় নিজের মতামত জানালেন না? সিদ্ধার্থের রচনাটি অবশ্য প্রসঙ্গোত্তাপে উষ্ণ, উপভোগ্য!

আশা করি সমস্ত কুশল। আমার স্নেহশুভেচ্ছা জানবেন। প্রীত্যর্থী অলোকদা।"

১.৭. অলোকরঞ্জন ছিলেন সবার কাছেই প্রেরণার রোদ্দুর। ২৬.৪.৭৮-এ **79U/m/ DONAU Amselweg 44, West Germany** থেকে লেখা একটি চিঠিতে প্রসঙ্গত জানাতে ভোলেননি "বলাকা রবীন্দ্রনাথের পালাবদলের প্রথম বৈপ্লবিক অঙ্গীকার। আমি তাকে শরৎ-চিহ্নিত করবো না 'শেষ সপ্তক'কে হয়তো ঐ পরিচয়—শারদীয়তার দেওয়া যায়। 'বলাকায় অবশ্য সাদা রঙের ছড়াছড়ি এবং প্রাচীন ভারতীয় অনুষঙ্গ দিগ্বিজয়ের বাসনা আছে। কিন্তু রাবীন্দ্রিক উত্তরণের প্রবণতা—যেখানে প্রাচীন শরৎ রাবীন্দ্রিক শারদীয়তায় রূপান্তরিত—ওখানে নেই। 'পূরবী'কে বিষাদলেখ বলতে আপত্তি নেই।

মানুষের সুমঙ্গলশক্তিতে আমার আস্থা অটুট যদিও তার অণুতে-তণুতে অনেক ঘুণ ধরা চক্রান্তলক্ষণ ঠাহর করতে পেরেছি। সেসব কথা দেখা হলে আলোচনা হবে। এ চিঠি শেষে আবার জ্ঞাপন করি সর্বজয়ী প্রতীতির ধর্ম, ভালোবাসা।

আপনাদের অলোকদা।

পুনশ্চ আমরা গ্রীষ্মের 'বাঁকে কলকাতা যাবো, এখনও এরকমই ঠিক আছে। আপনার গবেষণার এই পরিণতিতে বিপন্ন হবেন না, আপনি সৃজনধর্মী তাই।"

এর আগে একই জায়গা থেকে চিঠি লিখে অনুরোধ, নাকি নির্দেশ, জানান “ অমৃত পূজা সংখ্যায় অন্যবারের মতো এবারেও কবিতা দিয়েছিলাম। প্রকাশিত হয়েছে কিনা, জানাবেন? প্রকাশিত হলে তার একটি কপি-সমগ্র পত্রিকাটি সম্ভব না হলেও পাঠাবেন আমাকে?

আপনার সমস্ত খবর দিয়ে চিঠি দেবেন। যদি কোনো কাজে লাগি, জানাতে দ্বিধা করবেন না। ভালো থাকবেন। প্রীত্যর্থী অলোকদা।”

আবার লেখেন ১২ জুন ’৭৪-এ, উলম্ থেকে। “প্রিয় গণেশ এইমাত্র পৌঁছলো আপনার সানন্দ স্বাক্ষর। অনেকদিন সাড়া পাইনি, অভিমান জমে ছিল মনে, শ্রাবণী শারদীয়তায়। আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগছে।

আপনাদের দুজনকে জানাই যুগ্ম অভিমুখিতা, ভালোবাসা। এর পরের চিঠিতে সমস্ত খবর জানাবেন।

অনেকের কাছে, অনেকবার আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেছি। কেউ আর সঠিক খবর দেয় না আজ। নাকি আমিই আমিই জানিনা প্রশ্ন করার মৌল ধরন?

যদি আপনার কোনো কাজে লাগি, এখুনি জানান। দুজনের ভালোবাসা, আবার, দুজনকেই। অলোকদা।

পুনশ্চ।। চিঠি চাই। আপনাদের হাইনে-সংগ্রহ কতোদূর? চিত্তরঞ্জন ঘোষ কি পুব জার্মানিতে? অ.”

১.৮. এই সতত প্রসন্ন, বিশ্বনাগরিক মানুষটি ছিলেন স্বদেশের সারস্বত সংবাদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় জাগর পিপাসু, ছিলেন অপ্রতিম মননদীপিত, মিলন মাঙ্গল্যে আবেগতাপিত। সারল্য ছিলো যেমন শ্রমণোপম, তেমনি রুদ্রাক্ষপ্রতিম অভিমানও। স্বভাববিরুদ্ধ নিন্দনে গোধূলিবিধুরতা। নিরুচ্চার ক্ষমা করেছেন কোনো এক প্রিয় সহকর্মীর কলুষ কৃতঘ্নতাও। তর্জনী তুলে বলেননি কখনো ধিক্, ধিক্, ধিক্।

সময় থাকতে থাকতেই ফিরে আসতে চেয়েছিলেন একবার তাঁর আত্মিক আশ্রয়ে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রার্থিত ছিলো ছাত্রছাত্রী ও সুহৃদ সহকর্মীদের সাহচর্য। এমনটাই আভাসিত ছিলো তাঁর স্বরে, যেমনটি অনুব করেছি একদা। কিন্তু সিদ্ধকাম হননি। দেয়ালের কানে নাকি ভেসে আসতো ব্যূহচক্রের ছাড়াছাড়া সদালাপ। সুমসৃণ বিরোধিতা পৌঁছে দেওয়া হতো সম্ভবত যথোপযুক্ত স্থানে। ঘোঁট পাকিয়ে, প্রতিবন্ধকতা নির্মাণে নায়কত্ব দিচ্ছিলেন শোনা যায়, মেঘের আড়ালে থেকে কূটদক্ষ তাঁরই প্রিয়জনটি। বিবেকী বন্ধুর নির্বিবেকী আচরণে অলোকরঞ্জন মর্মাহতই হন। অভিমান ফল্গুবহ। পল্লবিত স্মৃতিবিলাসে অলোকদা থেকে যান উজ্জ্বল উদাসীন।

২.১. জ্যোৎস্নার মতো বিনয়ী অলোরঞ্জন
শানিত খড়্গ প্রয়োজনে প্রতিবাদ
কালের কলসে কালাতীত আস্বাদ
কবিতার সীমা আভুবন থাকে অর্জন
প্রজ্ঞার মতো মরমি অলোকরঞ্জন।

২.২. সংকটের বীজে তিনি ছিলেন চৈতন্যের ফসল। এক রৈখিকতার বদলে ছিলেন বরাবরই বহুরৈখিক। ‘যৌবনবাউলে’ই রয়ে গেছে তার সুমিত স্বাক্ষর। সচেতনভাবেই ধরেছেন স্বরগ্রামের বিভিন্নতায় সময়, সমাজ, মানবমানবী। তাঁকে নিয়ে, মানে তাঁর কবিতা নিয়ে একসময়ে মনে হতো পিকাসোই যেন বাংলায় লিখছেন গ্যের্নিকা, ড্রেসিং টেবল, অ্যাকর্ডিওনিষ্ট, ক্রন্দনরত মহিলা; কিংবা, ব্রাক-এর কল্পভাষে বেহালা ও কলস, গিটারসহ মানুষ; কিংবা কান্দিনিস্কির বন্যা এলো মনে প্রভৃতি।

শব্দনির্মাণে তিনি কিংবদন্তি, বাক্যবন্ধে প্রবাদপ্রতিম।

যাপিত সময়ের অনন্বয়ী টানাপোড়েনকে মেধাস্থ করেও অলোকরঞ্জন প্রায়শই ঘটাতেন ভাববিস্ফোরণ, রাখতেন আগ্নেয় স্বাক্ষর। বলতে কসুরও করেননি—

‘যে ছিল শহিদ সে ছিল প্রেমিক
আর এই দুই সত্তা যখন
মিলে মিশে যায় এক মোহনায়
মহাবিপ্লবী শুধু তাকে বলা যায়।”

তাঁর অকম্পিত এমন উচ্চারণে দেশকালের মেঘ সরে যেতে চায়, রোদ ঝলকায় “গুজরাটের কোনো একটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন অপরাধীকে সরাসরি দায়বিদ্ধ করতে পারি না? সেটাই হতে পারে সংগ্রামী শান্তির সপক্ষে আমাদের প্রথম সুনিশ্চিত পদক্ষেপ।”

আমার কাছে আলোকরঞ্জন ছিলেন বিতর্কমুখী মানবিকতারই মহান্বিত মুখ। তাঁর আত্মতায় ছিল গ্রিক মনীষা, বৈদিক বোধ ও মৃত্তিকাস্পর্শী বৌদ্ধিক বিভাবের সংশ্লেষিত প্রজ্ঞা। বের্টোল্ট ব্রেখট, ইংগসার বের্গমান ও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের স্মৃতিবিহারও স্বতশ্চল। এমনকি, হেগেলীয় চিন্তনের পাশে মার্ক্সীয় মান্যতা দ্যুতিময়।

২.৩. আমার প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ ‘নরকরোটিতে প্রজাপতি’ প্রকাশিত হয় ২০১১-এর মার্চ মাসে। সেখানে দুটি স্বতন্ত্র সন্দর্ভে (‘মিথ ও বাংলা কবিতা’ এবং ‘কালশুদ্ধ বাংলা কবিতা’-য়) যা লিখেছিলাম তার খানিকটা হলো—

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায়ও পুরাণপ্রসঙ্গটি আসে একেবারে ভিন্নতর তাৎপর্যে।

তিনি ভাঙেন দেশ-জাতির গণ্ডি। তাঁর কাছে আছে একটা বিশ্বদেশ। ফলে, তিনি স্বদেশি, বিশ্বদেশি। সময়ের নাগরিক এই কবি বলেন, 'জানেন কি সুমেরিয়ায় সেই দেবীকে/ইনান্না যার নাম?/ জন্মেছিলেন তিনি মিলেনিয়াম/প্রাক্-যীশু তারিখে।'

চণ্ডীমঙ্গলের বুলান মণ্ডল হয়ে উঠল আধুনিক—

'দেরি নয়, আমার দুহাত ধরে তোর বাড়ি চল্,
আমারও অনেক ধান হাতে ছিল, বুলান মণ্ডল!'

আবার, দম্পতিচুম্বনে আশ্লিষ্ট দুটি মেঘ যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে 'ঈশ্বর নশ্বরে' কবির কল্পনায় জন্ম নেয় তখন মিথের ব্যবহারে তো অসামান্যতা পায়—

'একবার তাঁকে রাধার সঙ্গে দেখলাম
বাঁশরী ওষ্ঠে, কম্প্র অসমভঙ্গে,
তারপর তাঁকে পাহাড় ভাঙতে দেখলাম
কেউ নেই তাঁর অঙ্কে।' (পৃ. ২০৩)

পুনরুদ্ধারের বাসনা চাগাড় দিয়ে উঠতেই জানাই— অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এক আবহমানকালের স্বদেশ-বিদেশ জীবন-প্রস্থান আত্মস্থ করেছেন। আদিবাসী জীবনের ঈশ্বর ও রূপচেতনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বরের মধ্যে তিনি তাঁর কবিতায় সেতুবন্ধ গড়ে নেন। বুধুয়ার ডাকে কীভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসে তার খোঁজ পেয়েছিলেন কবি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা উজ্জ্বল হয়ে উচ্চারণ করত 'তামসী আমার গৌরী, তাকে দাও আলোর শুশ্রূষা।' দু-দিন কলকাতার বাইরে কাটিয়ে শহরে ফিরে আসতে মন না চাইলেও ফিরে আসতে হত তাঁকে, আর নিজেকে দিতেন স্তোক—

"তবু নিলাম দুটি দিনের দুঃখসুখ
নিরিবিলির ছায়ানিবিড় কথাকলি,
চূর্ণ হোক কলকাতার কালো গলি:
ব্যথার কুঁড়ি গানের ফুলে ফুটে উঠুক।"

কখনো কখনো তাঁকে মনে হয় ভ্রাম্যমাণ রামনাথ বিশ্বাস, যিনি রোদ্দুর হয়ে ঈশ্বরের জ্যোৎস্নাপান করানো বৃক্ষ খুঁজে পান। লৌকিক শব্দ থেকে অনায়াসে চলে যান তিনি নতুন নতুন শব্দবন্ধ গড়ে নিয়ে, কিংবা স্বল্প-পরিচিত তৎসম শব্দের মণ্ডলে। এক অদ্ভুত দোটানায় আবার পড়ে যায় তিনি কখনো কখনো। স্বদেশি লৌকিক বৃত্ত থেকে পশ্চিমি জীবনবৃত্তে যান, আবার ঘুরে ঘুরে ফিরে আসেন কিন্তু সেই ঈশ্বরেরই কাছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস থেকে খ্রিস্ট— সবাইকেই তাঁর আপনজন মনে হয়। প্রেমের আসঙ্গ হয়ে যায় তাঁর কাছে কখনো পূজা, সাজ্জাদ হোসেনের সানাই, এমনকী বুদ্ধদেব বসুর নিষেধ। খুব সহজ সরল অভিপ্রায়

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

প্রকাশ করেন তিনি শব্দ কাঠিন্যের অবয়বেও কখনো। ঈশ্বরবোধ ও মানবিক এক সমাজের আকাঙ্ক্ষায় তিনি যে মানবসমাজ দেখেন সেটাই তাঁর ইতিহাসবোধ—

"আহত পাখিটি মানুষের মতো টাস্‌টাস্
প্রজ্ঞা বলছে, স্পষ্ট শুনেছি। সে-পাখি
নয় বিধাতার ক্রীতদাস,
জ্ঞানের ব্যথায় একাকী।"

কিংবা

"আহত মানুষ পশুর মতন, নখরে
আদিম পাথর, যতই টগর করবী
তাকে দাও, সে যে হাঙরের মতো গিলবে সে-ফুল হাঁ করে,
আমার অভিজ্ঞতায় সে এক মানবী।"

মানবীকে এই অসুন্দর দেখা অলোকরঞ্জনের নানা রিলিজিয়নের অনুসরণে সময়চেতনা, তা ইতিহাসচেতনাও। এই সময়চেতনা-ই অন্য মাত্রা নিয়ে এ কবির কবিতায় সোচ্চার হয়ে ওঠে তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও—

"গাইতে গিয়ে লাগল বুকে
বুলেট এসে, মারছে যে জন
বলে উঠছে সকৌতুকে
'খুন কারাটাই শিল্প এখন।"

সীমাহীন বিস্ময়ে, বেদনায়, রক্তক্ষরণে বলেন—

"...আর
এই যে পূর্ণচাঁদ
হেসে উঠল তার ভিতরেও
একজন জল্লাদ

উদ্যত হয়ে রয়েছে,
এ কী রে বিস্ময়!
এতটা গণতন্ত্র
চাইনি তো নিশ্চয়।"

৩.১ অভিদৃষ্টিতে মুহূর্তভিন্নতা

ঊর্ণাতন্তু নয়
বহুত্ববাদ উথল উজ্জ্বলতা
সহনীয় নিশ্চয়

বরেণ্য বিস্ময়
অন্বেষাপ্লুত মসৃণ মুগ্ধতা।

৩.২. দিনক্ষণ ঠিক আর মনে নেই। তবে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দশকওয়ারি আলোচনার শুরুটা হয়েছিল সম্ভবত গত শতকের অপরার্ধে। ১৯৫৫ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদের মুখপত্র 'একতা'য় সচেতনভাবে 'দশক' শব্দটি ব্যবহার করেন সেদিনের তরুণ কবি ও পত্রিকা-সম্পাদক তরুণ সান্যাল। দেখতে দেখতে বিষয়টি হয়ে যায় সময়চিহ্ন। একে এড়িয়ে যেতে সেভাবে পারেননি আলোচকও।

কবি অলোকরঞ্জন, এই দশককে মান্যতা দিয়ে, কবিতার চারিত্র্যলক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন, যা নিয়ে আমার কিঞ্চিৎ মতদ্বৈধতা ছিলো। তা নিয়ে অলোকদার সঙ্গে আলোচনাও করেছিলাম। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দশকচিহ্নিত আধুনিক কবিতার আলোচনায় যেভাবে চিত্রলেখের সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করেন তা ছিল যেমন বীক্ষণপূর্ণ তেমনি অভিনব। পাঠকের জ্ঞাতার্থে কবির কথা এবং অনুরাগীর চপলতা সে সময় যা ছিলো উল্লেখ করলাম।

"We attempt to illustrate through the help of a graphic scheme in preferential order, how different factors have been at work and the poets of the three different decades referred to. We use the following symbols for the corresponding factors :

R – Receptor
C^1 – Crisis
C^2– Creator
O – Objective Correlative ("a set of objects, a situation, change of events which shall be the formula of that particular emotion." T. S. Eliot.
P – Programme
C^3 – Communication

We consider here a five-dimensional space. Let axes OX_1, OX_2, OX_3, OX_4, OX_5 denote, in order of preferance, the factors operating in a creative process generating communication.

I. Peots of the 4th decode :

A crisis sets the pace. The creator finds out an objective Correction relation to the given crisis and circle of Receptors and spells out this programme. Communication depends on the co-ordination of all these factors.

Thus Ox_1, OX_2, OX_3, OX_4, OX_5 represent respectively C^1, c^2, O, P.

See Diagram I (for three components only).

The quintiple in order of priority determining Communication R, C^2, O, P.

II. Poets of the 5th decode :

Here the Recepter plays the predominate role. Therefore R occupies the OX_1 axis

Then comes P. See diagramm II (for three components only).

The corresponding quimuliple in this period is R, P, C^2, O, C^1 determining C^1

III. Poets of the 6the decode :

In this period C^2 Plays the prime role. See diagram III (for thue components only.)

In this period the corresponding quintuple would be c^2, C^1, B. P. R deferming C^3.

The quintuples of three periods are presented for compasrision :

I	C^1, R, C^2, O, P
II	R, P, C^2, O, C^1
III	C^2, C^1, O, P, R

DIAGRAM I

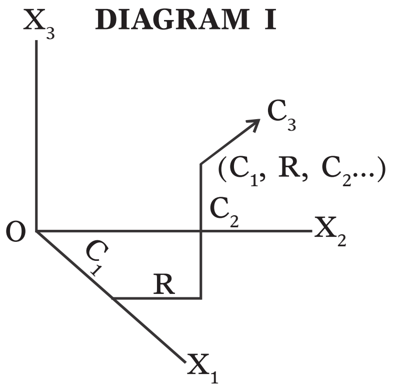

DIAGRAM II

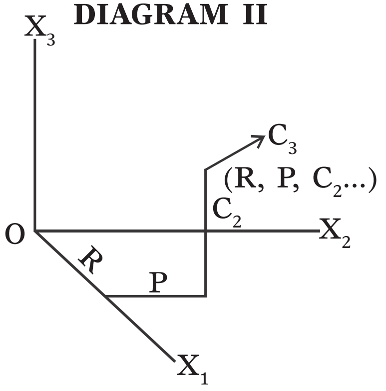

DIAGRAM III

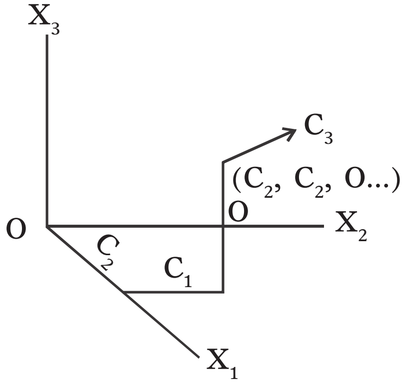

[South Asian Digest of Regional Writing : Vol. 2. P. 57,58, South Asian Institution University of Heidelberg]

৩.৩ বাংলা কবিতার দশক চিহ্নিত আলোচনার সার্থকতা প্রতিপাদনে অলোকদার বক্তব্য চমৎকারিত্বের ছোঁয়ায় মুগ্ধতার সৃজন ঘটায়। তাঁর মত অনুযায়ী চতুর্থ দশকের কবিদের রচনায় সংকটই গ্রহণ করে সর্বপ্রধান ভূমিকা। পঞ্চম দশকে গ্রহণকারী আর ষষ্ঠদশকে স্রষ্টার ভূমিকাই সর্বাত্মক।

আমার মতে আধুনিক কবিতা নির্মাণে সংকটই মৌল-ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম-মহাযুদ্ধোত্তর কালের কবিতায় প্রস্থানভূমিতে যেমন সংকট ফেলেছে গভীর ছায়া, অদ্যাবধি আধুনিক কবিতায় তার প্রমাণ নিহিত। অর্থাৎ চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ দশকও কবির সংকটেরই যুগ। আবার এ-যুগে তিনি গ্রহণকারীও বটে। চলিষ্ণু কবিসত্তা সবসময়েই অদ্বয় সম্পর্ক মানেন স্রষ্টার আত্মসংগতির সঙ্গে শিল্পের বিকাশে। শিল্পের কারণেই আত্মসচেতনার দীপ্তিবিকাশ অনিবার্য।

আধুনিক কবিতায় ঘটে শিল্পের সজ্ঞান অভীপ্সা। সে কারণেই Crisis সবসময়েই আসে থাকে। এর থেকে উত্তরণের চেষ্টাও করেন কবিরা, যে যাঁর নিজের মতো করে। এরই ফলে স্বরায়নের প্রভেদ, প্রসঙ্গেও প্রভেদ।

এখন সংকট যেমন সমাজিক, রাজনৈতিক অর্থে সত্য; সৃষ্টির সংকট, আত্মিক সংকটও তেমনি সত্যবাস্তব। ব্যক্তিত্বের সংকট কোন অংশেই তাই কম নয়। দুই সংকটকে আলাদা করে দেখার ফলেই বাংলা কবিতা আলোচনায় এক বাঁধাধরা সড়ক নির্মাণ হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে সহজ মান্য হয় "দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর উন্মূলতা, অনিশ্চয়তা, ব্যক্তিগত বিষণ্ণতা এবং বিশ্বগত বিপন্নতায় কবিরা নিজের হৃদয়ের কাছেই ফিরতে চেয়েছেন।" (কবিতা

কল্পনালতা ঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৩৩) বা ডঃ দাশগুপ্তের কথায় যে ষষ্ঠ দশকের কবিদের কাছে স্রষ্টার ভূমিকাই প্রধান, তারপর সংকট। আসল বিচার্য হওয়া উচিত, জীবন ও শিল্পের দুই প্রান্তকে কে, কতখানি শিল্প-আত্মায় ও আঙ্গিকে সার্থকতর, রসসৃজনে জ্যাবদ্ধ করতে পেরেছেন। উদাহরণ দেওয়া যাক। অলোকরঞ্জন, যিনি তথাকথিত দশক চিহ্ন ষষ্ঠ দশকের কবি, যখন বলেন,

আজকে তোমার আজন্ম বন্দীরা
মুক্তি পাবে, তাদের পণে তীর্থতোরণ খুলে
সূর্য হবে রক্তজবা তোমার সোনার চুলে (মুক্তধারা/যৌবনবাউল)
বা
মাঠে-মাঠে ওই ঝুমুর ছন্দে কাঁপছে চাষীর জীবনশৈলী,
ওরে মন, কেন গেলিনে সেখানে, নিজের মনের গোপনে রইলি?
ভুলে গেলি কেন কথা ছিলো তোর সবার অঙ্গে অঝোরে মিলবো ঃ
সেই-তো আমার স্বর্গসাধন, সেই তো আমার জীবনশিল্প!
(দুপুর' নির্জন দিনপঞ্জী/যৌবনবাউল)

তখন প্রথম উদ্ধৃতিটিতে সংকটের ভূমিকা এবং দ্বিতীয়টিতে গ্রহণকারীর ভূমিকা কি প্রধান বলে মনে হয় না? অনুরূপভাবে, পঞ্চম দশকের অর্থাৎ চল্লিশের কবি হিসেবে চিহ্নিত রাম বসু যখন বলেন—

আজো আমি মেলে দিই আমার অনাবৃত বাসনা।
আমার যন্ত্রণার বেদীমূলে জ্বালাই স্বপ্নের মাটির প্রদীপ
চেতনার সীমায় দাঁড়িয়ে ঢাকি শিশুর বিপর্যস্ত যুগ
বলি—'মৃত্যু, পৃথিবীর পোষণ-পুষ্ট আমাকে
মুছে ফেলতে পারবে না;— কিছুতেই না।" (স্বগত যখন যন্ত্রণা ঃ রাম বসু)

তখন স্রষ্টা গ্রহণ করেন প্রধান ভূমিকা। স্রষ্টা পাত্রটির চিৎমুকুরেই ঘটে সমগ্র বিষয়ের প্রতিফলন। স্রষ্টার বেদনা, যন্ত্রণা সূচীমুখ তীব্রতায় প্রতিস্বিক হয়ে ওঠে, নিহিত থাকে সার্বজনীন অভিজ্ঞতার সারাৎসার। ব্যক্তি 'আমি' শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত হয় 'আমরা'র অন্তঃসারের মধ্যে।

আবার 'চতুর্থ' দশকের (তিরিশের) কবি অমিয় চক্রবর্তীর লেখনীতে উচ্চকিত হয় যখন,

গ্রামে যাও, গ্রামে যাও,
এক লাগ হয়ে মাঠে নদীধারে
অন্ন বাঁচাও, পরে সারে সারে
চাবে না অন্ন, আনবে অন্ন ভেঙে এ দৈত্যপুরী,

তোমরা অন্নদাতা
জয় করো এই মানে বাঁধা কলকাতা। (অন্নদাতা)

তখন অলোকদার বলা Receptor-এর ভূমিকা এখানে প্রধান হয়ে ওঠে যেমন, তেমনি ষষ্ঠদশক পঞ্চাশের চিহ্নিত কবি তরুণ সান্যালের ভিতরেও দেখি তারই অনিবার্য ভূমিকা।

আমার চোখে অন্ধ ধাঁধা, বন্ধ্যা চোরাবালি
মানুষ কেন মুখ লুকিয়ে বাইলেনে ঘর করে
মানুষ মানুষ, প্রাণের এ কোন চিহ্ন জোড়াতালি
শহর শহর, প্রাণ কাঁপেনা দিনবদলের ঝড়ে!
(মাটির বেহালা ঃ তরুণ সান্যাল)

প্রকৃত প্রস্তাবে, সংকটই জীবন ও শিল্পের অদ্বয় আহ্বানে ঘটায় আত্মনিষ্ক্রমণ। শিল্পের কাছেই হয় অবীকৃত, জীবনের, সমাজের, সময়ের এক কথায় চৈতন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ।

কাজে কাজেই, সময়-সমাজ চলমান কবিসত্তা ও জীবনমান্যতায় অম্বিষ্ট থাকে যে-কোনো শিল্পের স্বরূপ।

৩.৪ যে কোনো যুগে বিশেষ সমাজআর্থনীতিক তাৎপর্যে কবি-শিল্পীর সামনে থাকে মূলত চার ধরণের অনন্বয়।

ক. তিনি প্রকৃতির নিয়ম ও কার্যকারণ সম্পর্কে কতখানি সজাগ ও সচেতন। এর উপরে নির্ভর করে তাঁর প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। যদি তিনি প্রকৃতির নিয়মগুলিতে ব্যাখ্যা করতে না পারেন, তাহলে প্রকৃতির যে-কোনো নৈসর্গিক ঘটনাকে 'ফেটিশে' উপাসনার মধ্যেও থাকে এক ধরনের আত্মনিবেদন, যা দৈবানুগ্রহ, ঈশ্বরের বিভূতি প্রকৃতিতে অথবা তার বিপ্রতীপে আপাত প্রাকৃতিক ক্রিয়াকেই পরম জ্ঞান মনে করে তার অনুরূপ প্রকাশ ঘটান।

খ. যে সমাজ মানুষ গড়ে তোলে তার আর্থনীতিক ও রাষ্ট্র-পরিবেশে থাকে শ্রেণিগত অবস্থানে বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য সমাজে শ্রমজীবী মানুষের আত্মপ্রকাশকে যেমন বিড়ম্বিত করে তেমনি মানুষ তাঁর শ্রমভিত্তিক অন্তঃসার বিশেষ শিল্পশৈলীতে ও কৃৎকৌশলে যখন আত্মস্থ করতে অক্ষম তখনও গড়ে ওঠে সমাজের সঙ্গে তাঁর আচরণগত, ভাবাদর্শগত সংঘাত।

গ. যে-শ্রেণির অন্তর্ভূত হয়ে তিনি উৎপাদন-পদ্ধতির বিশেষ অবস্থায় তাঁর শ্রেণির যদি সামাজিক বৈপরীত্যের বিরুদ্ধে সংক্ষোভ না থাকে তাহলে তিনি তাঁর শ্রেণিচৈতন্যের সঙ্গে ব্যক্তিচৈতন্যের বৈপরীত্যের ফলে নিজেকে অনন্বয়িত বোধ করেন।

ঘ. ব্যক্তিগতভাবে প্রকৃতি, সমাজ ও তাঁর শ্রেণিবিষয়ে রাষ্ট্রশক্তিসৃষ্ট কর্তৃত্বমূলক ভাবাদর্শ

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

বা বিবেকের সঙ্গে তাঁর মানবিক বিবেকের সংঘাত হয়। এর ফলে গড়েওঠে স্ব-বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্যগুলির কোনো-না-কোনোটির উপর মাত্রাছাড়ানো চাপ বা জোর গড়ে তোলে সেই যুগের শিল্প।

৩.৫. এবার, তাহলে দেখা যাচ্ছে বা যাবে, প্রাথমিক বৈপরীত্যকে মুখ্য করেই গড়ে উঠেছে আদিম কবিতা। তা প্রকাশিত আমাদের বৈদিক সূক্তে, লোকায়ত মন্ত্রে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বৈপরীত্য উতরে যাবার প্রয়াস পাওয়া যায় প্রাচীন, মহাকাব্য ও আমাদের মঙ্গলকাব্যে।

প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় বৈপরীত্য মেলে রোমান্টিক কবিতার উৎসারে।

আর, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ বৈপরীত্য উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস মিলবে আধুনিক কবিতায়।

এবং এরই জন্যে প্রকৃতির শক্তি বিষয়ে কবির চৈতন্য একদিকে যেমন বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজের সঙ্গে অনন্বয়ের বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানমনস্ক তেমনি আপন শ্রেণির তাৎপর্য বিষয়ে তিনি রাজনীতিমনস্ক। এবং তারপর আত্মস্বরূপ অন্বেষণে তিনি বিভিন্ন মনসমীক্ষাগত দর্শনসহ মার্কসবাদ বিষয়ে সচেতন। কেননা, তাঁর শিল্পকর্মের মধ্য দিয়েই সমস্ত বৈপরীত্য উত্তীর্ণ হয়ে যোগ্য সমাজপ্রতিষ্ঠানকে রূপদান করে মানবিক পরিপূর্ণ বিকাশই তাঁর কাম্য।

৩.৫. অলোকরঞ্জনেরও দাবি ছিলো, প্রার্থনাও বলা যায়—

"ছৌ-কাবুকির ছদ্মবেশে
চূর্ণ করে দাও যতো অলীক সীমান্ত..."

'এবার চলো বিপ্রতীপে' কাব্যগ্রন্থে আগ্নেয় অঙ্গীকারে বলেন,

"ভৃঙ্গারে ভ'রে রাখি নিঃশ্বাস
ভৃঙ্গারে ভ'রে রাখি নিঃশ্বাস
ভৃঙ্গারে ভ'রে রাখি নিঃশ্বাস যেন ভবিষ্য ভ'রে
বিশ্বমানুষ নিঃশ্বাস নিতে পারে।"

তিনি একটি ইংরেজি রচনায় (১৯৭৯-র নভেম্বর The Statesman Literary Supplement) বিস্তৃত আলোচনা করেন দেশকাল বিশ্বের প্রেক্ষিতে কবির অঙ্গীকার সহ কবি ও কবিতা নিয়ে। সেখানে গুনতের কুনার্ট-এর 'The creator craves the empathy of the reader so the poetry whether expressionist or surrealist, is 'meaningful' উদ্ধৃতির পাশাপাশি উল্লেখ করেন হেলমুট হাইসেল ব্যূত্তেলের 'This poetry must serve a topical and general end' এর পরেই তিনি উল্লেখ করেন কবি হানস মাগনুস এনৎসেনবার্গার (জন্ম ১৯২৯-এ বাভারীয় শহর কাউফবেউরেন-এ। বড়ো হয়ে ওঠেন নাতনি নুরেসবার্গে।

১৯৫৫-র ডক্টরেট হন ক্লেসেনস ব্রেন্তানোর পোয়েটিকস নিয়ে গবেষণা করে। ১৯৫৭ পর্যন্ত স্টুটগার্টে বেতার সম্পাদকের দায়িত্ব সামলান। এ বছরেই বেরোয় তাঁর প্রথম সংকলন 'ডিফেন্স অব দ্য উলভ্স', গোড়া থেকেই ছিলেন জার্মানির গ্রুপ ৪৭-এর সদস্য। তাঁর অন্যতম সেরা কাব্যগ্রন্থ হলো 'মুজেউম ডেয়া মোডারনেন' পোয়েজি' (আধুনিক কবিতার মিউজিয়াম)। তিনি মতাদর্শে বামপন্থী, স্বাধীনতার গণকণ্ঠ। ১৯৭১-এ বেরোয় 'কবিতা ১৯৫৫-১৯৭০-এর পরে প্রকাশিত হয় একাধিক প্রবন্ধগ্রন্থ। পাশাপাশি কবিতার সংকলন। যেমন 'নিমজ্জমান টাইটানিক', 'ভবিষ্যতের গান,' 'কিয়স্ক'। বাতাসের চেয়ে হালকা', 'মেঘেদের ইতিহাস প্রভৃতি)—এর স্পষ্ট ভাষণ, যা তিনি বলেছিলেন ভারতীয় কবিদের সামনে। অলোকরঞ্জনের লেখায় তো আজো উজ্জ্বল। "the process of modern poetry leads to the creation of a poetic language...it liberates poetry from the limited character of every national literature, but not in order to tear it out of its native soil or make it attempt to strike root in the air in the abstract."

বিরল বাউল

যেতে যেতে দিন আচমকা নিশ্চল।
পাখিরা নীরব। গাছগুলি হতমান।
সব রাস্তাই গোয়েন্দাকাহিনিতে।
প্রান্তিক রেল স্টেশনটি মরুভূমি।
প্রিয় ভালোবাসা সজ্জিত শবাধারে।

অনিশ্চিতির সঙ্গে শূন্য রফা
পলায়নপর বহুচারী নেকড়েরা
প্রজ্ঞাবিভাসে ঐহিক অস্মিতা।
শোকার্তজীব অস্তির সংকটে
স্মৃতিসন্ধানে আস্থায়ি অন্তরা।

মরমিয়া সংরাগেতেই সঞ্চারী
কোশে কোশে শ্রুতি, সৃজনতা জঙ্গম।
বোধিমন্থিত ইতিহাস সভ্যতা।
বিরল বাউল সময়ের দোতারায়।

অলোকরঞ্জনের সঙ্গে যেটুকু পরিচয়

সুমিতা চক্রবর্তী

তখন ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫। আসানসোল গার্লস কলেজ-এ বাংলা অনার্স পড়ি। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবি বলতে পাঠ্য ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। জীবনানন্দ দাশের নামটুকু মাত্র শুনেছিলাম। কিন্তু সেই সময়ে তিরিশের কবিদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল পরীক্ষার প্রয়োজনেই। আমাদের সময়ে সাম্মানিক বাংলায় পঞ্চাশ নম্বরের একটি প্রবন্ধ লেখা ছিল আবশ্যিক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি। সেইসব প্রবন্ধের সম্ভাব্য বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা"। প্রায় কিছুই পড়িনি, অতএব মনে হল এ বিষয়ে একটু জ্ঞান অর্জন করা যাক। জ্ঞান অর্জনের শর্টকাট হল মূল বই হাতে না থাকলে আলোচনার বই পড়ে সার সংগ্রহের পদ্ধতি। কলেজের গ্রন্থাগারে দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়" বইটি ছিল। সেই বই পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গ্রন্থকারের আলোচনায় ততটা নয়, কিন্তু কবিতার উদ্ধৃতিগুলির অভিনবত্বে। ওই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে দিয়েই প্রথম চেনা জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-কে। পরীক্ষায় এই প্রবন্ধটি আসেনি। কিন্তু যা এসেছিল তার থেকে বেছে নিয়েছিলাম একটি সুবিধেজনক টপিক"একটি বিনিদ্র রাত"। আমার সেই জেগে থাকা রাতের উপাদান ছিল আধুনিক কবিতা। সৌজন্য দীপ্তি ত্রিপাঠী। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এরকম বিষয় নিয়ে 'বিনিদ্র রাত্রি যাপন' প্রবন্ধ আর কোনো পরীক্ষার্থী লেখেননি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাবর্ষ ছিল ১৯৬৫-৬৭। তখনও পাঠ্যক্রমে আধুনিক কবিতা নেই; এমনকি জীবনানন্দও নেই। কিন্তু আমাদের গ্রন্থাগারে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহরায়ের বিবেচনায় কিছু আধুনিক কবিতার বই ছিল। তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশের কবিদের। কিন্তু সেখানেও অলোকরঞ্জনের কবিতার বই পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

গবেষণা করবার সময়ে ১৯৬৯-৭০-৭১-এ কলকাতায় থাকতে হয়েছে। বর্ধমানে জাতীয় গ্রন্থাগার বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নেই। এই দুটি গ্রন্থাগার ছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা সম্ভব তা আমাদের কালে কেউ ভাবতেও পারত না। এই কলকাতা বাসের সময়ে চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবিতার সঙ্গে পরিচয় হল। কবিদের সঙ্গে পরিচয়ের কোনো প্রশ্নই ছিল না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার শুরু ১৯৭৪-এ কলকাতায় বসবাসের শুরু ১৯৭৮-এ।

আধুনিক কবিতার প্রতি ভালোবাসা থেকে প্রথম বইটি লিখে ফেললাম কবি অমিয় চক্রবর্তীকে নিয়ে। তাঁকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বই প্রণয়নের গৌরব সম্ভবত আমারই প্রথম। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ তে। আমার অকল্পনীয় সৌভাগ্য যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'

র পৃষ্ঠায় সেই বইয়ের সমালোচনা করেছিলেন শঙ্খ ঘোষ। এবং বইটিকে তিনি তুচ্ছ করেননি। মোটের ওপর প্রশংসাই করেছিলেন। প্রথম লেখকের কাছে এই ঘটনার মূল্য যে কতটা তা সম্যক বোঝবার ক্ষমতা কিন্তু আমার তখন হয়নি। এখন তা অনুভব করি।

পরবর্তী দেড়দশকের মধ্যে আরও কয়েকটি বই প্রকাশিত হল। কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় শুরু হল যাওয়া আসা। তেমনই কোনো কোনো সভায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে দর্শক-শ্রোতার আসন থেকে দেখলাম। আরও কিছুদিন গেল। ক্রমে একটি দুটি সভায় একত্রে মঞ্চে বসবারও সৌভাগ্য অর্জন করলাম। তখনই জানলাম যে, জার্মানি থেকে কলকাতায় এলে যাদবপুর অঞ্চলে তাঁর ফ্ল্যাট-এ তিনি ওঠেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন 'বাড়িতে আসুন'; ফোন নম্বরও দিয়ে দিলেন। মনে হল মানুষটি অন্যরকম। প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তো দূরের কথা, আমার মতো লোকও এই কাজটি প্রথম আলাপে সহজে করবে না।

তাঁর বাসস্থান আমার বাড়ি থেকে রিকশ-য় দশ বারো মিনিটের পথ। এই সুযোগ কেউ ছাড়ে না। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার প্রকাশিত দুটি বই তাঁর হাতে দিয়ে আসবার জন্য ফোন করে চলে গেলাম তাঁর বাড়ি। খুব বড়ো ফ্ল্যাট নয়। মাঝারি মাপের একটি ঘর। আরও দু-তিনজন ছিলেন। কিন্তু কী উদার আমন্ত্রণ সেই ঘরটিতে। দেওয়ালের সবটুকুই যেন খোলা জানালা। তাঁর বাক্যালাপের স্টাইল যাঁদের পরিচিত তারাই জানেন—মনের সব অর্গল মুহূর্তে ভেঙে পড়ে। তাঁর মধ্যেই চা এবং সঙ্গে কিছু খাদ্যবস্তু নিয়ে শ্রীমতী ট্রুডবাটা-র প্রবেশ। সেই সহাস্য মুখ এবং সরস বাচন স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

তারপর থেকে যখনই আসেন তখনই খবর পেয়ে যাই এবং ফোন করি। সবসময়ই সাদর আহ্বান। এমন সৌভাগ্যও কখনও কখনও হয়েছে যে, কলকাতায় এসে নিজেই ফোন করে জানিয়েছেন, ডেকে নিয়েছেন দেখা করবার জন্য। এভাবেই সাহস জুগিয়ে দিলেন তিনি এবং আমি একদিন আমার প্রথম দাবিটা পেশ করলাম।

তখন ২০০৬। ছোটো একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। 'একুশে সংসদ' নামে সেই ছোটো সংস্থাটির পরিচালক ছিলেন দেবাশিস সেনগুপ্ত। কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতাম আমরা। কলকাতার বেশ কয়েকজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দেবাশিসের ডাকে চলে আসতেন সভায়। সেই সংস্থা থেকে অন্তত চারটি বই প্রকাশিত হয়েছিল যেগুলি খুব তুচ্ছ করবার মতো নয়। একটি বইয়ের নাম 'জীবনানন্দ'। পরিকল্পনাটা ছিল একটু নতুন রকম। বেছে নেওয়া হবে জীবনানন্দের দশটি কবিতা। যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে যাতে সেই দশটি কবিতার মধ্যেই মোটের ওপর কবি জীবনানন্দকে চেনা যায়। সঙ্গে থাকবে ছোটো একটি ভূমিকা এবং কবির জীবনপঞ্জি। সেই দশটি কবিতার প্রত্যেকটি অনূদিত হবে চারটি প্রধান ইউরোপীয় ভাষায় ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনীয় এবং জার্মান। সম্পাদনার ভার পড়ল আমার

ওপর। ইংরেজি অনুবাদগুলি করেছিলেন 'একুশে সংসদ'-এর সঙ্গে যুক্ত শুভ্রাংশু মৈত্র। অনুবাদক হিসেবে যিনি এখন বেশ পরিচিত। সাহসে ভর করে ফরাসি অনুবাদ করে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম অধ্যাপক সুদেষ্ণা চক্রবর্তীকে। স্পেনীয় অনুবাদের জন্য আমার অনুরোধ এক কথায় গ্রহণ করলেন তরুণ ঘটক। জার্মান অনুবাদ করে দিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং ট্রুডবার্টা দাশগুপ্ত। কেবল কবিতাগুলির অনুবাদ নয়, ভূমিকা অংশটিও অনুবাদ করে দিলেন তারা। এখন ভাবি কী অসামান্য উদারতায় একটি ছোটো সংস্থার এই কাজটি করে দিয়েছিলেন তারা। অতি সামান্য সাম্মানিক যে গ্রহণ করেছিলেন তা-ও তাঁদের মহত্ত্ব। বাংলা সহ চারটি ভাষার অনুবাদগুলি ছিল একটিই বই-এর দুই মলাটের মধ্যে। বইটি তখন বিদেশে বিক্রি হয়েছিল বেশ।

সেই সময় কবিতা এবং ছবির সংযোগ আমাকে টানছে। একটি দুটি করে প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ছবি আর চলচ্চিত্রের প্রচ্ছায় সম্পর্কিত ভাবনাসহ। তখনই পড়লাম অলোকরঞ্জনের 'সমবায়ী শিল্পের গরজে' (২০০০) নামের মাত্র চৌষট্টি পৃষ্ঠার পরম আশ্চর্য একটি বই। সেই বইয়ের প্রথ পাঁচটি প্রবন্ধ চোখের সামনে এবং মনের সামনে খুলে দেয় সমবায়ী শিল্পের অনন্ত আকাশ; শুনতে পাই বিশ্বজোড়া শিল্পজগতের অনিঃশেষ সমুদ্র গর্জন। যাদের নাম তিনি করেছেন তাঁদের অনেককেই প্রথম চেনা এই বইটি থেকে।

এই লেখাগুলির সূত্রে অলোকরঞ্জনের 'জীবনানন্দ' নামের ছোট বইটি পড়তে গিয়ে এক চিত্রশিল্পীর নাম পেলাম। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের শিল্প- সম্পর্কিত এনসাইক্লো পিডিয়ায় 'তাসের' নামের কোনো শিল্পীর সন্ধান পেলাম না। তারপর একদিন পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি লেখায় দেখি সেই একই কথা। অলোকরঞ্জনের আলোচনার সূত্রেই তিনি জানিয়েছেন যে, তিনিও 'তাসের' নামের কোনো শিল্পীর সন্ধান পাননি। তারপরে কী হল তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি আমার 'ছবি ও লেখা মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব' বইটি থেকে। 'বিনীত ভাবে নিবেদন করি, অলোকরঞ্জনের বইটি পড়বার পর আমিও যথাসাধ্য সন্ধান করবার চেষ্টা করেছিলাম তাসের-এর পরিচয়। আমিও খুঁজে পাইনি কোথাও তাঁর নাম। কিন্তু পুর্ণেন্দু পত্রীর মতো সুপ্রতিষ্ঠিত এক চিত্রশিল্পীও যখন একথা বললেন তখন সাহস করে, নম্র বচনে একদিন স্বয়ং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকেই পেশ করলাম কথাটা—পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখাটি সামনে রেখে। তখন অলোকরঞ্জন এই কলকাতায়। তখনই কিছু বলতে পারলেন না তিনি। কিন্তু জার্মানিতে ফিরে গিয়ে দ্রুতই পাঠিয়ে দিলেন একটা চিরকুট। বছর সেটি রক্ষিত ছিল আমার কাছেই। প্রসঙ্গত সেই চিরকুটটি যথাযথ উদ্ধৃত করছি।

'Tassaert– Jean - Pierre Antoine

জাঁ-পীয়ের আঁতোয়ান
১৭২৭-১৭৮৮ (জ. আন্টওয়েরপেন — বার্লিন)
প্রধানত ভাস্কর — বার্লিনে ছিল তাঁর স্টুডিও—
বাস্তববাদী তাঁর ভেনাস ও আমোর — সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ ধ্বংস হয়ে গেছে।
শিল্পগুরু হিসাবে তার খ্যাতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।
dtv-Lexikon (Vol.18), ১৯৭৩, মিউনিখ Deutscher Taschenbuch Verlag জার্মান পকেটবুক প্রকাশন।'

এই বইটি প্রকাশিত হবার আগে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোথাও কোথাও ছবির সঙ্গে কবিতার আদানপ্রদান নিয়ে কিছু বলেছি। এশিয়াটিক সোসাইটির আমন্ত্রণে একসময় সেখানেও বলেছিলাম। আমার অনুরোধে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এই বইটি তাঁকে উৎসর্গ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন যে ভাষায় তা বলতে একটু সংকোচ বোধ করছি। কিন্তু তিনি বলেছিলেন 'আমি গৌরবান্বিত বোধ করব'। এই বইটি তাকে উৎসর্গ করতে পেরেছি—আমার অতি সাধারণ লেখক—জীবনের এ এক মহৎ ঘটনা।

তাছাড়াও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত আমার একটি বই ২০০৮-এর বইমেলায় উদ্বোধন করবার অনুরোধও তিনি রেখেছিলেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদের প্রসঙ্গ তুলতে চাইছি না। কারণ সে এক সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তের বিস্তার। তাঁর এবং শঙ্খ ঘোষের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত এই অনুবাদ কবিতার সংকলনটি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের একটি মাইলফলক। তাছাড়া জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের সেতুবন্ধন অলোকরঞ্জন যেভাবে করেছেন তা এক বিস্তৃত প্রবন্ধের বিষয়। সেই ধারার একটি মাত্র বইয়ের কথা বলে শেষ করব আমার অলোকরঞ্জন স্মৃতিচারণ। তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল সুকুমার রায়ের কবিতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ছবিগুলির প্রসঙ্গে। তখন তিনি বললেন জার্মানির ছড়া-লেখক ভিলহেলম বুশ (১৮৩২-১৯০৮)-এর কথা। জার্মানির এই অতি পরিচিত চিত্রি-সাহিত্যিকের নাম তার আগে শুনিনি। তিনি ছড়ার সঙ্গে কয়েকটি চরিত্রকে মিলিয়ে ছোটদের ও বড়দের সামনে তুলে ধরেছেন। অলোকরঞ্জন অনুবাদ করেছেন সে বই। বুশ এর আঁকা ছবিসহ মুদ্রিত বইটির নাম 'মাক্স ও মোরিৎস এবং আরো চিত্রকথা' (প্রকাশ ২০০০)। বুশ-এর ছড়ার চরিত্রগুলি হল অতি দস্যি কয়েকটি বালক। তাদের ঘিরে তাদের পরিবার, প্রতিবেশী এবং পোষ্যদের নিয়ে সারাক্ষণ যে ধুন্ধুমার কান্ড ঘটতে থাকে তাই নিয়ে ছড়া এবং ছড়ার সঙ্গে আশ্চর্য সব রেখাচিত্র। ছড়াগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, টানা গল্পের মতো। সেজন্য টুকরো করে উদ্ধৃত করলে ঠিক রস গ্রহণ করা যাবে না। তাই বালকগুলির গল্প বাদ দিয়ে অন্য একটি স্বতন্ত্র ছবি-ছড়ার দৃষ্টান্ত তুলে দিচ্ছি। পমপম সাহেব তার

লেফটেন্যান্টকে ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। অতঃপর যা ঘটল তারই দু-একটি ছবি ছড়া। ছবি ভিলহেলম বুশ-এর ছড়ার অনুবাদ অলোকরঞ্জনের।

পমপম স্যার এনজয় করছিলেন ঠাণ্ডা স্নান,
এমন সময় অশ্বপৃষ্ঠে হাজির লেফ্‌টেনান্ট।

শক্ত হাতে লাগামখানা বাগিয়ে আচম্বিতে
ঘোড়ার পিঠে দুলছেন স্যার অনন্য ভঙ্গিতে।

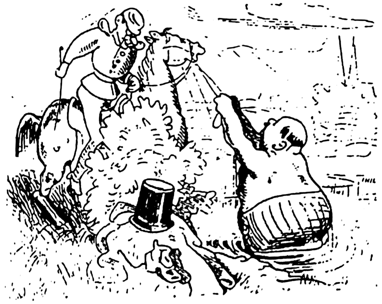

লেফ্‌টেনান্ট স্যারের ঘোড়া পা ছুঁড়তেই প্রম্পট
হেল্‌প করতে এগিয়ে গেলেন মিস্টার পমপম;

লেফ্‌টেনান্ট তো কম্পমান, হৃদয়ে তাঁর খেদ,
এক ছুটে সটকালো ঘোড়া পমপম সমেত;

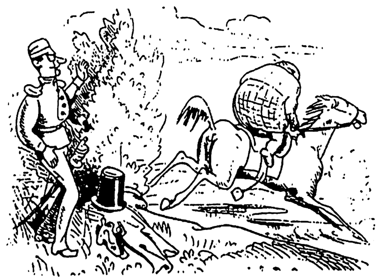

তার পরে ঘটেছিল আরও অনেক কিছু। এই চমৎকার বইটি হাতে নিলে পাঠকের ভালো লাগবে। সুকুমার রায়ের সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনাও করা যেতে পারে।

অলোকরঞ্জন আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন। নতুন কিছু আর দেবার পথ রুদ্ধ হল মহাকালের নিয়মে। কিন্তু যা দিয়ে গেলেন তার সবটুকুর প্রাপ্তি স্বীকারও বোধ হয় আমরা পুরোপুরি করে উঠতে পারিনি এখনো।

উৎস : নতুন কবি সম্মেলন, ডিসেম্বর ২০২০

প্রবাসে, দৈবের বশে...

উদয়ন ভট্টাচার্য্য

আর দেশে ফিরে এলেন না অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। আমৃত্যু তিনি ছিলেন বিশ্বনাগরিক। ২০১১ সালে পিঠে অস্ত্রোপ্রচারের জন্য আসতে পারেননি। এখন অতিমারি। ফলে গত ৩০ বছর যাঁর সঙ্গে প্রতিবছর দেখা হয়েছে, এবার আর হল না। এসেই আমাকে ফোন করতেন। সারা কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহল অপেক্ষা করত কবে কলকাতায় তিনি আসবেন।

প্রথম আমাকে আলোকদার কাছে নিয়ে গিয়ে ছিল সুরজিৎ ঘোষ। তারপর থেকে একা একাই যেতাম। ফোন করে গেলেও দেখতাম তাঁর ঘর ভর্তি, কলকাতার বিশিষ্ট সব মানুষেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এবং বিরতিহীন ফোন। কাউকে বলছেন" 'এক মুহূর্ত ধরো'। তারপর অন্যের সঙ্গে কথা বলেই চলেছেন। তাঁর সমসাময়িক কবি থেকে তরুণতম কবিও তাঁর কাছে সমান আপন। যে-কোনো অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য তিনি আমাকে যেতে বলতেন। সেটা নানা কারণে সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেবার শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা শুনতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। চুপচাপ বসে তাঁর বক্তৃতা শুনছি, হঠাৎ তিনি বক্তৃতা থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উদয়ন শেষ পর্যন্ত এসেছে', সমস্ত দর্শক আমার দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখছে, আমি তো স্তব্ধবাক। সামনের সারিতে বিশিষ্ট মানুষেরা বসে আছেন, তার মধ্যে। খোলা হৃদয়ের মানুষ, সবাইকে আপন করে নিতেন।

অন্তত চারটি ভাষায় পারদর্শী, দক্ষ। কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বললে কখনও অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করতেন না। জার্মান ভাষাতেও তাই, ইংরেজি বললেও অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলতেন।

'আমার প'রে এই ধরণী/সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জন'।

আজ থেকে ৬৯বছর আগে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'যৌবনবাউল'-এ এই ব্যক্তিগত এবং নিভৃত উচ্চারণ করেছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। জার্মানির হাইডেলবার্গে ১৭ নভেম্বর রাতে তিনি অন্যকোনো লোকে যাত্রা করলেন। বাংলা ভাষা বাংলা কবিতার ওপর পড়ল বিষণ্ণতার ছায়া। ১৯৩৩ সালের ৬ অক্টোবর তাঁর জন্ম।

তাঁর বাবা বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত যুক্তছিলেন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে। মা নীহারিকা দাশগুপ্ত শিক্ষকতা করতেন, ভালো গান গাইতেন, এস্রাজ বাজাতেন।

শান্তিনিকেতনে যখন একটু উঁচু ক্লাসে তখন অমর্ত্য সেন, মধুসূদন কুন্ডুর সাথে বের করলেন 'স্ফুলিঙ্গ'। যার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু। তাঁর ছোটোবেলা কেটেছে নানাজায়গায়, কখনও রিখিয়া, কখনো ওড়িশায়।

ওড়িশার কখনও মদনপুর - রামপুর আর শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনে টেস্ট পরীক্ষার পর কলকাতায় তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা। সেখান থেকে সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের ইনটারমিডিয়েট। সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে বাংলা অনার্স না থাকায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। তখন প্রকাশ পেতে শুরু করে আলোক সরকারের 'শতভিষা' (১৯৫১) ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩) পত্রিকা। এই বিখ্যাত দুটি পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা থেকেই তাঁর কবিতা লেখার শুরু। তারপর বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা। ১৯৫৫ সালে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক হিসেবে গবেষণা শুরু করেন। বিষয় 'ভারতীয় লিরিক রূপকল্পের উৎসও ক্রমবিবর্তন'। ১৯৫৭ সালে যোগ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে। বিভাগীয় প্রধান বুদ্ধদেব বসু। সহ-অধ্যাপক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নরেশ গুহ সহ অন্যান্যরা। ১৯৫৯ সালে সুরভি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যৌবনবাউল'। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বহুপত্র-পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছাপা হয়। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম ইংরেজি **The Lyric in Indian poetry**। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত', সম্পাদনা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষ। তার এক বছর আগে (১৯৬৩) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পাদনা করেন 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস'। ১৯৭১ সলে তিনি পশ্চিম জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৩ সালে গ্যোয়েটে ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও **'Goethe and Tagore'** প্রকাশিত হয়।

১৯৭৫ সালে রাজভবনে ইন্দিরা গান্ধীর আমন্ত্রণে চা-পান পর্বের শেষে তাঁর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর তর্কবিতর্ক হয়। তিনি সেন্সরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন।

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহকর্মী ছিলেন লোথারলুৎসে। এই সময় স্টুটগার্টে কারারুদ্ধ বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করতে যান জাঁ পল সার্ত। সেই সময় সার্তও অলোকরঞ্জনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় বলেন, 'কবিতায় অন্যভাবে কাজ করা যায়। কিন্তু গদ্য লিখতে গেলে সামাজিক দায়িত্ব নিতে হয়'।

বিশ্বনাগরিকতা, জার্মান ও বাংলা এই দুটি ভাষার ভেতর পারস্পরিক মেলবন্ধনের জন্য মিউনিখের গ্যোয়েটে ইনস্টিটিউট তাঁকে 'গ্যোয়েটে' পুরস্কার দেন।

১৯৭৯ সালে কলকাতায় সেন্টপলস ক্যাথিড্রালের ময়দানে শামিয়ানা নাট্যমঞ্চে (৬ এপ্রিল- ৫মে) অলোকরঞ্জনের অনূদিত 'সোফোক্লেসের' আন্তিগোনে অভিনয়। পরিচালনা করেন হানসগুন্টার-মে। এইনাটক দেখার অভিজ্ঞতা সারা জীবনের সম্পদ।

'মরমীকরাত'-এর জন্যে পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। 'ধুলো মাখা ঈথারের জামা' কাব্যগ্রন্থের জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্রপুরস্কার। ২০০৫ সালে মুম্বাইতে পেয়েছেন প্রবাসী ভারতীয় সম্মান। সেই বছরই মারা যান ট্রুডবার্টা দাশগুপ্ত। 'জীবনানন্দ' গ্রন্থের জন্য পান 'শিরোমণি' পুরস্কার।

খুব কম পাঠকই জানেন যে তিনি ২০০২ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাসটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। DER WIDERL A UEFR। কলকাতায় ম্যাক্সমুলার ভবনে গুন্টার গ্রাসের উপস্থিতিতে তাঁর কবিতার বাংলা অনুবাদপাঠ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, 'যৌবনবাউল', 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', 'রক্তাক্ত ঝরোখা', 'ছৌ- কাবুকির মুখোশ', 'জবাবদিহির টিলা', 'ঝরছে কথা আতসকাঁচে', 'মরমীকরাত, 'নিজেকে এই মাতৃভাষায়', 'এখনও নামেনি বন্ধ্র', 'নিউক্লিয়ার শীতের গোধুলি', 'সমস্ত হৃদয় শুধু ভুকম্পপ্রাণ হয়ে আছে, 'সেকি খুঁজে পেল ঈশ্বর কণা', 'নিরীশ্বর পাখিদের উপাসনালয়ে'। নিজের মৃত্যু নিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি চাই আমার মৃত্যু কোনও হিমালয়ের আরোহণের মধ্যে দিয়ে নয় বা কোনও ইয়েতি হয়ে যাওয়ার মধ্যেও নয়, একটি শহীদের কান্নার মধ্যে হোক... মৃত্যুর জন্য আমি তৈরি, তবু মনে হয়, এই মায়াবী গ্রহের টান আমি উপেক্ষা করব কি করে? এই শীতের সকালে বসে মনে হচ্ছে তাই এখনও হয়ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না আমি।

তিনি বলেছিলেন, "একটি পাখির দুটি ডানা, একটি শুশ্রুষার, আর একটি শিল্পের। এই দুটো ডানা না থাকলে ভবিষ্যতের কবিতা টিকে থাকতে পারবে না।"

'ধুলোমাথা ঈথারের জামা' গায়ে দিয়ে, বয়সের ছাপ বল্কলে মুছে ফেলে অলোকরঞ্জন চলে গেলেন নিরীশ্বর পাখিদের উপাসনালয়ে। সারা বিশ্বের প্রচারের মধ্যে থেকেও তিনি এখানে প্রতিষ্ঠানের আনুকুল্য পান নি। বৃহত্তর পাঠকের কাছেও তিনি হয়তো অবহেলিতই থেকে গেছেন। তার ঈর্ষণীয় গদ্য, ঈর্ষণীয় কবিতার ভাষা সাধারণ মানুষের কাছে ঠিক মতো পৌঁছয়নি। যে বিশাল কর্মযজ্ঞে বিশাল আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের জগতে তিনি জড়িত ছিলেন, সেকথা এখনকার পাঠক খুব কমই জানেন। এত বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যেও তিনি আমাকে প্রায়ই ফোন করতেন। কোনো কবিতা হারিয়ে গেছে বা খুঁজে না পেলে তিনি আমার কাছে জানতে চাইতেন। তাঁর বেশির ভাগ কবিতার বই আমার কাছে আছে। তিনি

বলতেন, এগুলো সব আলাদা একটা আলমারিতে সংগ্রহ করে রাখবে। তার লেখা যে-কোনো পুরোনো কবিতার বই তাঁর কাছে নিয়ে গেলে তিনি শিশুর মতো আনন্দে মেতে উঠতেন। জিজ্ঞেস করতেন, কোথায় পেলে? আমার সববই হারিয়ে গেছে। প্রত্যেকবার তিনি সৃষ্টির একুশ শতকের উৎসব সংখ্যার জন্য কবিতা পাঠিয়েছেন। শুধু কেমন আছি জানতেও মাঝে মাঝে ফোন করতেন। আমার একটি কাব্যগ্রন্থ 'তোমরা আলোয় থাকো'? তাঁকে দিতে গিয়েছিলাম, তিনি বইটি প্রণাম করে বললেন, আমি এটা সঙ্গে করে জার্মানিতে নিয়ে যাব। আমার সৌভাগ্য, বইটি সম্পর্কে তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করে জার্মানি থেকে ফোন করেছিলেন। যে কোনো বিষয়ে তাঁর তাৎক্ষণিক ভাষণ মুগ্ধ করে দেয়।

তাঁর ৮০ বছরের জন্মদিনে অহর্নিশ প্রকাশ করেছিল 'অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৮০'। যাদবপুরে ইন্দুমতী সভাগৃহে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে দেখেছি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাকে নিয়ে কত উৎসাহ। সেই সভার মধ্যে ছিলেন শঙ্খ ঘোষ, নবনীতা দেবসেন, পবিত্র সরকার প্রমুখ। তাঁর কথায় বিশেষণ ব্যবহারে আলাদা অলোকরঞ্জনীয় ভঙ্গি ছিল। তাঁর ছেলেবেলার স্কুল সম্পর্কে বলতেন তীর্থপ্রতিম ইসকুলের সাম্প্রত দুর্দশা। লেখার বড়ো হরফকে বলতেন পৃথুল হরফ। ঋতদর্শী কবি, মনস্তাত্ত্বিক যানজট, অপ্রতিভ উৎকণ্ঠা, করুণাঘন প্রসন্নতা, চিদ্ঘবিরতি, নান্দনিক পারমিতা, অনপনেয় — এই সব শব্দ তিনি গদ্য ভাষায় উল্লেখ করছেন।

'তুমি যদি তোরণের কাছে নিচু হও
প্রমাণ হয় না তুমি মেরুদণ্ডহীন
তুমি যদি সুযোগ্য মানুষের কাছে
নিজের কোনো কবিতা তর্জমা না করো
প্রমাণ হয় না তুমি তুচ্ছ তৃণ।'

মৃত্যুত্তীর্ণ প্রহরের স্তব্ধতায় অলোকরঞ্জন

কালীকৃষ্ণ গুহ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৮৭ বছর বয়সে চলে গেলেন, এ নিয়ে প্রকাশ্যে খুব দুঃখ করার হয়তো কিছু নেই। কিন্তু তাঁর প্রতি যারা অপার মুগ্ধতা নিয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছেন তাদের কিছুকাল একটা দুঃখ বহন করে যেতে হবে নিঃশব্দে। তার প্রতি আমাদের মুগ্ধতা শুরু হয়েছিল যে কবিতাটি পড়ে যে কবিতাটি অংশত বিশেষ করে শেষ স্তবকটি আবৃত্তি করে নিজেকে শোনাতে শোনাতে রাস্তা পার হয়েছি প্রথম যৌবনে, সম্প্রতি সেই হারিয়ে যাওয়া কবিতাটি (যা ওঁর কোনো বইতে খুঁজে পাইনি) আমাদের প্রিয় ভাষাবিজ্ঞানী শ্রীপবিত্র সরকার স্মরণ থেকে উদ্ধার করে আমাকে পাঠিয়েছেন আমার একান্ত অনুরোধে। কবিতাটির নাম 'পাগল'। এই :

আমি কোনোদিন পাগল বলি না ওকে
বেসুরো গলায় রামপ্রসাদের কলি
গেয়ে ঘুরে গেল জনক রোডের গলি
সময়ের ছায়া পড়ে না তো ওর চোখে।

ও কিছু বলতে চেয়েছিল একদিন
রৌদ্রের মতো পরিচ্ছন্ন করে;
বলতে পারেনি আকাশে আত্মলীন
সময় পড়েছে বৃষ্টির মতো ঝরে।

এখানে আমিও বলতে এসেছি কিছু।
সম্ভাবনায় আজো আমি অরুণাভ
বলতে যে আমি পারব না তাও জানি
আমি একদিন উন্মাদ হয়ে যাব।

কবিতাটি পড়ে আজও শিহরন হয়। এ যেন একজন কবির আবির্ভাবের 'বিভাব কবিতা'। তাঁর কবিজীবনেরই ভূমিকা। এই প্রসঙ্গে নিশ্চয় 'যৌবন বাউল'-এর বিভাব কবিতাটির কথা সমস্ত কবিতা পাঠকের মনে আসবে, যেখানে তিনি বলেছিলেন, 'ভগবানের ওগুচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর / ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়ব না।' সত্য এই, মৃত্যু এসে ঘর বেঁধেছে ছন্দে, 'ভগবানের গুপ্তচর' হিসেবেই বোধ হয়, আমরা দেখেছি। ছন্দজ্ঞান ছাড়াই অনেকে কবিতা লিখে আকাশে মাথা তুলেছেন। কিন্তু অলোকরঞ্জন কবিতা ছাড়েননি এবং ছন্দ ছাড়েননি। বস্তুত ছন্দ নিয়ে আজীবন যে-খেলা তিনি খেলে গেছেন, শুধু সেইটুকু যদি কোনো পাঠক অনুসরণ করেন, তিনি চোখ ফেরাতে পারবেন না। আমরা অন্তত পারিনি,

যদিও ছন্দের বাইরেও চলার চেষ্টা করেছি—বাইরেই অনেক বেশি চলেছি বলা যায়— তবু ছন্দমুগ্ধতা হারাইনি। লেখা আর খেলাকে যাঁরা একাকার করতে পেরেছেন অনায়াসে—যাঁরা সেইসঙ্গে বিভিন্ন শব্দের অকল্পনীয় সাযুজ্য তৈরি করেছেন, মিলের বিদ্যুৎচ্চমক ঘটিয়েছেন—যাঁরা সংস্কৃতিতে ধূলোবালি মাখিয়েছেন, একজন প্রজ্ঞাবানের জগতের সঙ্গে এক হাজার জগৎকে মিশিয়ে দিয়েছেন কখনো- কখনো—তাঁদের অন্তিমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অলোকরঞ্জন। আর কী সম্পর্কে তিনি এই পৃথিবীর সঙ্গে বা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে জুড়েছেন, এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় তাঁর এই বিভাব কবিতার শেষ পক্তিতে আমার পরে এই ধরণী / সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা।" এই তাঁর প্রেমিক-পরিচয়। এই কথা তাঁর সেই যৌবনের উচ্চারণ যখন তিনি ভাবছিলেন তিনি তাঁর কথা বলে উঠতে পারবেন না এবং, ফলে, উন্মাদ হয়ে যাবেন একদিন। বস্তুত জ্ঞান ও শব্দ-ছন্দ-অলংকারের জগতে তিনি প্রায় এক উন্মাদের জীবনই কাটিয়ে গেছেন, যে উন্মাদনা তাঁকে আমৃত্যু কর্মক্ষম ও প্রজ্ঞাবান রেখেছে। তাঁর প্রথম যৌবনে লেখা 'শীতের আকন্দ' কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে—তাঁর কবিজীবনের ভূমিকার সম্প্রসারিত অনুকথন হিসেবে আরেকবার পড়ে নেওয়া যেতে পারে—

শীতের আকন্দ
ফুটি-ফুটি:
ফুটে উঠল ছুটি
শীতের আকন্দ।
এবার, এইবার,
দুঃখ দাও, রাত্রি দাও
ঠান্ডা।
নিজের নামের বানানটা
ভোলাও, ভোলাও
দাও ভেঙে বারান্দা,
তবু আমার আনন্দ, আমার
আনন্দ।

বিষাদ ও বিষন্নতার কবিতা অলোকরঞ্জন বেশি লেখেননি। তিনি আনন্দ হারাননি জীবনে। কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের বিষাদযোগ ঢেকে রেখেছেন শ্লেষে, ব্যঙ্গবিদ্রূপে অংশগ্রহণ করে, নানারকম বিরোধাভাসে। বস্তুত বিরোধাভাস নিয়েই তাঁর বিশ্বপরিক্রমা। সেই সূত্রে তাঁর কবিতায় এসেছে অনেক আকস্মিক নাট্যমুহূর্ত, অনেক, গল্পের টুকরো, কথকতার নিসর্গ। এই প্রসঙ্গে কিছু বিস্তারে গিয়ে তিনি মুখোমুখি হয়েছেন 'কী বলতে হবে, কী করে বলতে হবে' এই প্রশ্নের। আশ্চর্য এই কবিতাটি আজকের পাঠক পড়ুন একবার—অন্তত প্রথম স্তবকটি :

কী বলতে হবে, কী করে বলতে হবে?
রৌদ্র যখন মুদ্রিত নীল নভে,
পঞ্চপাপড়ি সূর্য ওখানে যদি
ঘন আশ্লেষে উদ্যত, দ্রৌপদী
মেঘ যদি কাঁপে লজ্জিত গৌরবে,
কী বলতে হবে, কী করে বলতে হবে?

'ঘন আশ্লেষে উদ্যত, দ্রৌপদী'-র মতো পংক্তি রচনার কথা আজও কি ভেবে ওঠা যায়? এতটা কবিত্ব সম্ভব?

দুটি প্রশ্নকী বলতে হবে, কী করে বলতে হবেসমস্ত শিল্পস্রষ্টার প্রাথমিক বা আস্তিত্বিক প্রশ্ন। এই দুটো প্রশ্নের উত্তর বুঝে ওঠায় একজন স্রষ্টার সার্থকতা নির্ভর করে। বিশুদ্ধ কবিতার ধারণা যাঁরা করতে পেরেছিলেন তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল এই প্রশ্নের দায়। যা-কিছু কবিতা নয় তাকে কবিতা থেকে বাদ দিতে হবে এই ছিল বিশুদ্ধতায় পৌঁছনোর একটি শর্ত। কিন্তু কী বাদ যাবে, কী কী বাদ যাবে, তা বোঝা সহজ নয়। অলোকরঞ্জন কোনো কিছুই বাদ দেবার কথা ভাবেননি—সবকিছু নিয়েই তিনি কবিতা গড়ে তুলেছেন। তিনি প্রশ্ন করেন 'তুমি কি আমার কথা বুঝেছিলে, বেনেবউ পাখি? / যদি বুঝতে পারতে / নারী হতে।' যেন একটা তুচ্ছ কথা শুরু করে একটা দর্শনচিন্তায় পৌঁছে যাওয়া আছে কবিতাটিতে। বস্তুত ওঁর সব কবিতার একটা আস্তিত্বিক আলোড়ন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই আস্তিত্বিক আলোড়নই কবিতায় বিশুদ্ধতা আনে। তাঁর 'পথের যন্ত্র' কবিতাটির কথা সবাই জানে যাঁরা অলোকরঞ্জন পড়েছেন চমকপ্রদ শব্দ বিন্যাস, চমকপ্রদ যার দৃষ্টি—যে দৃষ্টিকে দর্শন বলা যায় হয়তো।

আমরা
পান্থশালার বারান্দায়
অরুণ বরুণ কিরণ নিয়ে যখন
দিনান্ত;

চন্দ্র
কিরণমালা নিয়ে যখন
নিভন্ত;

আমরা
পান্থশালার বারান্দায়
বসব না।
আমরা

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

দ্বিতীয় চুম্বনের আশায়
থাকব না

খুলল
মেঘদুয়ার, ঐ আমাদের
সিংহাসন:

নামল
বোশেখি ঝড়, বৃষ্টি ভেজায়
সিংহাসন।

আমরা
দ্বিতীয় চুম্বনের আশায়
থাকব না

যাত্রাই যেন ধর্ম। দূরের পথে যাত্রা। সূর্য-চন্দ্র-ঝড় বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে যাত্রা, শুধু এই বিন্যাসের সৌন্দর্য বোঝানোর জন্য এই শীর্ণ কবিতাটি এখানে স্থাপন করলাম যা আমাদের রাস্তা দেখিয়েছিল এককালে। এই কবিতার অর্থ করতে গেলে হিমশিম খেতে হবে, কিন্তু ওর রয়েছে মন্ত্রের শক্তি যা বিশুদ্ধ কবিতার শক্তি বলে বোঝা যায়। এই কবিতার গঠনবিন্যাসে মনে পড়ে আরো একটি অনতিক্রম্য কবিতা 'রুনার জন্য শীতের কবিতা', যে কবিতায় তরুণ অলোকরঞ্জন লিখেছেন, "শেষ প্রহরে / ঘরে উপকরণ / মন।' জীবনের শেষে বাঁচার একমাত্র যে উপকরণ হাতে থাকে তা মন। এই সত্য আমরা আজ বুঝতে পারছি, যা তরুণ বয়সেই অলোকরঞ্জন বুঝেছিলেন।

কবিতার বিন্যাসে ছন্দের বিচিত্র অনায়াস প্রয়োগের অজস্রতার পাশাপাশি টানা গদ্যেও কবিতা লিখেছেন তিনি—যেন একটা বিশ্রামের জন্য অথবা একটা অনুভূতির তীব্রতাকে যথাযথ রূপ দেবার জন্য। একটি কবিতার মাঝখানের একটি অংশ পড়া যাক উদাহরণ হিসেবে :

'মানুষকে মাঝখানে রেখে নয়। আকাশের পাশে কিংবা সান্দ্র গাছগাছালির ছায়াকোণে স্পর্শাতীত যেসব বটের ঝুরি মগ্ন চৈতন্যের শিখর জ্বেলে আছে মানুষকে স্বযাচিত হয়ে পদের গরজ বুঝে নিতে হবে। মানুষের মাঝখানে এইভাবে ঝুরিগুলি উঠে এলে অনেক আলোকতোয়া নদী বয়ে যাবে, বোধিসত্ত্ব সেই স্রোতে আমাদের শাশ্বত ঠিকানা- তবু দূর থেকে এসে নদীটির তদারকি করে শেষে নশ্বরতার কাছে ফিরে আসা দারুণ জরুরি।' (আয়ুকর / আয়না যখন নিশ্বাস নেয় / ১৯৯১)

আমরাও কি লক্ষ করিনি কখনো 'বটের ঝুরি মগ্ন চৈতন্যের শিখা জ্বেলে আছে'? কত দীর্ঘদিনের সব বটগাছ আমাদের চারপাশে আজও দাঁড়িয়ে আছে সংসারবৃক্ষের মতো।

অক্ষয়বটের দেশে আমাদের এই বসবাস যেন আলোকরঞ্জন দেখিয়ে দেন। কবিতাতেই তিনি চিনিয়ে দেন প্রাচীন ভারতবর্ষকে—যে কবিতার শুরু, টানা গদ্যে এইভাবে 'আমি একবার প্রাচীন ভারতবর্ষে যাব ভেবে রাজস্থানের দিকে চলে গিয়েছিলাম। গাইডের সাহায্য ছাড়াই এক মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢুকে দেখি অদরকারি দেবতাদের ভিড়ে যেন মর্মান্তিক সত্য ওরা গোপন করছে। না, ওই দেবতাদের ভিড়ে ভারতবর্ষ নেই, এই তাঁর অনিবার্য সিদ্ধান্ত। দেবতাদের মূর্তির আড়ালে রাখা ছিল দেবদাসীদের ঘুঙুরের স্তূপ। ফলে, তার সিদ্ধান্ত, এই রঙ্গালয়ে দেবতা বা ভারতবর্ষের পরিচয় নেই। হ্যাঁ, মন্দিরই রঙ্গালয় হয়ে আছে যে। এর পাশাপাশি 'ভারতবর্ষের দিকে' নামের কবিতাগুলির ভিতর থেকে (ধুনুরি দিয়েছে টংকার / ১৯৮৮) একটি অনবদ্য কবিতা পড়ে নিতে পারি :

তিতির শিকার করে অস্তাহ্নে নিষাদরুদ্র যায়।

তিন যুগ পরে দেখা, প্রথমে তো চিনতেই পারিনি,
তাছাড়া আরেক ডৌল, ডান হাতে ইস্পাতের বালা
যাকে সে করেছে খুন তার কাছে রয়েছে অ-ঋণী---
মৃত তিতিরের মুখে মেলে ধরে নৈবেদ্য নিরালা;
তাকে তিরস্কার করে সূর্যাস্তের রাগতরঙ্গিনী

সহসা নিষাদ্রুদ্র নুয়ে পড়ে নমঃশূদ্রতায়। (শিবালিক গিরিমালা)

জাতপাতে বিভক্ত, জীবিকায় বিভক্ত, উপাসনায় বিভক্ত ভারতবর্ষকে চিনে নিতে হয়। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত 'ধুলোমাখা ঈথারের জামা'-র বিভাব কবিতাটি পড়ে আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাব।

আমাকে একজন পূর্বসুরি
তার ঈথারের জামা দিয়ে
মিলিয়ে গেলেন মেঘে, আমি
সেটাই সচরাচর পরি

তবে কিনা তাতে মেখে নিই
ব্রহ্মাণ্ডের ধূলি, তারপরে
দুরুদুরু দৃপ্ত ঘুরে আসি
এপাড়া ওপাড়া আলোড়িত

আমার এ ঈথারের জামা

গায়ে ধুলো মিশিয়ে না নিলে যেন নিজেকে সত্য করে পাওয়া যায় না। যে-কথাটা

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

আমরা গোড়ায় বলেছি তার পুনরুল্লেখ করে বলা যায় যে তাঁর অতি উচ্চ সংস্কৃতিতে ধুলোবালি মিশিয়ে নিতে অলোকরঞ্জন কখনও দ্বিধা করেননি। ছন্দসিদ্ধ অলোকরঞ্জন ছন্দের মধ্যেও অনেক সময় স্বেচ্ছাকৃত অমসৃণতা এনেছেন। এ-ও তার ছন্দখেলার একটা দিক।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতার বইয়ের সংখ্যা কত আমি জানি না। অনেকে মনে করেন প্রথম দিকে তাঁর কবিতা — রক্তাক্ত ঝরোখা পর্যন্তত—যে স্তরে গিয়েছিল পরে তা আর সেখানে পৌঁছয়নি। এই কথাটা মনে হওয়া কারো পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, যেহেতু শুরুতেই তিনি একটা বিরাট বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। বারবার একই স্তরের ধাক্কা এসে লাগে না একজন লেখকের কাছ থেকে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁর কবিতা বিষয়মগ্নতা, বৈচিত্র্য, ভাষার জাদু আর বিরোধাভাসের খেলা নিয়ে সবসময়ই আমাদের চমৎকৃত করেছে। এতটাই বলতে পারি যে তাঁর এমন একটি কবিতাও পড়িনি যা কোনো-না-কোনো দিক থেকে অনন্য নয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে নিরন্তর উদাহরণসহ কথা বলা যায়, কিন্তু সেই পরিসর বা প্রস্তুতি আমাদের আপাতত নেই। আর আমরা তাঁর প্রথম দিকের বিখ্যাত কবিতাগুলি নিয়ে আর নতুন করে আলোচনায় যাচ্ছি না, যেহেতু তা বাংলা কবিতার পাঠকের কাছে বহু আলোচিত। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে তার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি কিছুই প্রায় এড়িয়ে যায়নি। এসেছে গ্রিকপুরাণ ভাঙা গল্প ('তাইরেসিয়াস'), দেবদেবী : ('তারাদেবী') ও রাগরাগিণীর প্রসঙ্গ। সবই এসেছে তার স্বাভাবিক মগ্নতায় দৈনন্দিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধেও তাঁর থেকে বেশি কোনো বাঙালি কবি বোধহয় কবিতা লেখেননি। এই প্রসঙ্গে আলোচনা এখানে অতিপ্রশ্নের মতো মনে হবে। আমরা বরং তার বাল্যকাল বা গড়ে ওঠা নিয়ে কিছু কথা সেরে নিতে পারি।

২

অলোকরঞ্জনের গদ্য যে কত মৌলিক ও সৌন্দর্যমণ্ডিত তা পাঠক মাত্রই জানেন। সৌভাগ্যবশত আমাদের হাতের কাছে তাঁর 'আমাদের শান্তিনিকেতন' নামের অনবদ্য বইটি রাখা আছে যার একটি বাক্যও আমি নিজে লিখতে পারতাম না। প্রথম বাক্যটি, কলকাতা থেকে রিখিয়া হয়ে শান্তিনিকেতন গিয়ে ছাউনি পাতার নম্র নাটকীয়তার মধ্যে সমস্তটাই যে চন্দ্রমদির মসৃণতায় সম্পন্ন হয়েছিল, সেটা বললে ভুল হবে।' অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে, বালক অলোকরঞ্জনকে প্রথমে কলকাতা থেকে রিখিয়ায় যেতে হয় এবং তারপর সেখান থেকে শান্তিনিকেতন গিয়ে ছাউনি পাততে হয়।

অলোকরঞ্জনের পিতামহ দক্ষিণারঞ্জন প্রধান শিক্ষকের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে রিখিয়ায় একটা বাড়ি বানিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন 'সেই নিসর্গের একমাত্র অধ্যক্ষ। কলকাতাকে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য পরিণতির আশঙ্কা গ্রাস করেছে তখন পিতার ভীমপলশ্রী

মেজাজে' জারি করা হুকুমে অলোকরঞ্জনকে পিতামহের কাছে রিখিয়ায় চলে আসতে হয়। সেই 'ছুটির পরগনাই' ছিল তাঁর প্রথম বিদ্যালয়। আর তার ভাষায় 'রাখালিয়া ওই ভূস্বর্গে সাঁওতালি গানই ছিল আমার অন্যতম পাঠক্রম।' অনেকেই তাঁর গলায় অসাধারণ সাঁওতালি গান শুনেছি আমরা। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'নগরপ্রশ্ন ও সাঁওতালি প্রত্যুত্তর' নামের বিখ্যাত কবিতাটার কথা অনেকেরই মনে পড়বে যার প্রথম স্তবকটি:

"ইচ্ছে মিটে যাওয়ার পরেও ঘৃণিত শয়তান
কেন এমন ইচ্ছা বানায়, উত্তাল মশারি
ছিঁড়ে কেন পালিয়ে যায় সকল নক্তনারী?
দীপির দাং দীপির দাং দীপির দীপির দাং।।

প্রত্যুত্তরে শুধু মাদল বাজে। নগরজীবনের জটিল কুটিল প্রশ্নের একটাই উত্তর সাঁওতালদের কাছ থেকে আসে মাদলের চিরকালীন আনন্দধ্বনির ভিতর থেকে। আমরা দুই জীবন পাশাপাশি উপস্থাপিত দেখি। প্রধানশিক্ষক পিতামহর কাছ থেকে নেসফিল্ডের গ্রামারসহ ইংরেজি ভাষার নির্ভুল প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করেন তিনি শৈশবেই। সেখান থেকে পিতার আদেশে পিতামহর উষ্ণ আশ্রয় ত্যাগ করে বালক অলোকরঞ্জনকে শান্তিনিকেতনে এসে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠ শুরু করতে হয়। সেখানে সহপাঠী হিসেবে পাওয়া গেল অমর্ত্য সেনকে। বালক বয়সেই দুজন মিলে 'স্ফুলিঙ্গ' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানে নানা রকম মুক্তি ও সান্নিধ্যের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়, বলা বাহুল্য। পরবর্তীকালে অলোকরঞ্জন বলেছেন, শান্তিনিকেতনের ধ্রুবপদে ফিরে যেতে চাই, কিন্তু তার আশ্রমিকতায় নয়। মনে মনে আমি ফিরে ফিরেই চলে আসি একান্ত ঐহিক পারত্রিক ভুবনডাঙার মাঠে। বস্তুত অলোকরঞ্জনের মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠানবিরোধী সত্তা লক্ষ করা যায় যা তার ভাষানির্মাণ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। না হলে কি তিনি লিখতে পারতেন 'এক বেশ্যা অনায়াসে মন্দিরভিতরে ঢুকে যায়' কবিতাটি? তাঁর শান্তিনিকেতন মুক্তির বিশ্ব, তা পরবর্তীকালের ট্যুরিস্ট আক্রান্ত অচলায়তন নয়।

৩

কবিতা লেখার পাশাপাশি অলোকরঞ্জন কবিতা, বিভিন্ন ব্যক্তিমানুষ, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিশ্বপরিবেশসহ নানা বিষয়ে ভাষ্যরচনা করে গেছেন। বলা যায়, চলমান সংস্কৃতি ও সৃষ্টিশীলতার ধারাভাষ্য রচনা করে গেছেন তিনি, যা আজ অমূল্য এবং প্রতিষ্ঠানবিরোধী দৃষ্টি বা দর্শনের প্রান্ত থেকে উৎসারিত।

'শেষ কথা কে বলবে' গদ্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'শুধুমাত্র মৃত্যুকে ঘিরেই নয়, আমাদের বাঁচার পরতে পরতেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমাদের কাছে মীমাংসার দাবি নিয়ে আসে। আমরা তাদের সমাধান করতে না পারলেও তখনকার মতো এক-একটি যুক্তিক্রম

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

তৈরি করি, যদিও খুব ভালো করেই জানি কালস্রোতে, আমাদের সে-সমস্ত নির্মিতি খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে। এ যেন। বলার স্বার্থে নিজেরই বিপক্ষে কথা বলা যা একজন দার্শনিকের দায়। আমরা জানি 'ভুলভ্রান্তির অধিকার নিয়েই আমাদের এগোতে হয় আর এই অধিকারেই রয়েছে মুক্তির পরিসর।

তিনি জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১ সালে যোগ দিয়ে ভারতবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে সারাজীবন জার্মান ভাষায় বক্তৃতা করে গেলেন। ছেড়ে গেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে তিনি মাত্র ২৪ বছর বয়সে ১৯৫৭ সালে যোগ দিয়েছিলেন তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে। ফলে তাকে ভারতীয় দর্শন, কাব্য ও সংস্কৃতির নানা দিকে যেমন পাণ্ডিত্য অর্জন করে যেতে হয়েছে যেমন, পাশাপাশি, জার্মান ভাষা ও সাহিত্যকে ভারতবাসী তথা বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে হয়েছে। ফলে তিনি কোনো বিরাম পাননি জীবনে—বিশ্রাম আর কাজকে তিনি মিশিয়ে নিয়েছিলেন। জার্মান ভাষার মহাকবিদের রচনা তিনি দিনের পর দিন অনুবাদ করে গেছেন বাংলা ভাষায়। তিনি পেয়েছেন ওদেশের গ্যোয়েটে সম্মান, কিন্তু ভারত সরকারের কাছ থেকে সেইস্তরের কোনো সম্মান পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ ভারতরত্ন ইত্যাদি পাননি। তার কারণ, ভারত সরকার বাংলা ভাষা বোঝে না আর জার্মান ভাষা তো নয়ই। এটা অবশ্য বলার মতো কোনো কথা নয়।

অলোকরঞ্জনের চিন্তাভাবনার পরিধি এতটাই বিস্তৃত যে তার ভিতরে এই ছোটো নিবন্ধে প্রবেশ করা যাবে না। শুধু একটু আভাস রাখা যেতে পারে।

কবিতা কি বুঝাতেই হয়? এই প্রসঙ্গ টেনে বেকেটের কবিতা বুঝতে গিয়ে অলোকরঞ্জন বলেন, '...একটি কবিতা পুরোপুরি বুঝে ফেলতে হবে এমন কোনো অবাস্তব প্রতিপাদ্য পোষণ করা অসংগত। আমরা জেনেছি, কবিতা না বুঝলেও চলে যদি তা আমাদের অনুভূতিতে বোঝার আগেই পৌঁছে যায় বা, আলোক সরকারের ভাষায় 'বেজে ওঠে।' তবু, বলতে হবে, কিছু না বুঝলে কিছুই হবার নয়। এই জন্য বেকেটের অ্যাবসার্ড কবিতা গিয়ে প্রাণপাত করেন তিনি। এই প্রাণপাত করাই আদর্শ পাঠকের স্বধর্ম। অলোকরঞ্জন জানাচ্ছেন এই প্রসঙ্গে, "বিষ্ণু দে অথবা সুধীন্দ্রনাথের মতো অভিজাত কবিদের কোনো কোনো বাণীর গ্রন্থিতে মথিত হয়ে আছে এমন কিছু গূঢ়োল্লেখ (allusion) আজ অবধি আমরা যাদের নিরসন করতে পারিনি। সেজন্য তাঁদের মহত্ত্ব তো এতটুকু নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি। বেকেটের কাছে আমার অবোধ প্রশ্ন শুধু এই তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যাত্রায় আমাদের অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রতিহত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অনর্থক একটার পর একটা প্রতিবন্ধক পাথরের মতো দুরোল্লেখ ছড়িয়ে দিয়ে কোন আনন্দ তিনি পেয়েছিলেন? কিন্তু, তবু, অলোকরঞ্জন পাঠক হিসেবে হাল ছাড়েন না প্রতিবন্ধক পাথরগুলি সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন।

অলোকরঞ্জন যেমন বিশ্বের সমস্ত মহৎ সাহিত্য সম্পর্কে জেনেছেন—লিখেছেনও

অনেক—সেইরকম তার সমকালীন বন্ধু লেখক-কবিদের নিয়েও কোনো ঔদাসীন্য প্রকাশ করেননি। 'বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুই-ই মহৎ কবিতার উপাদান হতে পারে। এই জেনে তিনি তাঁর বোঝাপড়ার অঞ্চলকে উন্মুক্ত রেখেছেন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে তিনি লিখছেন, "কবিতা তাঁর রক্তমজ্জায় দুরারোগ্য দিব্য ব্যাধির মতো লীন হয়ে গিয়েছে, হতে পেরেছে তাঁর আত্মজীবনীর অঙ্গ। অধুনা ইউরোপের প্রধান কথাশিল্পীরা কবিতার লাইনকে ধুয়ার মতন সাজিয়ে দিয়ে তাদের গল্পগ্রন্থের নাম রাখছেন, এমনকি ওই একটি পঙক্তির স্পন্দ থেকেই বিনিয়ে তুলছেন তাদের কথাবস্তু। একাজ সন্দীপন অনেকদিন ধরেই করে আসছেন।" এ যে কত সত্য তা আমরা সকলেই জানি। আলোক সরকারের প্রশ্নে শুদ্ধ কবিতার প্রসঙ্গ উঠবেই, কেননা তিনিই ওই সময় —ওই ক্ষুৎকাতরতাকে কবিতায় সঞ্চারিত করার অতি-উৎসাহের দিনে—একটা বিপরীত তত্ত্ব হিসেবে শুদ্ধ কবিতায় কথা তোলেন মালার্মের সুত্র মনে রেখে। অলোকরঞ্জন লিখছেন, "আসলে মুশকিল বাধে ওই শুদ্ধ কবিতার' প্রকৃতি নিয়ে। বলা বাহুল্য এখানে কোনো অধ্যাত্ম বিশুদ্ধির পরিপোষকতা করা হচ্ছে না। এর মূল ভরকেন্দ্র তত্ত্বলেশশূন্যতা।... প্রকৃত প্রস্তাবে আলোকের মনঃপূত শূন্য বা শূন্যতা কবিতা রচনার একটি নির্মাণ (Construct)'। এই অবলোকন আমাদের একটি দিশা নির্দেশ করে। শেষে যখন তিনি লেখেন, 'শব্দবেষ্টিত এই মহানৈঃশব্দ্যই আলোকের কবিতার মজা ও মহত্ত্ব, এবং এই অর্থেই তিনি শুদ্ধ (শূন্যের নয়) কবিতা লেখেন।' তখন আমাদের হকচকিয়ে যেতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত আলোকের একসময়কার কবিতা সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য তাত্ত্বিক মূল্যায়ন হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। আলোকের কবিতা অবশ্য, আমাদের বিবেচনায়, শব্দবেষ্টিত মহানৈঃশব্দ্য থেকে মুক্ত হয়ে এসেছিল 'ঘর উঠোন' নামের পুস্তিকায়, যে মুক্তধারা তিনি শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

তার অনুজ বন্ধু দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য থেকে আমরা যেন আলো পেয়ে যাই তাঁকে অনুধাবন করার। তিনি বলেন, 'দেবীপ্রসাদ এমন একজন পদকর্তা যিনি তাঁর একটিও অনুভূত আবেগ বা অভিজ্ঞতাকে অপরীক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে দেন না, ধ্রুপদী বিশ্বসাহিত্যের ব্যাপকতায় তাঁকে বারংবার বাজিয়ে নিয়ে সংবেদী রসজ্ঞের কাছে সন্তর্পণে উপস্থাপিত করেন... দেবীপ্রসাদ তাঁর চরম উচ্ছল মুহূর্তেও অধ্যয়নে অধ্যয়নে নিজেকে জর্জরিত করতে থাকেন। এই প্রক্রিয়া এতই মননভারাতুর যে তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু পড়ুয়াদেরও একটি জ্ঞানব্যবধি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়, যেহেতু তাঁরা তাঁর ধীমন্ত ওই আয়োজন ও সম্ভারের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেন না।" পাঠক বুঝবেন এই রকম গহন অবলোকন বোধহয় একমাত্র অলোকরঞ্জনের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বলা বাহুল্য, দেবীপ্রসাদের কবিতা পড়তে গিয়ে কিছু বাধা অতিক্রম করে এগোতে হয়, যে অপ্রসরণে কবিতা পড়ার আনন্দই ঘনীভূত হয় শুধু।

আজ মনে হয় আমরা অলোকরঞ্জনের যুগ পার হয়ে চলেছি তাঁর বোধ ও ভাষার যুগ, তাঁর পাণ্ডিত্য আর তির্যকতার মিশ্রণের যুগ, তাঁর সরলতা এবং বিরোধাভাসের যুগ। তবে অলোকরঞ্জনের ভাণ্ডারটি শেষ পর্যন্ত থেকে যাবে আমাদের জন্য; ভবিষ্যতের কবি ও পাঠকদের জন্য।

৪

অলোকরঞ্জনকে নিয়ে লিখতে বসলে লেখা কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা বোঝা মুশকিল। আগেই একবার তাকে নিয়ে লিখতে বসে হিমশিম খেয়েছিলাম। আজ লিখছি আহত অবস্থায়, যেহেতু আমরা প্রথম যৌবনেই অলোকরঞ্জনের কাছে পৌঁছেছিলাম একদিন, যেন তিনি আমাদের কল্পিত বাড়ির চিলেকোঠায় বসবাসকারী এক মনীষী যাঁর খুব কাছে যাওয়া যাবে না। সেইভাবেই তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করেছি দূরত্ব ও নৈকট্যের ভারসাম্য বজায় রেখে। তাঁর এক একটি বাক্যে এক-একটি সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে যেন। 'নশ্বরতার বিষাদ' যাঁদের উপর আধিপত্য করেছে, তিনি তাদের একজন নন।

তিনি যেমন এক মুহূর্তে বুঝতে পারেন 'ক্লাসিক ভারতবর্ষের আড়ালে যে-লীরিকভারতী লুকিয়ে আছেন, রাজপুত শিল্পে তারই প্রকাশ ঘটেছিল।' বা যখন বলেন, "গোটা মিশরসভ্যতা জুড়ে রাজারা সবসময়ই দেবতাদের আসন দখল করে অনড় হয়ে বসেছিলেন।' তখন এক-একটা অবস্থান মুহূর্তে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে আমাদের চোখের সামনে। মিশর ও ভারতের দুই প্রাচীন সভ্যতার স্বরূপ মুহূর্তে খুলে যায় আমাদের সামনে—যখন তিনি বলেন, 'মিশরের রাজারা জীবনে ব্যবহৃত আসবাবপত্র কবরের মধ্যেও বহন করে নিয়ে যেতে ভালোবাসতেন, সেই প্রাণান্ত শারীরিকতার স্বাক্ষর সাঁচীস্তূপে নেই। যক্ষ ও যক্ষিণীর চিত্রে শরীর আছে, শারীরিকতা নেই — জীবন, প্রেম ও নিসর্গের ত্রিবেণীসংগম এইসব ছবির প্রাণ। চিন্তা ও সৃজনের জগতের সর্ব বিষয়েরই যেন একজন শিক্ষক ছিলেন অলোকরঞ্জন! ইতিপূর্বে চিত্রশিল্প ও সংগীতচেতনার এই ব্যাপ্তি আমরা বিষ্ণু দে-র মধ্যে পেয়েছিলাম।

তাঁর পরিহাসপ্রিয়তার কথা আমরা সকলেই জানি, যদিও সেইসব পরিহাসের সংস্কৃতি খুব সহজ ছিল না। এই পরিহাস ছড়িয়ে ছিল। তাঁর প্রতিদিনের জীবনে এবং সেই সূত্রে কবিতাতেও। একটি কবিতা পড়ি। বেদনাতেও মিশে থাকত ওই পরিহাস

বাবার দেওয়া কাশ্মীরের শাল
জড়িয়ে তুমি হেঁটে যাবার পথে
একবার তোমায় করি আলিঙ্গন এবং পরক্ষণে
প্রণাম করি স্বর্গত পিতাকে

এখন আমার অস্তিত্বের বৈকালী হ্রদ আনন্দে, ক্রন্দনে (অস্তিত্বের বৈকালী হ্রদ)

আনন্দ-বিষাদের এই মিশ্র রূপ বারবার এসেছে তাঁর কবিতায়। একবার কেমন আছেন জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, মনে পড়ছে, ‘ভালো নেই, মরবারও সময় পাচ্ছি না।’ খুব আনন্দ হয়েছিল এই উত্তর শুনে। সত্যিই কখনো কোনো সময় থাকত না ওঁর হাতে। প্রতিটি মুহূর্ত ছিল কাজ করার মুহূর্ত। প্রথম যৌবনেই তিনি সারা বিশ্বের নির্বাচিত কিছু কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার প্রকল্প হাতে নেন। সঙ্গী করে নেন শঙ্খ ঘোষকে। বেরোয় ‘সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত’ যে-বইয়ের সবথেকে বেশি সংখ্যক কবিতা ছিল অলোকরঞ্জনের অনুবাদে। সাহস করে বলতে পারি, এত ভালো সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ আর কেউ করেছেন বলে জানি না। পরে তিনি জার্মান মহাকবিদের সকলের কবিতাই বাংলায় অনুবাদ করে আমাদের অবাক করে দেন। জার্মান এবং বাংলা দুটোই ছিল তাঁর মাতৃভাষা, কেননা জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় তিনি জার্মান ভাষায় বক্তৃতা করেছেন এবং সংসার করেছেন। মহাকবি গ্যোয়েটে ছিলেন তাঁর প্রধান আকর্ষণ। যদিও বেশ্‌টের কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছেন প্রচুর, যেমন হ্যোল্ডারালিন বা হাইনের কবিতা। এসব কাজ তিনি এত স্বচ্ছন্দে আর সাবলীলভাবে করেছেন। যে মনে হত তিনি লেখার খেলা খেলছেন।

গ্যোয়েটের একটি মহাকাব্য পুরোটাই অনুবাদ করা—যে বইটি বাংলাদেশ থেকে নবকলেবরে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়, তার নাম ‘প্রাচ্য-প্রতীচীর মিলনবেলার পুঁথি’। একে অলোকরঞ্জন ‘বিশ্বপ্রেমের পুথি’ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। বস্তুত আরব-পারস্যের কবিদের কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্যোয়েটে এই কাব্যটি রচনা করেন। শুধু এই বইটি নিয়েই একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা সম্ভব। আমরা শুধু কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করছি তাঁর কাজের উচ্চতা বোঝানোর জন্য।

কোরান কিছু অনাদি কিনা?
এ নিয়ে প্রশ্নই তুলি না।
কোরান দিলেন সৃষ্টিকর্তা?
জানি নে তার উত্তরটা।
সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরান
জানি মুসলমান হিসেবে।

— — — — — — — — — —

এক হিসেবে আমরা সবাই উন্মাদ, না?
তারুণ্য তো সুরা ছাড়াই উন্মাদনা।
যৌবনকেই পান করে নেয় যখন জরা
সেটাও তো এক ধন্য দশা পাগল করা।
মধুর জীব পোষণ করে গ্লানির কথা,

দুর্ভাবনা দূর করে দেয় দ্রাক্ষালতা।
স্পষ্ট শোনো নামাজ বা আজানে

সবার সঙ্গে রইব অবনত,
কিন্তু আপন দিব্য উচাটনে

একা-একাই পাগলামি সংগত।

তিনটি অংশই ‘সাকীনামা’ বিভাগ থেকে উদ্ধৃত। পড়তে পড়তে মনে হয় না এসব অনুবাদ পড়ছি। কখনও কোনো ক্ষেত্রেই মনে হয়নি। এ যে কত বড়ো দক্ষতার কাজ মেধা তথা মনীষার কাজ তা শুধু অনুমান করা সম্ভব।

৫

লেখাটি এলোমেলো হয়ে আসছে ক্রমশ। এখন শেষ করতে হবে। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন অলোকরঞ্জন কি শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন? যিনি জীবন শুরু করেছিলেন ‘বন্ধুরা বিদ্রুপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে’ পঙক্তিটি ঈশ্বরকে সম্বোধন লিখে? এ বিষয়ের কোনো উত্তর আমরা জানি না। তবে তিনি স্পষ্টতই পরবর্তীকালে বলেছিলেন, ‘ঈশ্বর একটা কনস্ট্রাক্ট’। অর্থাৎ ঈশ্বর একটা নির্মাণ। সভ্য মানুষের হাতে তৈরি ঈশ্বর মানুষের বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। অলোকরঞ্জন এটা জেনেও হয়তো ঈশ্বরবিশ্বাস থেকে সরে যাননি। এ বিষয়ে এর থেকে বেশি স্পষ্ট করে কথা বলার লোক তিনি ছিলেন না। এক সময় এ নিয়ে তার বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে। তাঁর অনেক অনুগামী তিনি ঈশ্বরবিশ্বাস থেকে সরে গেছেন বলে তাঁর কাছ থেকে সরে গেছে। অনেকে নির্ধারণ করেছেন যে ঈশ্বরবিশ্বাস চলে যাওয়ার কারণে তার কবিতার মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। আমরা এত সরলভাবে কোনো কথাই গ্রহণ করিনি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিরা যেমন ঈশ্বরবিশ্বাস নিয়ে বেঁচে ছিলেন এবং সেই সূত্রে একটা মহৎ বিমূর্ততায় মন মেলে নিয়ে শান্তিতে থাকতে পেরেছেন, তেমন, এই ঈশ্বরবিশ্বাস হারিয়ে ফেলার যুগেও মহৎ কবিরা কবিতা লিখেছেন, লিখবেন। আমাদের বাংলাভাষাতেই জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে-র মতো কবির ঈশ্বরবিশ্বাসের দরকার হয়নি। বস্তুত ভারতবর্ষে নাস্তিকতাও দর্শনের জায়গা পেয়েছে বহু প্রাচীন কাল থেকে, যার প্রথম স্ফূরণ গৌতম বুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে আলোকিত করেছে। এ প্রশ্ন নিয়ে আমাদের আর বিশেষ কিছু বলার নেই। অলোকরঞ্জন বিনয় মজুমদারের কথা লিখতে গিয়ে ফরাসি দার্শনিক মঁতেইন এর কথা তুলেছেন, ‘দার্শনিকতা করতে পারা মরতে শেখার ওপর নির্ভর করে।’ বিনয় তা শিখেছিলেন বলে অলোকরঞ্জনের মনে হয়েছে কেননা জীবনের শেষ কয়েকমাস তিনি নাকি আহার গ্রহণ করতে আগ্রহ বোধ করতেন না। আমরা কিন্তু অলোকরঞ্জনকে কখনও নিষ্প্রভ বা বিষাদগ্রস্ত দেখিনি। তিনি জানতেন ‘শান্তভাবে

আচম্বিতে ইন্দ্রজাল তৈরি করার রহস্য।' আমরা তাঁর মৃত্যুত্তীর্ণ প্রহরের স্তব্ধতা কাটিয়ে তাঁর একটি কবিতা পড়ে মন ফেরাব।

সেই যে তুমি একফোঁটা মসলিনে
বুনতেছিলে দামাস্কাসের গোলাপ
মাথার উপর তখনো ঝুলছিল।
ড্যামোক্লেসের ছোরা।

এই যে তুমি রহিমকে বাঁচাতে
শপথ নিতেই ধর্মঠাকুরপো-রা
হ্রদে মেশায় গরল, ঝোলে তোমার
মাথার উপর ড্যামোক্লেসের ছোরা... (ড্যামোক্লেসের ছোরা)

প্রতি মুহূর্তেই মাথার উপর একটা ছোরা ঝুলছে জেনেও হাসিখুশি থেকে ওই অক্ষয়বটের দেশ পার হয়ে যাওয়াই জীবন। অলোকরঞ্জন জীবনের শেষ একমাস মাত্র, তাঁর অতি প্রিয় ছোটো বোনের মৃত্যুসংবাদ শুনে, নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। বাকি দীর্ঘ জীবনে চূড়ান্ত সার্থকভাবে বেঁচেছিলেন তিনি। তাঁর অফুরন্ত রচনা রক্ষা করা যাবে কিনা, আমাদের নিষ্ক্রিয়তার সামনে সেটাই বড়ো প্রশ্ন হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। আমরা তাকিয়ে রইলাম।

৬

লেখাটি শেষ করার পর এমন একটি কবিতা হাতে এল যা পাঠকের সামনে তুলতে আমরা বাধ্য। অলোকরঞ্জন তাঁর প্রিয়তম দুই বন্ধুকে কোথায় রাখতেন তা জানার মধ্যে ব্যক্তিজীবনের একটা ইতিহাস জানা যাবে। এই জানা বাংলা কবিতার ইতিহাসেও মূল্যবান বন্ধুত্বের দিক থেকে গুণগ্রাহিতার দিক থেকে এবং একজন কবির আত্মপরিসরের গঠনের দিক থেকে। কবিতাটি এই :

কবিতা লেখার গরজে

দুপুরের কাছে নিরপেক্ষতা শিখি,
দুপুর যেন বা আশৈশব সুহৃদ
শঙ্খ ঘোষের মতো

বিকেলের দিকে আলোক সরকারের
প্রজ্ঞা ও পারমিতা
শিখে নিয়ে আমি থেকে যাই অনাহত।

ধু ধু সন্ধ্যায় আমি তো নিরক্ষর,
কেননা তখন যাপিত দিনের অর্জন মুছে ফেলে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

কবিতা লেখার গরজে নিজেকে করি ক্ষতবিক্ষত...

এই কবিতাটি পড়ার পর এখন বলা যায় আমাদের এই প্রয়াস শমে এসে দাঁড়াল।

উৎস : নতুন কবি সম্মেলন, ডিসেম্বর, ২০২০

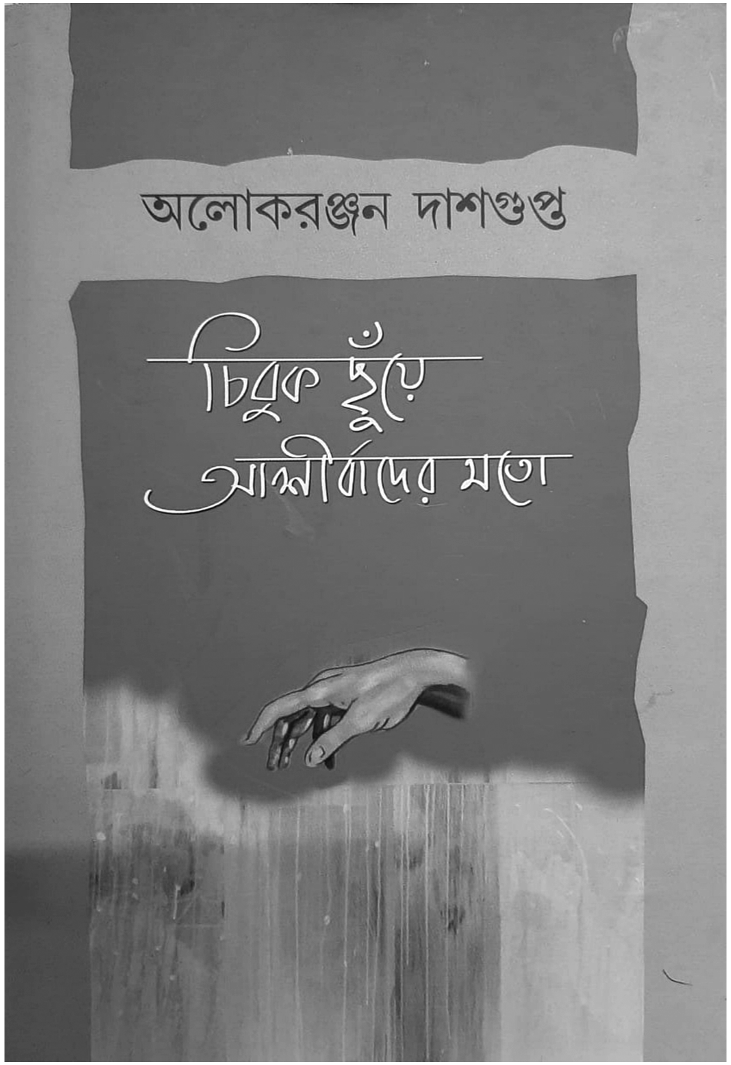

অলোকসামান্য অলোকরঞ্জন

সুজিত সরকার

ঐ যেরকম বলেছিলেন পট্টভি সীতারামৈয়া
বয়স যেন মহিষদেহে বৃষ্টিধারা
কে এক অলীক অগস্ত্য সেন বলে গেলেন 'মশায় দাঁড়ান
একটু পরেই ফিরে এসে আপনার এই বস্তিপাড়ায়
প্রাসাদ গড়বো"
আমিও খুব দাঁড়িয়ে আছি—
বাতাস বহে পুরবৈয়াঁ

কবিতা পড়তে যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারবেন, উল্লিখিত লাইনগুলির রচয়িতা কে। প্রত্যেক বড়ো কবিরই নিজস্ব এক কাব্যভাষা থাকে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা 'পঞ্চাশের কবি' নামে পরিচিত, সেই তালিকায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের নাম একেবারে প্রথম দিকেই। সুতরাং, তাঁর যে একটি নিজস্ব কাব্যভাষা থাকবে —তা তেমন কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়। আশ্চর্য হবার মতো ব্যাপার এই যে, প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই অলোকরঞ্জন এই নিজস্ব ভাষা তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন, যা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার অনেক প্রধান কবিরাও করতে পারেননি। কবির নিজস্ব কাব্যভাষাকে অলোকরঞ্জন বলেছেন 'স্বরায়ণ'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ -'যৌবন বাউল' এই যে অলোকরঞ্জন তাঁর 'স্বরায়ণ' খুঁজে পেয়েছিলেন, নিম্নলিখিত লাইনগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ :

আজকে তোমার আজন্ম-বন্দীরা
মুক্তি পাবে, তাদের পথে তীর্থতোরণ খুলে
সূর্য হবে রক্তজবা তোমার সোনার চুলে
তোমার কান্না আমার হাতে আনন্দমন্দিরা !

অলোকরঞ্জন লক্ষ্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষের দিকের কবিতায় 'চলতি' শব্দের সঙ্গে 'অত্যন্ত পুষ্পল' শব্দকে মিশিয়ে দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, অলোকরঞ্জনের কাব্যভাষাও এই দু ধরনের শব্দের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে :

আসা-যাওয়ার পথের ধারে
প্রায় প্রতিদিন লক্ষ্য করি
রাধিকামোহন মৈত্র
বসে আছেন মোড়ার উপর

তাঁর উপরে সৃজনচৈত্র
ঝরে না আর তিনি এখন
সৃষ্টিবিহীনতার সৃষ্টি
মাঝে-মাঝে গানের উপর
দুতিনটে প্রবন্ধ লেখেন
তাঁর নিজস্ব সরোদখানা
ছাত্র তীর্থযাত্রিকদের
বিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন

অনন্তমূল প্রজ্ঞানন্দে

উপরোদ্ধৃত কবিতায় 'চলতি' শব্দের সঙ্গে 'সৃজনচৈত্র', 'তীর্থযাত্রিক', 'অনন্তমূলে', 'প্রজ্ঞানন্দ' এইসব 'অত্যন্ত পুষ্পল' শব্দের এক সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। অলোকরঞ্জনের ছাত্রজীবনের বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে শান্তিনিকেতনে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে । ওই কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় অলোকরঞ্জন বলেছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রীর কথা :

এখনো দেখতে পাই রোজ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে,
সকাল আটটার রৌদ্র তাঁর পায়ে শিক্ষার্থীর মতো।

আরো বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেনের কথা :

যেতে যেতে রুগ্ন ক্ষিতিমোহন সেনকে দেখতে পাই,
বয়সবিবর্ণ তাঁর সেই কান্তি, তবু সেই মুখ
পুরনো বটের সদ্য পাতার মতন ফুটে ওঠে।

'রক্তাক্ত ঝরোখা'র একটি কবিতার প্রথম দুটি লাইন :

শ্রীনিকেতনের মোড়ায়
প্রেমিকযুগল দুপুর ওড়ায়।

শান্তিনিকেতনে থাকার কারণে বীরভূমের গ্রামগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখার ও জানার সংযোগ ঘটেছিল তাঁর। দক্ষিণ কলকাতায় থাকার কারণে অর্জন করেছিলেন সুভদ্র নাগরিকতা। আর প্রবল ঈশ্বরচেতনা ও অসাধারণ ছন্দোজ্ঞান তাঁর তো প্রথম থেকেই ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথম কাব্যগ্রন্থেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন : "ভগবানের গুপ্তচর / মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর / ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না।" বহুদিন হলো অলোকরঞ্জন স্থায়িভাবে জার্মানিতে বসবাস করছেন। এর ফলে প্রতীচ্যের জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলির খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছেন তিনি। এই সবকিছুর সঙ্গে

যুক্ত হয়েছে তাঁর বিপুল অধ্যয়ন, ধীরে ধীরে নির্মিত হয়েছে এক অভিজাত কাব্যভাষা :

আঁদ্রে জিদের জর্নালে দ্বিধা ছিল,
সংশয় থেকে সাহস পেলাম আমিও,
বুকে দরুদুরু মৃদঙ্গ বিদারিল,
তথাপি সামনে এগিয়ে ছুঁলাম নীলাভ উত্তরীয়!

প্রান্তরে ছিল ছড়ানো বহুব্রীহি,
চাষীরা ফিরেছে, বয়ঃসন্ধি ভেঙেছে রাখাল ছেলে,
অবতংসের আলো-আঁধারির কিনারে শব্দ জ্বেলে
তাকে বললাম : 'আমি হতে চাই সচ্ছল সুগৃহী'

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যৌবন বাউল'-এ অলোকরঞ্জন বলেছিলেন :

'বন্ধুরা বিদ্রুপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি ব'লে ;
তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হ'লে
আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো?'

উল্লিখিত লাইনগুলি যে কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে, সেই কবিতার শেষ স্তবক :

'এখনো তোমাকে যদি বাহু ডোরে বুকের ভিতরে
না পাই, আমাকে যদি অবিশ্বাসে দিই পায়ে দ'লে
চ'লে যাও, তাহলে ঈশ্বর
বন্ধুরা তোমায় যেন ব্যঙ্গ করে নিরীশ্বর ব'লে

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'তে অলোকরঞ্জনকে বলতে শোনা যায়—

মাঝে মাঝে স্পষ্ট করে বলা দরকার
ঈশ্বর আছেন,
মগডালে বসে থাকা পাপিয়া কে আর
পর্যবসিত বস্তুপৃথিবীকে স্নান করাচ্ছেন।

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রক্তাক্ত ঝরোখা'র চব্বিশটি অংশে বিভক্ত দীর্ঘ নাম-কবিতাটির প্রথম অংশ শুরু হয় এইভাবে :

'আমার বিষয়বস্তু : 'ঈশ্বর'

এবং শেষ অংশ শুরু হয় এইভাবে :

বাটিকে-আঁকা আকাশে দিনশেষে
তুমি আমার প্রিয়,
রয়েছে যারা তোমার পরিবেশে
তারাও ঈশ্বরীয়;

যে প্রবল আস্তিক্য থেকে রচিত হয়েছে উল্লিখিত পঙক্তিগুলি, পশ্চিমী জীবনধারার সংস্পর্শে আসার কারণে তা পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে অনেকটাই কমে এসেছে এরকম এক ধারণা পোষণ করেন কেউ কেউ। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। যাঁরা এই ধারণা পোষণ করেন তাঁরা অলোকরঞ্জনকে বুঝতে পারেননি। 'শতভিষা' পত্রিকায় তাঁর যে সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছিল, সেখানে ঈশ্বরবিশ্বাস সম্পর্কে তিনি বলেছেন: 'আমার আগের কবিতায় যে প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বরের বন্দনা ছিল আজকে আমার ঈশ্বর আরো আমার কাছে নেমে এসেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারগুলো সম্পর্কে'ই আজ আমার বিশ্বাস চূড়ান্তভাবে ভেঙ্গে গেছে .... ঈশ্বরের কথা....আমি অনেক তির্যকভাবে বলি। ....ঈশ্বরকে আমি প্রতিষ্ঠানের থেকে এনে তাকে আমার গোপনতম প্রেমিকে পরিণত করেছি।" — এই বক্তব্যের সমর্থনে, 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে' কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি সম্পূর্ণ কবিতা নিচে উদ্ধৃত হলো:

রেমব্রান্টের ছবির গাঢ় বিষণ্ন আচ্ছন্ন তীব্র শিখা
দেখেও আমার চোখ ভরেনি, খরগোশদের ঘাসের খিড়কি দিয়ে
সাঁতরানো-খুনসুটির দৃশ্য দেখেছি ঢের; দেবশিশুর হাতে
পাখির মতন ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছ এসে পড়েছে দেখেও আমার
মন ভরেনি; দরবেশেরা নেচেছিল নক্ষত্রের নিচে
কল্যাণীর মেলায়, তবু খুঁজেছিলাম সত্তার শাশ্বত
আলম্বন বিভাব, নিছক হৃদয় এবং ইন্দ্রিয় পার হয়ে;
এবং সেটাই দেখি হঠাৎ বেড়ার উপর অর্ধেক ভর ক'রে
দাঁড়িয়ে তুমি নিরপেক্ষ, ব্রহ্ম যেমন একটি অক্ষরে

আঁকতে গেলে জীবন যাবে, টান লেগেছে দেহের অঞ্জলিরে !

কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়, কেন অলোকরঞ্জন ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠান থেকে নামিয়ে এনে তিনি তাঁর গোপনতম প্রেমিকে পরিণত করেছেন। অনেকেই হয়তো জানেন, রবীন্দ্রোত্তর যুগের বিশিষ্ট কবি অমিয় চক্রবর্তী অলোকরঞ্জনের প্রিয় কবি। এই দুই কবির জীবনের মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে অতিবাহিত হয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর কবিজীবনের সুচনাপর্ব, কবি অলোকরঞ্জনেরও শুরুর দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে রাবীন্দ্রিক আবহাওয়ায়। অমিয় চক্রবর্তী আধ্যাত্মিক কবি, অলোকরঞ্জনও তা-ই। অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন 'জগৎযাত্রী', অলোকরঞ্জনও 'বাউল থেকে বিশ্বপথিক'। অমিয় চক্রবর্তীর ঈশ্বরচেতনা মানবতাবোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। 'মানুষের ঈশ্বর' কবিতায় তিনি যে ঈশ্বরের কথা বলেন, তাঁর রং মাঝামাঝি, চকচকে চুল, নতুন পোষাক, এবং তাঁকে তিনি থিয়েটারে দেখেন নিগ্রো নাটকে। অলোকরঞ্জনও অমিয় চক্রবর্তীর মতো বলতে পারেন : 'আমি মানুষের প্রতি আস্থা থেকেই আধ্যাত্মিক চিন্তায় পৌঁছেছিলাম। মানুষের

চোখেই ঐশিকতাকে দেখেছি।' আর এর অনেক প্রমাণ তো ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতায়, যেমন 'ট্রামলাইনের রাস্তা সারায় রাঙা লণ্ঠন জ্বেলে / দুটি ঈশ্বর ছেলে" কিংবা 'ভিখারী, আপেল হাতে, অবিকল ঈশ্বরের মতো।'

অলোকরঞ্জনের আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে তাঁর কবিতার অভিনিবিষ্ট পাঠক সুভাষ ঘোষালের মন্তব্যটি ('মাটি' পত্রিকায় প্রকাশিত, হেমন্ত-বসন্ত সংকলন, ১৩৯৯) প্রণিধানযোগ্য : 'সাধারণত দেখা যায় বেশীর ভাগ কবি ও শিল্পীরা আস্তিক্যবোধে হাঁটতে গিয়ে প্রভাত ও রাত্রির যে-কোন একটি পথ বেছে নিতে চান। গতানুগতিকতার চেহারা বলতে এই বেছে নেবার ছবিটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পাঠকের। কিন্তু যিনি কোন রকম নির্বাচনে যেতে চান না, বরং কোনরকম বিচারে না গিয়ে নির্বিচারে দেখে নিতে চান দুটি আলাদা পথ শেষে একে অপরের মধ্যে অনুপ্রবেশ ক'রে যে তৃতীয় পথের সূত্রপাত করে তার অস্থিরতার সম্ভাবনা কতোটা প্রকৃতপক্ষে, তাঁকে বোধহয় আমরা বলতে পারি উজানমাঝি। অলোকরঞ্জনের কবিতাগাত্রে ছড়িয়ে আছে সেই উজানমাঝির হাসি ও হাহাকারের আশ্লেষ।"

হিমেনেথ তাঁর কবিতার শরীর থেকে একটি একটি ক''রে সব অলংকার খুলে ফেলেছিলেন। অলোকরঞ্জন মূল্যবান অলংকারে ভরিয়ে তুলতে চান তাঁর কবিতার শরীর। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি দু-ধরনের অলংকার তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন : অনুপ্রাস ও উল্লিখন (allusion)। 'লঘু সংগতি ভোরের হাওয়ার মুখে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন কবিতা থেকে লাইন উদ্ধৃত ক'রে দেখানো যেতে পারে অনুপ্রাস অলংকারের ছন্দের ব্যবহার:

ক) তিসিবনে একা শিশু ভেসে আসে নিশুতি-উদাস
খ) দেশ-বিদেশে বাসা আমার যখনই যাই আসি
    হাতে আমার বেউড় বাঁশের বাঁশী
গ) একরাশ কহ্লার ঠেলে দুলহন আমার
    উঠে এল পালকির ভিতরে।

এমনকি তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের নাম থেকেও বোঝা যায় অনুপ্রাস ব্যবহারে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা, যেমন 'যৌবনবাউল', 'রক্তাক্ত ঝরোখা', 'গিলোটিনে আলপনা', 'মরমী করাত"। 'স্মৃতির শরীরটিকে নতুনতর ব্যঞ্জনা ও উপকরণে ঋদ্ধ এবং সম্প্রসারিত করে তোলাই পুরাণের কাজ" — বলেছিলেন অলোকরঞ্জন। তাঁর নিজের কবিতায় প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায় এই পুরাণের ব্যবহার যেমন, 'যৌবনবাউল'-এর অন্তর্গত বহু পঠিত একটি কবিতার শেষ কয়েকটি লাইন :

তুমি যে বলেছিলে রাত্রি হলে
মুখোশ খুলে দেবে বিভোরবিভা
অহংকার ভূলে অরুন্ধতী

বশিষ্ঠের কোলে মূর্ছা যাবে !
রাত্রি হ'লো।

আর ১৯৯০-এ প্রকাশিত 'মরমী করাত' কাব্যগ্রন্থেও সেই পুরাণের প্রয়োগ :

'আমাকে বয়ে
নিয়ে চলেছে অনন্তমুখী গরুড়ের ডানা, আমার নিচে
বিচ্ছুরিত হচ্ছে রাত্রির ইস্রায়েল—ত্রিজগৎ থেকে বিতাড়িত
এখানকার ইহুদিদের নিয়ে দুর্গাশঙ্কর একটা বিক্ষুব্ধ ডক্যুমেন্টারি
তুলবে ভেবেছিল।"

অন্ত্যমিলের ব্যবহার অলোকরঞ্জনের কবিতায় বিস্ময়কর। 'এর আগে'র সঙ্গে 'চেরাগে'র কিংবা 'ডমরু'র সঙ্গে 'অমরু'র মিল কেমন স্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু বিপুল শব্দভাণ্ডারের মালিক না হলে এই মিল ঘটানো প্রায় অসম্ভব। বাংলা কবিতার রাজ্যে অলোকরঞ্জন না এলে আমরা কি কখনো ভাবতে পারতাম 'নম্র কিশোর ভাবো'র সঙ্গে 'সতকঞ্জনাভ'র মিল সম্ভব হতে পারে?

রহস্যময়তা কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কবিতাকে আরো বেশি সুন্দর ও রহস্যময় করে তোলার জন্য কবিরা অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে কবিতা থেকে কোনো শব্দ বা লাইন কিংবা কোনো ঘটনার বিবরণ বাদ দিয়ে দেন। পাঠকরা নিজেদের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওই শূন্যস্থান পরণ করে নিন—এরকমই এক ইচ্ছে জেগে ওঠে কবিদের মনে। কবিদের ব্যবহৃত এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'এলিমিনেশন'। অলোকরঞ্জন এই 'এলিমিনেশন' পদ্ধতিকে কেমন চমৎকারভাবে কাজে লাগিয়েছেন, তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ নিচের কবিতাটি ঃ

ধানখেতে এসেছিল বেড়াতে দু-জন,
ধানখেতে শিশু; রেখে পালাচ্ছে দু-জন;

'এবার স্টেশনে চল' বলল একজন;
'এবার স্টেশনে চল' বলল একজন।

'সাঁকো বেয়ে নিচে এসে এ ওকে বলল,
'সাঁকো বেয়ে নিচে এসে এ ওকে বলল।

আর নেমে এসে দ্যাখে সুন্দর কাঁথায়
রক্তমাখা শিশু নিয়ে ধানী নৌকো যায়।

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের মাঝখানে একটি গল্প লুকিয়ে রয়েছে। কবি সেটি ইচ্ছে করেই আমাদের বলেননি। এর ফলে কবিতাটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে একধরনের রহস্যময়তা, কবিতাটি অনেক বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

শুধুমাত্র একটি শব্দের বদল ঘটিয়ে নিছক একটি বিবৃতিকে অসাধারণ একটি কবিতায় উত্তীর্ণ করে দেবার মতো আশ্চর্য কবিত্বশক্তির অধিকারী অলোকরঞ্জন। যেমন 'জবাবদিহির টিলা'র অন্তর্গত 'শুধু তবু' কবিতাটি :

করাতের গায়ে শুধু লেগে থাকে কাঠের গুঁড়ো।

অবিবেকী কবি মজলিশে গিয়ে গোষ্ঠী গড়ে,
কাপুরুষ দেখে সংগ্রামীরাও লুকিয়ে পড়ে
একটি শিশুরে ছায়ার আড়ালে, ভিটেবাড়িতে
বাস্তুসাপের আশ্রয়ে একা আঁকড়ে ভিটে
জরতীপিসিমা, টিনের চালাও উড়েছে ঝড়ে

করাতের গায়ে তবু লেগে থাকে কাঠের গুঁড়ো।

ছন্দ, অনুপ্রাস ও অন্ত্যমিলের কারণে অলোকরঞ্জনের কবিতা পড়তে সকলেরই ভালো লাগে। কিন্তু পড়তে পড়তে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই অনেক অজানা বাংলা শব্দ আমাদের শব্দভাণ্ডারে জমা হতে থাকে, যেমন 'কীর্তির কিঞ্জল', 'বধূর কূর্পাক' ইত্যাদি। তাঁর কবিতার পাঠক হিসেবে এই এক লাভ হয় আমাদের সকলের। এর থেকেও বড়ো লাভ অবশ্যই এই যে তাঁর কবিতা পড়ে পরিশুদ্ধ হয় আবেগ, শিক্ষিত হয় ভাষা, সমৃদ্ধ হয় মন। কবিতায় বাঁচে প্রজ্ঞাশাসিত অসুস্থ পাগলামি—প্রথম কাব্যগ্রন্থেই একথা বলেছিলেন যিনি, সেই শ্রদ্ধেয় কবিকে একজন সামান্য কবিতা পাঠক হিসেবে দূর থেকে প্রণাম জানাই।

উৎস : অন্তরীপ, অক্টোবর ১৯৯৩

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : আবহমানের ভুবনে

জহর সেনমজুমদার

১. প্রসন্নতার বোধিবিন্দু

২. রক্তক্ষরণের মর্ত্যবিন্দু

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতাকে, এইভাবে, দুটি পর্বে বিভক্ত করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে একজন কবির তৎসহ মানবের আবেগ ও মননের গভীর রূপান্তর। প্রসন্নতার বোধিবিন্দুজাত প্রথম পর্বের কবিতা থেকে আত্মউন্মোচিত রক্তক্ষরণের মর্ত্যবিন্দুনির্ভর কবিতার দিকে যে অলোকরঞ্জন হেঁটেছেন, তিনি আমাদের বিশেষ অর্থে স্মরণ করিয়ে দেন জাঁ ককতোর সেই প্রবাদ উক্তি 'আমার সবচেয়ে ভালো লাগে সেই মানুষে যে হাঁটে, আর তার হাঁটার ভঙ্গি।' শুধুমাত্র মানুষই নয়, কবিতাও যে হেঁটে যায় এক প্রান্তের দর্শন থেকে অন্য প্রান্তের অভিষিক্ত চৈতন্যে, তারই মহৎ প্রমাণ অলোকরঞ্জনের কবিতা। তা নয়তো সেই স্থবিরতাই কবিকে গ্রাস করে, যা কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠবার পথে কবিসত্তারূপান্তরের প্রতিবন্ধক হয়েই দাঁড়ায়। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত 'যৌবনবাউল' কাব্যগ্রন্থের 'নামখোদাই' কবিতাটির প্রতি মন দেওয়া সম্ভব :

'...এই যে ঘুমনিবিড় মাঠ, মুখরা এই নদী
আমাকে অনায়াসেই ভোলে যদি,
এখানে গত একুশে আশ্বিন
শীর্ণ এক টিলায় সারাদিন
বাটালি দিয়ে যত্নে গাঁথলাম
ক্ষণপ্রাণ আমার ছোটো নাম।'

বাটালি দিয়ে আমরা অনেকেই এইভাবে নাম খোদাই করি, চিরজীবিতের দলে পৌঁছোবার গভীর আকুতিতে। কিন্তু এই নাম খোদাই থাকে না, দ্রুত মুছে যায় ; কারণ এ-হেন নামবপন করবার মধ্যে নেই প্রাণের সংসর্গ তৈরি করবার বা মহাজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে যাবার ব্যাপকতা। গভীর মর্মে তাই দ্রুত মর্মর উঠলো। বদলে গেলো জীবনযোগের অন্তঃসারশূন্য মানসিকতা। নাম মুছে গেছে বলে ক্রুদ্ধ হলেন না তিনি। বরং অন্তর্গত প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত হয়ে দাঁড়ালেন নিঃশব্দ অস্তিত্ব নিয়ে, সাঁওতালদের মাঝে, মাদলের সম্মিলিত ছন্দময় ধ্বনির মাঝে এবার প্রসন্ন উৎসাহে নামখোদাই করলেন সাঁওতাল ও মাদলের আভ্যন্তরীণ যৌথ হৃদয়প্রবাহের ভিতর। লিখলেন 'তাদের বুকে এ-নাম বুনে

বলেছি ঃ ভুগবি নে।' এইভাবেই তিনি মহাজীবনের অন্তর্গত হলেন কিম্বা মহাজীবনও রূপ-রস-ধ্বনি নিয়ে তাঁর অন্তর্গত হলো, চিহ্নিত হলেন তিনি মিশে যাবার অন্তরঙ্গে। চিহ্নিত হলো আত্মবিস্তারে জীবনসংরাগী হয়ে উঠবার নিজস্ব প্রবণতা। জীবন-সংরাগ থেকেই 'যৌবনবাউল' পর্যায়ে আঁকড়ে ধরলেন মা এবং ঈশ্বরকে। প্রথম মূর্তিটি রচিত হলো প্রাত্যহিক দেখার মাধ্যমে। দ্বিতীয় মূর্তিটি রচিত হলো দেশজ শিকড়ের আল্পনা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে। মাতৃমূর্তির মধ্যে জাগ্রত হলো পূর্ণিমার সহস্র ধারা, উদ্ভাসিত ঊষা, অতন্দ্রিত পদ্মবীজমালা, ধ্রুববতী আনন্দ, উজানী উল্লাস এবং বোধিবৃন্তমূলের জীবন্ময়ী আনন্দপ্রতিমার রূপ। দ্রষ্টব্য 'মায়ের জন্মদিনে' কবিতাটি, যেখানে তিনি বলছেন :

'..... আমারি জীবনমন্ত্রে জীবন্মৃত এই যে প্রান্তর
সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলার ফুল্ল সুষমায়
কাল যদি ভরে ওঠে, তবে তার নিহিত ভাস্বর
যে-অমৃতে সে তো তুমি আজো যার অপার ক্ষমায়
পাথিবীকে বুক টানি।'

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মা-কে ভালোবাসার তাঁর উৎসমূল থেকে তাঁর মধ্যে জন্ম নিচ্ছে সর্ব মানবযোগের অভীপ্সা। দরিদ্রধূসর ধানক্ষেতে তাঁর চোখে আট্‌কে যায় যে কালোনয়না কিষানী মেয়ে, সেই মেয়ের ভিতর একই সঙ্গে রয়েছে শ্রাবণের ঢল এবং অগ্নিকণা। এই মেয়ের ভিতর এসে দাঁড়ায় মিথসদৃশ সুজাতা, এই মেয়ের ভিতর এসে দাঁড়ায় তাঁর কাঙ্ক্ষিত মাতৃসত্তা। বুকভর্তি সাঁওতালদের মাদলের সুর নিয়ে এবং চোখভর্তি চন্দনরাঙানো লালচেলির মাতৃরূপে নিয়ে তিনি তাঁর প্রাণবৃক্ষে ঈশ্বরকে গ্রহণ করে বলেন ঃ

'.....বন্ধুরা বিদ্রুপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি ব'লে;
তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হলে
আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো?' (বন্ধুরা বিদ্রুপ করে)

এই চিতাস্তর থেকে অলোকরঞ্জনের কবিতায় দু'টি ব্যাপার দ্রুত ঘটে গেল। প্রথমত সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে গ্রহণ। দ্বিতীয়তঃ গোটা পৃথিবীর নাগরিক হয়ে থাকবার প্রবল বিশ্বাসভূমি। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', ১৯৬৮ সালে 'প্রতিদিন সূর্যের পার্বণ', ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 'রক্তাক্ত ঝরোখা', ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'ছৌ কাবুকির মুখোশ'— ইত্যাদি কাব্যপর্যায়ে মানুষ এবং ঈশ্বরের একাকারসত্তায় ব্যক্তিকে দেখলেন, মানবাত্মার পর্যায়ভেদ লক্ষ্য করলেন এবং শেষপর্যন্ত ঘাতক হয়ে ওঠা মানুষের মধ্যে শিল্পসম্মত মানুষের বুকের পালক খুঁজতে একান্ত স্বীকারোক্তি দিলেন :

১. '....তবে শোনো, এই নগরীর সন্তান
আমিও, অথচ যে-রাখাল দূরদেশী
আমি তাঁর কাছে সঁপেছি মনপ্রাণ,
কেননা শহরে পাঠভেদ বড়ো বেশি।'

(যে রাখাল দূরদেশী ঃ নিষিদ্ধ কোজাগরী)

২. '....রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকার এই বাসাটাও
মন্দ না তাই
সিজিলমিছিল চল্‌তি বাড়ির নক্‌শা আঁকছি
আমরা সবাই।' (ধর্‌না ঃ ছৌ- কাবুকির মুখোশ)

লক্ষণীয়, "তবে শোনো" শব্দবন্ধ। ঠিক এরকম সম্বোধনেই জীবনানন্দ একদা বাঙালি পাঠকদের শুনিয়েছিলেন আত্মঘাতী এক মানুষের কথা; অলোকরঞ্জন যেন বা সেই সম্বোধনকেই অন্য পথে মোড় ফেরালেন, সম্বোধনকে চালিত করলেন মৃত্যুবিরুদ্ধ সম্প্রসারণে। অশ্বত্থ গাছের কাছে দড়ি হাতে থেমে গিয়েছিল একটি মানুষ। অলোকরঞ্জন সেই থেমে-যাওয়া মানুষটিকে ফিরিয়ে এনে তাকে ছড়িয়ে দিলেন আবহমানের ভুবনে। তাঁর কবিতার মানুষটি হয়ে উঠলো 'যে-রাখাল দূরদেশী', তারই অভিন্ন সত্তা। দ্বিতীয় উদ্ধৃতির 'চল্‌তি বাড়ি' শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে রাখালসত্তাকে দূরদেশী করে তুলবার ভ্রাম্যমাণতা। মনে রাখা আবশ্যক, এই রাখালসত্তার সঙ্গে যৌবনবাউলসত্তার কোনো আভ্যন্তরীণ ফারাক নেই। ভ্রাম্যমাণের বিস্ময়ে কোনো স্থির একজায়গায় দাঁড়ানো বাড়ি-ঘর নেই, থাকতে পারে না। তার জন্য চলন্ত বাড়ি। 'চলন্ত' বলেই এই বাড়ির মধ্যে সবাই এসে বসতে পারে, মিলেমিশে থাকতে পারে, এমনকি এই 'চলতি বাড়ি'র মধ্যেই পাওয়া যাবে জীবনকুটের বিচিত্র মোটিফ, যার মধ্যে সংমিশ্রিত আদিমতা ও আধুনিকতা। এই 'চলন্ত বাড়ি'-র মধ্যেই একদা আদিম মানুষেরা চকমকি ঠুকে আগনের স্রষ্টা হয়েছিল। আবার এই 'চলন্ত বাড়ি'র মধ্যেই আধুনিক মানুষেরা জড়ো করেছে ট্রামের টিকিট, বাল্টিদের হাতে গুঁজে দিয়ে অর্জিত নিয়তির হাত থেকে রক্ষা পাবে বলে। একটু খুঁটিয়ে এই 'চলন্ত বাড়ি'-কে দেখলে বোঝা যায় এ হলো সেই মহাবিশ্ব, যার ভিতর রয়েছে :

'....সকলের অনন্যতা অচ্ছিন্নপ্রবাহ এক জীবনীচ্ছায়ে।'

এই হলো মানবের মূল পটভূমি, যেখানে আসা-যাওয়ার ক্রমিক তত্ত্বাবধানে একজন কবি জন্ম নেন, মরেন, আবার জন্ম নেন শুধু মহাবিশ্বমাতার চড়ানো রান্না চেটেপুটে খাবেন বলে। মা, মহাবিশ্বমা যখন (দ্রষ্টব্য-ফ্রেস্কো : ছৌঁ কাবুকির মুখোশ) বঁটির ওপর বসেন, নারকোল কোড়ান, তখন তো একই সঙ্গে আমরা দেখি মৃত্যুবাহিত বঁটির হিংস্রতাকে বশ

মানিয়ে মা মৃত্যুর নারকোল কোড়াতে কোড়াতে আসলে জীবনকেই সুস্বাদু, নারকোলফলের রসে আবিষ্কার করছেন। এই দৃশ্য অলোকরঞ্জন ছোটো কবিতার মিত পরিসরে এমনভাবে সেঁটে দিয়েছেন যে গভীর অভিনিবেশ ছাড়া লক্ষ্যই হয় না। আর আলিঙ্গনের মহোৎসবে ছড়াতে ছড়াতে অলোকরঞ্জন এভাবেই পৌঁছে যান চৌকাঠ পেরিয়ে, মা থেকে জল-ভূমণ্ডল আত্মার; গন্ধরাজ থেকে মেঘের দুয়ার খুলতে। এই যাত্রাপথেই তিনি টুক্ করে খুলে দেন মানুষের ভিতরকার পুষ্পপ্রদর্শনীকে। আর তখনি মানব অন্তরস্থিত ছাউনি থেকে বেজে ওঠে বোল—'দীপির দাং দীপির দাং দীপির দীপির দাং'। আমরা এই পর্যায় পর্যন্ত বলবো, তাঁর কবিতা, 'প্রসন্নতার বোধিবিন্দু। যদি আমরা তাঁর প্রথম কাব্যপদসঞ্চারকে এইভাবে বিন্যস্ত করি, যার দ্বারা কবিতার সেন্ট্রাল থিম-কে আয়ত্তসম্ভব :

প্রসন্নতা-নিসর্গের সঙ্গে আত্মার মিলনজ্ঞান

।

শিল্প

[নৈকট্য ও সংশয়]–[পরিবেষ্টনীর যন্ত্রণা]

জন্ম=[জীবনের তাগিদ ও আলো অন্ধকারে ছবি ফোটানোর আশ্লেষ অনভূতি]

মহাবিশ্বমা—মানবজন্মধারা

মৃত্যু=পুনঃপ্রবাহ

রক্তক্ষরণ = দূরদেশী রাখালসত্তা = [মহাবিশ্বের দর্শকসত্তার অংশ]

তাহলে হয়তো এতোক্ষণের আলোচিত কবিতার একটি নিজ বলয় সচেতন অভিপ্রায়েই প্রত্যক্ষ হবে। কারণ, এরই অন্তর্গত অলোকরঞ্জন।

২.

আকাশের রহস্য এবং মর্ত্যবিন্দুর জটিলতা—এই দুইয়ের টানাপোড়েনে কবিকে যে ক্ষতবিক্ষত মত্যসতৃষ্ণ হতেই হয়, এমন উচ্চারণ 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় অলোকরঞ্জন করেছিলেন। এই টানাপোড়েনের বক্তব্যস্থাপনে যখন অলোকরঞ্জনের বসবাস অনিবার্য হয়ে দেখা দিল, তখন থেকেই তাঁর কবিতা আমাদের কাছে রক্ত-ক্ষরণের টিলা হয়ে দাঁড়ালো। আর এখান থেকেই আবশ্যক, নতুন অলোকরঞ্জনের আবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথ কবিতার মাধ্যমে কবিতাশিল্পকে দু-ভাগ করে দিয়েছিলেন—বিচিত্রগামী এবং সর্বত্রগামী। কিন্তু এই দুইয়ের অন্ত্যর্থক অ্যাসি-মিলেশানে শিল্পগভীরে যে সম্ভাবনা দেখা দেয়, ক্রমে অলোকরঞ্জন সেই সম্ভাবনার পথ খুলে দিলেন। স্মরণযোগ্য, ১৯৮৮ সালে World Marxist Review পত্রিকায় গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ -এর সাক্ষাৎকার, পাশাপাশি যদি রাখা যায় 'ডানা' পত্রিকায় (মে, ১৯৯১) প্রেরিত অলোকরঞ্জনের চিঠি, তাহলেই বোঝা সম্ভব আত্মলীন হৃদয়ের চন্দ্রকলা কিভাবে অপসৃত হচ্ছে। অলোকরঞ্জনের সেই চিঠি-ই তুলে ধরি; প্রশ্নবিক্ষত, প্রশ্নদীর্ণ।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

গাল্‌ফ ওয়ারের দিকে তাকিয়ে 'যুদ্ধ' নামক শব্দটি তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়ায় 'দুই-সিলেব্‌লের অশ্লীলতম' শব্দ। লিখলেন:

"....আমরা যারা যুযুধান শক্তিগুলিকে নিরস্ত করতে পারিনি, শিল্পচর্যাকে নিরপেক্ষ অনুশীলনে পরিণত হতে দিয়েছি, তাদের জন্য বরাদ আজ এক অপরিহার্য অপরাধবোধ। আজকের কবিতা স্বয়ংসম্পূর্ণ থেকেও বিশ্বনিয়তির পরিমণ্ডলের জন্য যদি কোনো উদ্বৃত্ত উপলব্ধি পোষণ করতে না পারে, তাহলে আগামী প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে আমরা কোনোক্রমেই মার্জনা দাবি করতে পারব না।"

কিম্বা

"....আপাতত গাল্‌ফের যুদ্ধকালে ও পরবর্তী পর্যায়ে আমরা যারা কবিতা নামক মহাবিশ্বের দ্বারা আচ্ছন্ন থেকেই এই মরজীবন কাটিয়ে দিতে চাই, তাদের ভূমিকা নিয়েই স্বগত-যৌথ জল্পনা আমার। কোথাও কি কবিতার মহাবিশ্ব আজকের ইহজগৎটিকে স্পর্শ করেও নিজের কাছে সৎ হয়ে আছে? কবিতা নামক মহাবিশ্ব যদি মানুষের বোবা পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে বসে, তাহলেই কি সে তার জাত খোয়াবে? কবিতায় সমসময়ের ঘটনা স্পন্দ বেজে উঠলেই কি সে তার অভিধা থেকে বিচ্যুত হবে?"

এসব শধুমাত্র বিশ্ববীক্ষণের বোধে প্রশ্নধ্বনি নয়। ঘটমানতার মর্মে যে দার্শনিক বেদনা রক্তিমাভা পাচ্ছে, সেই বেদনাপ্রক্রিয়া থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নির্লিপ্ত নিজেকে সরিয়ে আনতে পারেননি বলে 'বলাকা'-র আত্মস্থ বিবেকে সমর্পিত হয়েছিলেন। স্নাত এবং চোখ খোলা একটি মানুষ, তার সাফারিং নয়, টরমেন্ট, কারণ 'সাফারিং' শব্দে সেই রক্তিমাভার ভীষণতা ধরা যায় না, তাই টরমেন্ট, যা অলোকরঞ্জনকে রূপান্তরিত করলো। তিনি সর্বত্র দেখলেন, মানুষে পরিণত 'authoritarian' চরিত্রে, যার অন্তরে-বাহিরে শ্রেণীজাত উদ্বেগ-আশঙ্কা, নিরাপত্তাবোধহীনতা, অবদমিত কামনা-বাসনার দংশন, তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে যুদ্ধে কিবা যুদ্ধের নির্লজ্জ প্রস্তুতি; যা থেকে ক্রমবর্ধমান একধরনের সামাজিক হতাশা। আত্মবলির এ-হেন বিশ্বের কেন্দ্রস্থ তরঙ্গে যুক্ত অলোকরঞ্জন তাই 'ওয়াটার শেড' পর্ব অতিক্রম ক'রে এসে দাঁড়ালেন একটি মহাবিশ্বের সত্যে। তাহলো 'instead of killing and dying in order to produce the being that we are not– we have to live and let live in order to create what we are' — ফলত অলোকরঞ্জনও উপলব্ধি করলেন 'Hate in the dust' এবং 'Always sees hope on earth'– এও কবির সময়-অনুযায়ী দীক্ষামন্ত্র বা জাগরণেরই একফালি চরে এসে দাঁড়ানো, তা নয়তো ভাঙনের মাঝখানে শিল্পেরও মৃত্যু অনিবার্য। এই রূপান্তরিত অলোকরঞ্জনের কাছে কবির দায়বদ্ধতা 'to warm men and to inspire them to struggle along the road which leads to greater happiness;' — কিন্তু

যেহেতু অলোকরঞ্জনের মন ও মানসিক স্তরান্তরে বিরাজমান প্রসন্ন ভাষার দীপ্তি, সেই হেতু তাঁর পক্ষে কণ্ঠস্বরকে খুব একটা উচ্চগ্রামে তুলে প্রত্যক্ষতার আক্রমণে শিল্পপ্রসন্নতাকে ব্যাহত করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিল্পবিবেক থেকে নির্গত ফগও যে অনেকসময় মারাত্মক মেজাজী হয়ে উঠে হৃদিপদ্মের ঝুঁটি টান মারে, তাও দেখা গেল তাঁর নিহিত ব্যঞ্জনাগর্ভ কবিতার অসামান্য নম্রতায়। ধ্বনিময় রোমকূপ থেকে উঠে এলো সেই স্ফূরণ, যাকে আমরা কেউ কেউ বাজারী ভাষায় বলে উঠতে পারি—উত্তরণের উজ্জ্বলতা। কিন্তু 'উত্তরণ' নামক কূটস্থানে বাঁধতে গেলেই অবিচার করা হবে কবির প্রতি, কবিতার প্রতিও। 'কবিতীর্থ' পত্রিকার ১৪০০ সাল পূর্তি সংখ্যায় রূপান্তরিত অলোকরঞ্জন আত্মপ্রকাশ করেছেন 'আগামী শতকের কবিতা ভাবনা' শীর্ষক রচনায়। এই রচনাটিতে ফুল-লতা-পাতা-বেষ্টিত বাংলা কবিতার প্রতি বিরক্তি এবং মানুষের মুখ উৎকীর্ণ হয় এমন কবিতার প্রতি আসক্তি প্রকাশে যে অকুণ্ঠিত অলোকরঞ্জন দেখা দেন, সেই দ্বিতীয় ভুবনের তিনি লিখে ফেলতে পারেন 'মরমী করাত" (১৯৯০), 'আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয়' (১৯৯১) এবং 'রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ' (১৯৯৩)। 'মরমী করাত' এবং 'আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয় এই কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের উৎসর্গপৃষ্ঠা একটি বৃহৎ অর্থে উদ্ভাসিত, যা অলোকরঞ্জনের নব্য চলমানতার বিশেষ মুদ্রা ধারণ করে আছে। 'মরমী করাত' উৎসর্গ করা হয়েছে বিনয় ও বিদ্রোহের প্রতীক অরুণ মিত্র-কে এবং 'আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয়' উৎসগ পৃষ্ঠায় মিলিত হয়েছে সমাজ কাঠামোর ভিন্ন বর্ণের মানুষেরা, অপরিচিত সেইসব নাম, যাদের একত্রে গেঁথে সমাজ-সম্প্রীতির গভীর স্বাদে আপ্লুত হলেন তিনি। উৎসর্গ -পৃষ্ঠার এই তিন জনের উপাধির ভিন্নতা এবং সমাজ প্রথার হাস্যকর নির্দেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো এর দ্বারা। তিনটি নাম যথাক্রমে ললিত মণ্ডল, গোলাম আবু জাকারিয়া এবং সুজিত চৌধরী। শ্রবণরত পাথরের ভূমিকায় 'মরমী করাত' কাব্যগ্রন্থে অলোকরঞ্জন আবির্ভূত হয়েছেন। 'শ্রণরত পাথর' এই বাক্যমালার তীব্র ব্যঞ্জনায় পাষাণসদৃশ অহল্যার রূপকআভাও যেন প্রতিভাত হলো। অভিশাপে পাষাণে পরিণত হয়ে ছিলেন অহল্যা। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই পাষাণপ্রতিমার কাছেই জীবনধর্মী নানা প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, জীবধাত্রী জননীর দুঃখশোক আনন্দবেদনার সঙ্গে অহল্যা নিজের সত্তাকে কেমনভাবে মিশিয়ে সুপ্ত হয়ে আছে, সে-কাহিনী। প্রাণ থেকে অ-প্রাণের গভীরে প্রবেশের ব্যাকুলতায় রবীন্দ্রনাথ আসলে বুঝতে চেয়েছিলেন, অহল্যা, যে-নাকি পাষাণ, সে কেমনভাবে জীবতরঙ্গের দোলায় নিজেকে মেলে ধরছে। কিন্তু অলোকরঞ্জন 'মরমী করাত' কাব্যগ্রন্থে নিজের সত্তাকেই অ-প্রাণলোকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে লিখলেন—'আসলে আমি শ্রবণরত পাথর আজ এই নিখিলে' (আজ, এই নিখিলে)। যেহেতু 'শ্রবণরত', তাই অ-প্রাণ পাথরের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হলো। শ্রবণরত পাথরভূমিকায় এসে অলোকরঞ্জন কি দেখলেন আজকের এই নিখিলে? মূল্যবোধের দারুণ অন্ধকার দেখতে দেখতেই কি তিনি পাথর হয়ে গিয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর 'মরমী করাত' ও 'আয়না যখন নিঃশ্বাস

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

নেয়' কাব্যদ্বয়ের বিভিন্ন স্তরীভূত কবিতায় বিন্যস্ত। 'মরমী করাত' কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখি, শ্রবণরত পাথর অলোকরঞ্জন ক্রমে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন একটি নির্বিশেষ কিশোর চরিত্রে। এই কিশোরের মধ্যে দিয়েই তৈরি হচ্ছে সৃষ্টিময় চঞ্চলতা ও সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টে 'রক্তকরবী' নাট্যপ্রতীকে আমরা কিশোরকে পেয়েছিলাম এবং যন্ত্ররাজার নিষ্পেষণে তার মৃত্যুও দেখেছিলাম । অলোকরঞ্জন-সৃষ্ট কিশোর মৃত্যুর বিরুদ্ধে তৈরি করছে 'কম্পোজিশন।' উদাহরণ দেওয়া যাক :

প্রথম কিশোর ।। তাহলে এটা তো মানতেই হবে
তিতুমীর ছিল ভিতরে-ভিতরে
শিল্পী, যে গড়ে, যে শধুই গড়ে,
শিল্পী যখন নামে বিপ্লবে
নিজেকে সে ভাঙে, অন্যকে গড়ে।

দ্বিতীয় কিশোর ।। জাতক বৃদ্ধের মতো এখনো অনেক তিতুমীর
জন্ম নেবে, এবং তাদের
ভুল আর বাসনার উত্তরাধিকার
চরিতার্থ করে শেষে একদিন সর্বাঙ্গীণ মুক্তির
সময়
মানুষকে মনোনীত করে নেবে, আগে দেবে
স্বাধীনতা, শেষে
মুক্তি যা পেরিয়ে যাবে দেশ আর কালের বলয়
এখন সেদিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করে যাওয়া,
এখন সেদিকে শুধু, লক্ষ্য রেখে কিছু পরাজয়
তীক্ষ্ণ রক্ষাকবচের মতো বয়ে চলা, রক্তে ভেসে
নিজেকে আরেকটু তৈরি করে নেওয়া।"

'বাঁশের কেল্লাটা চলছে'—এর ৪র্থ অংশের এই কিশোরসংগ্রামীর শুদ্ধতায় গৃহীত তিতুমীর, যিনি ভারতবর্ষের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের মিথ, সেই যোদ্ধার গভীর স্তর থেকেই কথা বলছে কিশোর-চরিত্র। 'মরমী করাত'-এর 'কম্পোজিশন' কবিতাটি এই চিন্তাস্তরের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যাবে যে এই কিশোর অভ্যন্তরে রয়েছে উড়ন্ত পায়রার ডানা, বনস্পতিময়তা, রোদ্দুরের গর্ভ', সৃষ্টিময় বীজ, ঊষাকিরণ। কারণ ঃ

'....প্রতিটি কিশোরের আছে প্রাকইতিহাস। তারা
কিরীট পরছে কিম্বা বিকীর্ণ হয়েছে
শিশিরে শিশিরে।' (কম্পোজিশন৯)

আর তাই, চক্রান্তের যাবতীয় লগ্নে দ্রুত জন্মান্তর ঘটে যায় কবিসত্তার। অলোকরঞ্জন

আহ্বান করেন সেই চঞ্চলতাকে। বলেন :

.....পড়ে থাক তোর
ট্রাক্টর

নেমে আয় তুই
এখানে

যেখানে অঝোর

বৃষ্টি' (কম্পোজিশন : ৪)

এই চেতনাসূত্রে পড়া আবশ্যক 'আয়না যখন নিশ্বাস নেয়'-এর নানা কবিতা। যেমন 'বলেছিলাম,' 'আয়ুকর,' 'নিরুত্তর শীতে,' 'বলার কিছু' 'প্রদর্শনী,' 'নেই ভালো খবর' ইত্যাদি সংহত চিন্তার কবিতা। অমিয় চক্রবর্তী বিমান বা এরোপ্লেন নামক যন্ত্রবাহনটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন উড়ন্ত সত্তার উর্ধ্বায়নের প্রতীক হিসেবে। অলোকরঞ্জন 'মরমী করাত'-এ প্রথমে আধুনিক বিশ্বের বিমান-ছিনতাইয়ের অনুষঙ্গ গ্রহণ করলেন এবং তারপর 'আয়না যখন নিশ্বাস নেয়' কাব্যগ্রন্থে দেখালেন বিমানের ধ্বংসাত্মক অ-মানবিক ভূমিকা। এইসব বোমারু বিমানগুলি ধ্বংস করে দিচ্ছে জ্যোতিগৃহের নন্দনতত্ত্বকে বা বিশ্বসংহতির ব্যাপকতাকে। এই কাব্যগ্রন্থে 'কিশোর'-চরিত্র ফিরে আসেনি, এলো 'দেবশিশু'-র ইঙ্গিতময়তা। বিশ্বআবর্জনার মধ্যে শিল্পশুদ্ধতার দেবশিশুকেই অন্বেষণ করলেন তিনি। তিনি দেখলেন চতুর্দিকে জীবন নামক 'পাণ্ডুর সমারোহ'। দেখলেন আমাদের সকলের 'পরিত্যক্ত আত্মপরিচয়'। লিখলেন:

'দাঁড়িয়ে থাকব : আমরা গৃহ, যদিও গৃহহারা।' (চট্টগ্রাম : ৯১)

চকিতে মনে পড়ে যায়, অমিয় চক্রবর্তীর প্রবাদপঙ্‌ক্তি 'আমারও নেই ঘর, আছে ঘরের দিকে যাওয়া,' কিম্বা 'তোমারও নেই ঘর আছে ঘরের দিকে যাওয়া।' অলোকরঞ্জন ঐতিহ্যের স্বীকরণে অন্য অর্থে উদ্ভাসিত হলেন। আধুনিক বিশ্বের নব মানুষই যে আজ উদ্বাস্তু, তা ধ্বনিত হলো তাঁর ভাষায়। 'আয়ুকর' (রক্তার্জিত আয়কর) নামক কবিতাটিই এই কাব্যগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ কবিতা। টানা গদ্যের প্রবহমানতা বজায় রেখে তিনি লিখলেন :

'.....আমরা দুজন মিলে বটের বিক্ষিপ্ত ঝুরিগুলি মানুষের অভিমুখে সঞ্চারিত করে দিই। ....যে সব বটের ঝুরি মগ্নচৈতন্যের শিখা জ্বেলে আছে মানুষকে স্বযাচিত হয়ে তাদের গরজ বুঝে নিতে হবে। ....মানুষের মাঝখানে এইভাবে ঝুরিগলি উঠে এলে অনেক আলোকতোয়া নদী বয়ে যাবে। ....যতক্ষণ সেই জ্যোতিগৃহ সম্পন্ন না হয় থেকে থেকে তার প্রস্তুতির কাজে যোগ দিতে হবে।'

আবহমানের ভুবনে দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘদিনের বটগাছের ঝুরিগুলোকে বোমারু বিমানের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চাইলেন অলোকরঞ্জন। কারণ, তা নয়তো তিনি কিভাবে উচ্চারণ

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

করবেন যে 'যুদ্ধ বলে শব্দটাই নেই।' এভাবেই, জীবন দর্শনের গাঢ়তা থেকে তিনি 'যুগ্মপুরাণ' কবিতায় বলেন :

—'তোমাকে উপহার দিলাম দৃপ্ত এক বিশ্বনাগরিকতা....'

তিনি দিলেন। এই বিশ্বনাগরিকতা পাবার পর প্রয়োজন যা, তা হলো শুদ্ধতার অনুশীলন, হৃদয়-শুদ্ধতার।

উৎস : অন্তরীপ, অক্টোবর ১৯৯৩

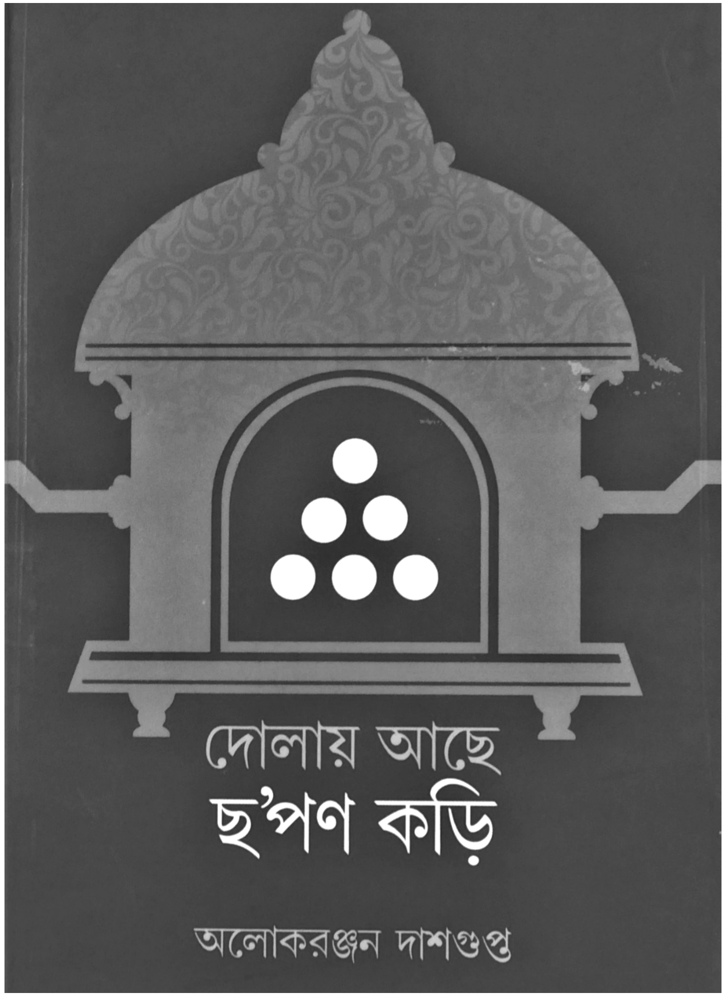

অলোকরঞ্জনের কবিতা : ইকোলজির নন্দনতত্ত্ব

ঋতম মুখোপাধ্যায়

"আমাদের চোখের ওপর এই যে নিসর্গ জেগে রয়েছে তার অনুধাবন এবং পরিচর্যাই আমাদের সাধনার বিষয় হিসেবে গণ্য হতে পারে।"

আলেকজান্ডার ফন হুমবোল্ট ২০ জানুয়ারি, ২০০৯ প্রেসিডেন্সি কলেজের জন্মদিনে প্রধান অতিথি হিসেবে ডিরোজিও হলে এসেছেন কবি অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কে না জানে তিনি আমাদের বাংলা বিভাগেরই উজ্জ্বল প্রাক্তনী। আমাকেও কবি বলেছেন ঐদিন ওখানে দেখা করতে। তারপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সংক্ষিপ্ত ভাষণে নানা কথার মধ্যে তিনি উচ্চারণ করলেন একটি রবীন্দ্রগানের ছিন্ন পক্তি 'এই-যে ধরণী চেয়ে বসে আছে ইহার মাধুরী বাড়াও হে'। যতদূর মনে পড়ে, বিপন্ন বসুন্ধরার প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা নির্দেশ করতেই তিনি এই আকুতি জানালেন রবীন্দ্র ভাবাসঙ্গে। চমকিত হলাম এই আশ্চর্য প্রয়োগে, পূজা পর্যায়ের 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' গানটি আগে বহুবার শুনেছি, কিন্তু সেই গানের একটি চরণ যে এইভাবে পরিবেশভাবুকতার চিহ্ন বহন করতে পারে, তা অলোকরঞ্জনের ঐ অনুপম বাচনেই প্রথম জানলাম। তারপর তাঁর সঙ্গে কলেজস্ট্রিটে কিছুক্ষণ সময় কাটানো, ট্যাক্সিতে তুলে দেওয়ার আগে অবধি অনর্গল ছবি তোলা এসব বিরল অভিজ্ঞতা তো ভোলার নয়। ঐ যে তাঁর পরিবেশবোধের আভাস পেলাম সেদিন, পরবর্তীকালে যখনই তাঁর 'সবুজ সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা' ও 'সবুজ দুর্ভাবনা' পড়েছি কিংবা বাবার প্রণোদনায় লিখেছি তার 'আয়ুকর' কবিতা নিয়ে; দেখেছি ইকোলজি নিয়ে তাঁর সচেতন ভাবনা গদ্যে ও কবিতায় নানাভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর পর্বে জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় পরিবেশচেতনার নিদর্শন আজকের ইকোক্রিটিকেরা খুঁজে দেখালেও অলোকরঞ্জনই উত্তর-রবীন্দ্রপর্বের গুরুত্বপূর্ণ এক পরিবেশভাবুক কবি। আর এই ইকোক্রিটিসিজমের বাংলা প্রতিশব্দ 'পরিবেশবীক্ষা' তিনিই আমাকে দুরভাষে তৈরি করে দিয়েছিলেন। কেবল নিসর্গনিবিড় কবিতা কিংবা বৃক্ষবন্দনা নয়, তাঁর কবিতায় পরিবেশভাবনার বৃত্তে মোবাইল টাওয়ার ও পাখিদের বিলুপ্তি যেমন আসে, তেমনই ইউরোপ ও ভারতের পরিবেশবাদী আন্দোলনের রূপরেখাও গদ্যে ধরে রাখেন তিনি। তাই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'গাছ কেটো না' নামের জনপ্রিয় পরিবেশ বাঁচানোর ছড়াটিকে মনে রেখেও অলোকরঞ্জনের সবুজ দুর্ভাবনার গভীরতা তথা ইকোজফিকে অগ্রাধিকার দিতেই হয়।

২.

প্রকৃতি আর মানুষের সখ্য হারিয়ে গেছে আজ। নগরায়ণের অতিমাত্রিক বিস্তার বাড়িয়ে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

তুলেছে পরিবেশ দূষণ। যে দূষণ আক্রান্ত করেছে মানুষকেও। সেই কবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর' কিন্তু 'তত্র কা পরিদেবনা কো বা প্রলাপ'! সাইবার যুগ আমাদের গতি দিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে আবেগের সূক্ষ্ম অনুভূতি। অথচ যে আদিপ্রাণ সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে যে অরণ্য প্রাণিকুলের বাঁচার অবলম্বন, যে সবুজের সমারোহ আমাদের সৃষ্টিকে প্রাণময় রাখে, নিরাপত্তা দেয় — সব ভুলে মানুষ তারই ধ্বংসলীলায় মেতেছে। সভ্যতার অগ্রগতির দোহাই দিয়ে এই যে সবুজের নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া তারই বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে 'গ্রিন রেভোলিউশন' তথা সবুজ বিপ্লব। সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে সচেতন সামাজিক কৰি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত জানাচ্ছে : 'প্রকৃতির সঙ্গে শান্তি স্থাপন শুধু তো কোনো মামুলি বুলি নয়। এমন কি কোনো বহিরঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বোঝাপড়ার তাগিদেও তার অভিষেক হতে পারে না। এক ও অভিন্ন আন্তর- আন্তর্জাতিক সর্বান্বয়েই তার উৎস। 'ইকলজি' শব্দটির পিছনে আছে গ্রীক 'ঐকোন' যার অর্থ 'বাড়ি'। এই বাড়িটা কার? সর্ব মানুষের। ভাবাসঙ্গে জেগে ওঠে 'ঈকোমেনে' শব্দটি, যার তাৎপর্য 'যাপিত পৃথ্বীলোক' মনে হয়। সংস্কৃত 'ঐকা' শব্দটিও এর সদৃশ। রবীন্দ্রনাথের আবেদন 'এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে ইহার মাধুরী বাড়াও হে' অনিবার্যতই এই অনুষঙ্গ আমাদের একাধারে আচ্ছন্ন এবং উদ্দীপিত করে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই বোধহয় সাহিত্যের ইকলজি এবং ইকলজির সাহিত্যের সর্বাগ্রণী প্রতিনিধি। কিন্তু আমাদের প্রসঙ্গ প্রেক্ষিতে যে কথাটা জোর দিয়ে বলা অবৈধ নয়, সেটা হল, রবীন্দ্রনাথই বোধহয় ভারতীয় ও ইউরোপীয় সবুজ জাগৃতির প্রেক্ষাপটে ও একমাত্র মানুষ যিনি প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিস্থাপনের ব্যাপারটা বুঝেছিলেন এবং আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন। (দ্র. সবুজ সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা / শেষ কথা কে বলবে)

সমতুল ভাবনার ছাপ পাওয়া যায় তাঁর 'সবুজ দুর্ভাবনা' (পুথিপট, ২০০০) রচনাতেও। কল্যাণী স্টেশনের ট্যাংকার থেকে পেট্রোলিয়াম গ্যাস ছড়িয়ে যাবার পর স্থানীয় মানুষের দুশ্চিন্তার সূত্রে এক তরুণ কবির কবিতা শোনেন তিনি। তারই প্রশ্নের উত্তরে ইউরোপে প্রকৃতির সংরক্ষণ নিয়ে সাহিত্যচিন্তার পরিচয় দিতে গিয়ে অলোকরঞ্জন জানান ওখানকার সবুজ আন্দোলনের চর্যার কথা : 'কবিতায় বা নাটকেই শুধু মোটিফ হিসেবেই নয়, ভরকেন্দ্র হিসেবেও ক্ষমতালুব্ধ এলিটের পরাক্রম থেকে নিসর্গকে অনাহত রাখবার অভিপ্রায় অব্যাহত হচ্ছে। প্রসঙ্গত এসেছে এরনেস্ট হেকেলের কথা, আলেকজাণ্ডার ফন হুমবোল্টের উচ্চারণও। এঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের মতোই মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির চূড়ান্ত সামঞ্জস্য চেয়েছেন। ইবসেন ও মিলারের নাটকের সূত্র টেনে অলোকরঞ্জন প্রকৃতি ও মানুষের নিয়তিমৈত্রী নিয়ে লেখা নতুন ইকোপোয়েট্রির কথা বলেন। রাজনীতিবিদ রুদি দুচে, ড্যানিয়েল কোল্ড-বেন্ডিল্ট, মার্গারেট নিম্শ্ এঁদের অবদানও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করেন তিনি। তাঁর চোখে প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার উৎকণ্ঠাই এইসব সমাজ ও সাহিত্যভাবনার ভরকেন্দ্র।

৩.

প্রতীচ্যের সাহিত্য সমালোচনাতত্ত্বের এক নতুন ধারা 'ইকোক্রিটিসিজম' বা 'গ্রিন স্টাডিজ, যার বাংলা রূপান্তর হতে পারে পরিবেশবীক্ষা বা সবুজ সমালোচনা। এই সমালোচনার কাজ হলো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সাহিত্যিক বয়ানের মধ্যে পরিবেশ বা প্রকৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির আন্তর সম্পর্কটিকে খুঁজে বের করা। সমালোচকের চোখে : "Ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical environment– takes an earthecentered approach to literary studies".

(from Introduction to The Ecocriticism Reader– Cheryl Glotfelty and Harold Fromm– editors)

এছাড়াও এখানে রয়েছে পরিবেশ দর্শন বা ডিপ ইকোলজি, মানবীনিসর্গবিদ্যা বা ইকোফেমিনিজম ইত্যাদি শাখাও। এই সবুজ-সমালোচনায় অগ্রসর হয়ে আমরা দেখি, 'আয়ুকর' কবিতাটিতে প্রকৃতির ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং কবির পরিবেশ সচেতনতা এখানে মূর্ত। প্রকৃতি নির্ভর ভারতের প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতি যে কোনো ভারতীয় কবিকে আচ্ছন্ন করে, উপনিষদ ও কালিদাসের সাহিত্যে যা ছড়িয়ে রয়েছে। জল, হাওয়া, আলো, মাটি আর আকাশ — পঞ্চভূতের সমাহার এই পৃথিবী। তাই ইকোক্রিটিক যে 'ইকোস্ফিয়ার'-এর কথা বলেন তা এই সংকীর্ণ মানববিশ্বের গণ্ডীকে প্রশস্ত করে প্রকৃতিমুখীও করে দেয়। অলোকরঞ্জন সমগ্র বিশ্বের সবুজ আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্ক জানেন। জার্মানিতে নিসর্গমরমিয়াবাদের নামে যে সবুজ-আন্দোলন চলেছিল, সেখানে আর্ত মানুষকে উচ্ছেদ করে মুমূর্ষ অরণ্যে প্রাণসঞ্চারের নেশা তাঁদের পেয়ে বসেছিল। আসলে প্রকৃতিকে মানুষের আত্মার আশ্রয় তথা সবুজ শুশ্রূষা-য় রবীন্দ্রনাথ থেকে অলোকরঞ্জন সকলেরই বিশ্বাস। প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্কটাকে আমরা যেন ভুলে না যাই। তাই কবি লেখেন :

'বাসযোগ্য করে তোলো এই নির্জনতা। আমিই প্রথম এসে অরণ্যকে ডাকনাম ধরে ডাকলাম, তুমিও আরেকদিক থেকে সমন্বয় নিয়ে এলে, আমরা দুজনে মিলে বটের বিক্ষিপ্ত ঝুরিগুলি মানুষের অভিমুখে সঞ্চারিত করে দিই। কোথায় তোমার অন্য সহকর্মিণীরা? তাদের এখনো আসতে দেরি হয় কেন? প্রথামতো করজোড়ে না ডাকলে তারা কি আসবে না? এভাবেই নিয়তিকে নির্ধারিত করে দিলে ভালো হয়। যেখানেই নিঃসঙ্গতা তাকে গড়েপিটে নিয়ে মানুষের উপযোগী করে তোলা, নিজেদের প্রাণ থেকে নিখিলের তহবিলে আয়ুকর দিয়ে যেতে থাকা। নিসর্গকে দীর্ঘায়ু করার জন্য অশ্বত্থের রক্তার্জিত আয়কর দিতে হয়।

আমাদের কাজ ততক্ষণে নানান মাপের ফ্রেম নিয়ে এসে এক-একটি বনানীবলয় ঘুরে

ঘুরে দেখা। আকাশে গোধুলিমেঘ হয়গ্রীব হয়ে দেখা দিল, তাকেও তোমার কিছু দিতে হবে। আনপড় পাখিদের মধ্যে কিছু বুক ট্রাস্ট খুলে দিয়ে এসো। মানুষকে মাঝখানে রেখে নয়। আকাশের পাশে কিংবা সান্দ্র গাছগাছালির ছায়াকোণে স্পর্শাতীত যেসব বটের ঝুরি মগ্নচৈতন্যের শিখা জ্বেলে আছে মানুষকে স্বযাচিত হয়ে তাদের গরজ বুঝে নিতে হবে। মানুষের মাঝখানে এইভাবে ঝুরিগুলি উঠে এলে অনেক আলোকতোয়া নদী বয়ে যাবে; বোধিসত্ত্ব সেই স্রোতে আমাদের শাশ্বত ঠিকানা — তবু দূর থেকে এসে নদীটির তদারকি করে শেষে নশ্বরতার কাছে ফিরে আশা দারুণ জরুরি। যতক্ষণ সেই জ্যোতিগৃহ সম্পন্ন না হয় থেকে থেকে তার প্রস্তুতির কাজে যোগ দিতে হবে। আমরা সে বাড়িটাকে অসমাপ্ত রেখে চলে যাব। যে-বাড়ি প্রস্তুয়মাণ তাকে ফেলে যেতে যেন পারি... (আয়ুকর / 'আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয়' কাব্য : ১৯৯১)

এই 'আয়ুকর' কবিতায় অলোকরঞ্জন ভারতীয় পরিবেশভাবনার উত্তরাধিকার বহন করেছেন। অনুভব করেন মানুষের রাক্ষুসে ক্ষুধার হাত থেকে অরণ্যকে বাঁচতে আজ আমাদের আয়ুকেই কর দিতে হবে। অভিমানী বৃক্ষদের কাছে আছে মানুষের হারানো ঠিকানা। এমনই কোনো বোধিবৃক্ষের তলে বসে ধ্যান করেই তো বুদ্ধ হয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। একালের বোধিসত্ত্ব কবি জানেন সে অনেক শতাব্দীর কাজ; তবু এক অসমাপ্ত জ্যোতিগৃহ নির্মাণের চেষ্টায় ব্রতী হতে চান তিনি। আমি আর তুমি : পুরুষ আর নারী — দ্বৈতশক্তির সম্মিলিত শ্রমেই গড়ে উঠতে পারে নতুন পৃথিবী। বাসযোগ্য করে তোলা যায় নির্জনতা, যে নির্জনতা প্রকৃতির অনাঘ্রাত কুমারীত্ব। অরণ্যকে ডাকনাম ধরে ডাকা এই নৈকট্যের দ্যোতক। প্রকৃতি আর মানুষকে পাশাপাশি আনতে চান কবি। কার্ল মার্ক্স তাঁর বিযুক্তির দর্শনে প্রকৃতি থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছিলেন। আধুনিক কবি সেই অনিবার্য বিযুক্তির নিরাময় চান সর্ব মানুষের মেলবন্ধন ঘটিয়ে। যে মেলবন্ধন সম্ভব প্রকৃতিকে বাসযোগ্য করে তোলার মধ্যে। মেঘ, হাওয়া আর পাখিদের রক্ষা করে তাদের সকলের সঙ্গে মানবিক বন্ধনের পথ প্রশস্ত করে তোলাতেই আমাদের মুক্তি। অরণ্যে অধিকার স্থাপন নয়, অরণ্যসম্পদ-কে নির্মম ভাবে দোহন করা নয়, 'আকাশের পাশে কিংবা সান্দ্র গাছগাছালির ছায়াকোণে স্পর্শাতীত যেসব বটের ঝুরি মগ্নচৈতন্যের শিখা জ্বেলে আছে মানুষকে স্বযাচিত হয়ে তাদের গরজ বুঝে নিতে হবে।'

বট আর অশ্বত্থ - দুটি দীর্ঘজীবী ও মাটির গভীরে শিকড়সারী গাছের প্রতিমা এখানে এনেছেন কবি। চেয়েছেন কর্মের উদ্যম, তথাকথিত অমরতা তাঁর কাম্য নয়। বরং মানুষের মধ্যে পরিবেশপ্রীতি গড়ে তোলাই তাঁর অন্বিষ্ট। বৌদ্ধদর্শনের অনবচ্ছিন্ন প্রাণের প্রবাহ আর বোধিলাভ-কে 'আলোকতোয়া নদী' ও 'মগ্নচৈতন্যের শিখা' এই দুই শব্দবন্ধে চিহ্নিত করেছেন তিনি। শাশ্বত ঠিকানা জেনেও নশ্বরতার কাছে ফিরে আসা জরুরি, কারণ কোনো সবুজ অমর্ত্যলোকের বাসিন্দা তিনি হতে চান না। তাঁর নিজস্ব ঘর একান্ত পার্থিব। কিন্তু যে কাজ

সকলের তাকে এক জন্মে সম্পন্ন করার অতিমানবিক প্রয়াসে কবি উৎসাহী নন। তিনি মনে করেন, ধরণীকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য যুগে যুগে নর-নারীর কাজ করে চলা জরুরি। এই কর্মক্লান্ত কাজের আহ্বানে মৃত্যুও আসতে পারে। তবু নানা প্রতিকূলতা পার হতে হতে এক জ্যোতিগৃহ প্রস্তুতির কাজে যোগ দিয়ে যেতে হবে। এভাবেই ক্ষমতার লিপ্সা থেকে দূরে সরে এসে সবুজ-শান্তির মানুষ-মানুষীরা পারেন নিসর্গ-কে নৈতিক চরিত্র দিতে। বিক্ষিপ্ত বৃক্ষরোপণের দায়স্বীকার মাত্র নয়, মানুষের আয়ুকে কর (Tax) দিয়েও প্রয়োজন প্রকৃতির আয়ুকে শাশ্বতী করে রাখা। 'আয়ুকর' গদ্যকবিতাতেও বাঙালি কবি সেই ভুবনতন্ত্রের নিহিত শক্তি, সুচেতনা আর পরিবেশবোধের নন্দনতত্ত্বকে প্রমূর্ত করেছেন। যে নন্দনতত্ত্ব সকলের বাসা রক্ষা করার আশ্বাস দেয়। ভুবনগ্রামের বাসিন্দা মানুষকে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে পৃথিবীতেই ধূলা-মাটির স্বর্গ গড়ে তোলার স্বপ্নে নন্দিত করে।

৪.

অলোকরঞ্জন জীবনানন্দকে নিয়ে অত্যন্ত মেধাবী একটি লিখেছিলেন, যার নাম 'জীবনানন্দ'(১৯৮৯,২০০৭,২০১৭)। সেখানে সম্ভবত তিনিই প্রথম জীবনান্দের 'ক্যাম্পে' কবিতায় 'ইকলজিনন্দিত সেই তন্ময় সংবেদ' খুঁজে পান। বলেন 'জীবনপ্রণালী' উপন্যাসের কথাও। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আলোচনাসূত্রে মানুষের প্রভুত্বপরায়ণ স্বেচ্ছাচারিতার যে কোনোই কদর নেই, তা তিনি বারবার মনে করান। আত্মঘাতী এই মানবসমাজে প্রকৃতিও শুশ্রূষা দিতে পারে না সবখানি। মানুষের সঙ্গে বুনো হাঁস বা শকুনের সাদৃশ্য টেনেছেন জীবনানন্দ, সেই অনুষঙ্গে অলোকরঞ্জনের মনে হয় :

'ইয়োরোপের মানুষ আজ বুঝতে পারছে যোগ্যতমের টিকে থাকার নাম দিয়ে মানুষ এপর্যন্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে যে সর্বগ্রাসী ব্যভিচার চালিয়ে এসেছে, তাকে মার্জনা করা চলে না, বুঝতে পেরেছে প্রকৃতি তথা সার্বিক প্রাণলোকের সঙ্গে এক স্তরে অন্বিত থেকে সহযোগিতা না করতে পারলে সৃষ্টিই তলিয়ে যাবে।' (২০১৭ : ২৭)

তাই তাঁর কবিতায় 'বুধুয়ার পাখি' কিংবা কোঙ্কনীভাষী পাখি যেমন প্রতীকায়িত হয়েছে, তেমনি তারা পরিবেশভাবনারও অঙ্গীভূত। মোবাইল টাওয়ারের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে কাক আর চড়ুইপাখিদের মরে যাওয়া নিয়ে ইকোলজি-সচেতন অলোকরঞ্জন-কে চিন্তিত হতে দেখি। 'গোলাপ এখন রাজনৈতিক' (২০০৮) কাব্যের 'কা কস্য পরিবেদনা' কবিতায় পড়ি,

কাক বলতে
থাকবে না আর
কিছুই।
তুই
তবুও চলভাষে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

কী-উল্লাসে

কাকে
কী যে বলিস, তা সে
বুঝতে পারে?

'মরণমুখী টাওয়ার'-এর নেতিবাচক প্রভাবে পরিবেশের ক্ষতির ছবি কবি এখানে তুলে ধরেন। 'আলো, আরো আলো' (২০০৯) কাব্যে এমন আরেকটি কবিতার নাম 'মোবাইল সমাচার' সেখানেও পাখিদের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত তুলে ধরেন কবি, শঙ্কিত হন অমিতাচারী মানুষদের জন্যও :

হাজার রকম
পাখি এখন
রূপকথার

উপকরণ;
একটু পরে
মানুষও হবে

উপ-পুরাণ
চলে-যাওয়ার
থাকবে শুধু

শ্মশান জুড়ে
আকাশপ্রমাণ
টাওয়ার টাওয়ার।

কখনো বা পাখিদের অমূর্ত হাতে ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে চান, প্রজাপতির ডানায় খোঁজেন বাঁচার ছন্দ। জীবনের অন্ত্যপর্বে এসে তাঁর যেসব কাব্যগুলি পড়ি, তার বেশ কয়েকটি নামকরণে ইকলজিময়তা উন্মোচিত হয়েছে বারবার : 'এখন নভোনীল আমার তহবিল', 'শুকতারার আলোয় পড়ি বিপর্যয়ের চিঠি,' 'তোমরা কী চাও শিউলি না টিউলিপ', 'ঝাউ-শিরীষের শীর্ষ সম্মেলনে', 'বাস্তুহারার পাহাড়তলি' ইত্যাদি। আবার বর্তমান ভারতের বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী বন্দনা শিবকেও করে নিয়েছেন তাঁর কবিতার বিষয়, যে বন্দনা এশিয়ার সবুজ বিপ্লব আরেক অগ্রদূতী, পরিবেশবান্ধব কৃষিবিদ্যা নিয়ে তাঁর উদ্যোগ ও উদ্যম অন্তহীন। কবিতাটি এইরকম :

'বন্দনা শিব কথা বলতে বলতে হাঁটছেন
আমি তাঁর পদক্ষেপে মুগ্ধ হয়ে দেখি বলে সব কথা মন দিয়ে

শুনি না। এক জায়গায় আপন মনে তিনি বললেন, আমাদের গ্রহের
এক ভবিষ্যৎ আছে তাকে মূর্ত করে তুলতে গেলে যন্ত্রসভ্যতার
সঙ্গে আপস চলবে না। আমাদের মধ্যে ছিল সোনারপুরের
এক শ্রীমন্ত কৃষাণ। তাকে তিনি বললেন: 'তিন ফসলী জমি
তোমার দেখে এসেছি খুব ভালো লেগেছে।'
নরেন্দ্রপুরের কাছে আয়োজন পোড়া জমি, তার দিকে তাকিয়ে তিনি
ভর্ৎসনা ছড়িয়ে ফের এগিয়ে গেলেন।
সামনে কি রয়েছে উৎস, অথবা বন্দনা শিব নিজেই উৎসার?'

(বন্দনা শিব হাঁটছেন, সে কি খুঁজে পেল ঈশ্বরকণা? ২০১২)

যন্ত্রযুগকে স্বীকার করে নিলেও তার দ্বারা সভ্যতাকে শাসিত হতে দিতে চান না অলোকরঞ্জন। ছায়াচ্ছন্ন গাছগাছালির মধ্যে দেখেন মানুষের মুখ, তাঁর কাছে নিসর্গ তাই মানুষের মতো কাঁদে। 'বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে দ্বিতীয় পর্যায়" কবিতায় বুদ্ধের জন্মদিনে 'স্বজাতীয়তার নাম দিয়ে পারমাণবিক বিস্ফোরণ' তাঁকে কান্না ও বিদ্রুপে একাকার করে তোলে। একটি ঝুমকোলতায় তাঁর আশা আর নিরাশার দোলাচলকে জিইয়ে রাখেন। নিসর্গ ও মানুষের যুগল সম্মিলন তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় এই অনুপম পঙ্ক্তিমালা :

এখন আমার হাত ছড়ে গেলে শিশির বেরোয়
আর সেই অবকাশে
দূর দূর থেকে আবালবৃদ্ধ এবং বনিতা
আমাকে দেখতে আসে।

অথচ তখনই রক্তগঙ্গা বয়ে যায় যত
অভুক্ত ঘাসে ঘাসে,
আর তক্ষুণি পৌরসংস্থা থেকে দমকল
আগুন নেভাতে আসে।

(নিসর্গ আজ মানুষের মতো কাঁদে, নিরীশ্বর পাখিদের উপাসনালয়ে)

শেষ কাব্যে বাস্তুহারাদের পাহাড়তলিতে এসে দাঁড়ান তিনি, সেখানে ধরিত্রী তাঁর কপালে বরণডালা ছুঁইয়ে দেয়। সমগ্র বাঁচার সজল পিছুটানে কবি বয়সকে তুচ্ছ করে রিফিউজি কলোনি ধরে উদীয়মান অস্তমান কবির মতো হেঁটে চলেন। 'ধূলোমাখা ঈথারের জামা' কাব্যে একদা তিনি গাছ কেটে ফোয়ারা তৈরি করার নাগরিক সৌন্দর্যায়ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন :

প্রাঙ্গণে আজ প্রেক্ষিতের বদল দেখি শিরীয় গাছটা হঠাৎ
ফোয়ারা হয়ে ওঠার মুখে থমকে দাঁড়ায় এবং ফোয়ারাটা

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

শিৰীয় হয়ে প্রাজ্ঞ ছায়া বিলোতে গিয়ে কাহিল হল কিছু।

(প্রাঙ্গণে যাব না, ধুলোমাখা ঈথারের জামা ১৯৯৯)

জীবনের অন্তিমে এসে তিনিই লক্ষ করেন গাছেরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, তবু তাঁর স্বর্ণিল আশাবাদ বিনষ্ট হয় না :

ঝাউশিরীষের শীর্ষ সম্মেলনে
আমারও যোগ দেবার কথা ছিল
গিয়ে দেখলাম একটিও গাছ নেই

বিকল্প এক কবি সম্মেলনে
সভ্যতার গর্হিত সেই পাপ
নিয়ে একটাও কথা হয়নি, শুধু

এক হাজার কবিতার স্পন্দনে

আচম্বিতে লক্ষ করা গেল
চোখের সামনে অমূর্ত গোলাপ

(বিভাব কবিতা : ঝাউ-শিরীষের শীর্ষ সম্মেলনে। ২০১৯)

ইকোলজির এই নান্দনিকতাই অলোকরঞ্জনের পরিবেশচেতনাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, মনে করি।

পদধ্বনিময় আরাধনা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতা

সুমন গুণ

‘অলংকৃত তীর’-এর কথা বলেছিলেন রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী। যে অপূরণীয় তির কবির আশ্রয়, কবির বর্ম। এই তিরবিদ্ধ মধুরতার অভিজ্ঞতা এতদিন ধরে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতা পড়ে বাংলা সাহিত্য পাঠকের সানন্দে অর্জিত হয়েছে। এই আনন্দের অনেকগুলো ভর আছে। স্পর্শ আছে। গ্রহণ আছে। সেই ভরগুলোর কয়েকটি আগে আগে চিনে না নিলে অলোকরঞ্জনের কবিতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হবার বিপুল সম্ভাবনা। আমরা অলোকরঞ্জনের পাঠকেরা এতদিন ধরে সেই ভরগুলো ধরে ধরে, বুঝে বা অগোচরে তাঁর কবিতা চিনতে চেয়েছি। সেসব যে একে অন্যের থেকে অবধারিতভাবে আলাদা, তা কিন্তু একেবারেই নয়। একটি ঘরানার মধ্যে আরেকটির স্পর্শ জড়ানো। একটির মায়ায় অন্যটির অরুণোদয় যুক্ত। অলোকরঞ্জনের কবিতায় সম্ভাবনার চিরসিংহাসন কোনোদিনই টোল খায়নি। যে আত্মকৌতুক কবিতার প্রাণ বলে মনে করেছেন আমাদের সময়ের মান্য কবিদের অনেকেই, অলোকরঞ্জনের কবিতায় তা সব সময় জাগ্রত থেকেছে। নিজের দিকে তাকিয়ে যখন কথা বলেছেন তিনি, তখন আমরা সেই কথার মধ্যে শুনতে পেয়েছি জনতার ধ্বনি।। দুর্যোগময় সময়ের কথা যখন বলেছেন, তখন তার মধ্যে মন্ত্রের স্তব্ধতা টের পেয়ে আচ্ছন্ন হয়েছি।

পাঠককে আচ্ছন্ন করা, অনেকেই বলেছেন, ভালো কবিতার লক্ষণ নয়। কাকে বলে ভালো কবিতা, কেনই বা আমরা এই নিদান মেনে কবিতা লিখব বা পড়ব, এইসব সংশয়ের কোনো সমাধান নেই। কোনোদিনই ছিল না। আর যত দিন যাচ্ছে, এইসব সংশয়ের একটি জন্ম দিচ্ছে আরেকটির, সেখান থেকে তৈরি হচ্ছে তৃতীয়টি এবং কবিতা এইসব বিদায়ী জটিলতার মাঝখানে একটি সরু ও সৃজনশীল পথ কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে।

আমরাও এই পথটিই অনুসরণ করে অলোকরঞ্জনের কবিতার বিস্তীর্ণ স্থাপত্য স্পর্শ করতে করতে চলব। সম্ভাবনার যে-আহ্বানের কথা বলেছি একটু আগে, অলোকরঞ্জনের কবিতা শুরু থেকেই তাকে গ্রহণ করেছে। ‘যৌবনবাউল’ বইয়ের ‘তিন দরোজায়’ কবিতার শেষ স্তবকটি এমনই এক সম্ভাবনাময় তোরণ রচনা করে আমাদের সামনে। “স্মৃতির তোরণে ভয়ানক ভিড়, আস্তে / ঘা দিলাম যেই অমনি সে বলল / এখনো পারব তোমাকে। ভালোবাসতে / কী জিনিস চাও?’ জানালাম ‘গতকল্য’”। শেষতম শব্দটি আমাদের স্তম্ভিত ক’রে, ক্রমশ এক বিষাদময় বিকেলের জানালার সামনে টেনে আনে। বাইরে আসন্ন গোধূলির আলো, বৃক্ষপত্রে অস্তসূর্যের স্পর্শ। অন্ধকার এখনও নামেনি, কিন্তু আলো-অন্ধকারের

মধ্যবর্তী এই ব্যাকুল অনিশ্চয়তাকে স্পর্শ করার বাসনায় কবিতাটি লেখা হয়েছে। এই অনিশ্চয়তাই এই কবিতার মধ্যে সম্ভাবনার সবগুলো দরজা খুলে রেখেছে। আমি যে দুয়ারটি নির্বাচন করলাম, তা পার হলেই যেন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে অস্ফুট কোনো পদধ্বনি, কোনো ঢাক। ‘গতকল্য’ শব্দটি কি কোনো প্রবাহকে চিরকালের মতো স্তব্ধ করে দিল। কবিতাটির শুরুতেই তো ছিল ‘আশার দুয়ারে কড়া নেড়ে নেড়ে’ প্রার্থনার আর্তি। সেই প্রার্থনার অসম্পূর্ণতার কথাই কি বলছে কবিতাটি? বা অচরিতার্থতার কথা? ‘গতকলা’ কথাটির মধ্যে ধ্রুব নিরাসক্তি আছে। যদিও, এই নিরাসক্তি যে ভেতরে ভেতরে ধারণ করে আছে নিরস্ত্র আত্মসমর্পণ, তা-ও আগের দুটি স্তবকের নাছোড় সাবলীলতা পার হয়ে আসা পাঠকের আগোচর থাকে না। এই যে বিদীর্ণ এক দোলাচলে পাঠককে স্তব্ধ করে দিলেন অলোকরঞ্জন এই কবিতায়, এটাই তাঁর কবিতার একটি প্রিয় ও অবধারিত ভর।

এই ভর অলোকরঞ্জনের সারা জীবনের কবিতাকে ধারণ করে আছে। এই ভরেরও আছে অনেক সতর্ক ডালপালা। গুপ্ত আন্দোলন। অস্পষ্ট সুবাতাস। ‘যৌবনবাউল’-এরই ‘গোধূলির শান্তিনিকেতন’ কবিতাটি পড়তে পড়তে এই সুবাতাস টের পাই আমরা। এই কবিতাতেও প্রশ্ন আছে। কথা আছে। নিরুচ্চার। অনিশ্চয়তা আছে। কিন্তু এই কবিতায় ‘কান্না’, প্রকাশ্যেই, ‘গান’ হয়ে ওঠে। গোধূলির সংলাপে কোপাইয়ের জলের চঞ্চলতা অলোকরঞ্জন এই কবিতায় গোপন রাখেননি। এমনকি ‘খুশির পালক’-এর মতো নিরুদ্‌বেগ উচ্চারণেও সায় ছিল তাঁর এই কবিতায়। কিন্তু প্রথম স্তবকে মেঘের পাহাড়তলির যে-শান্ত বিস্ময়, তারও আগে কবির প্রশ্নের নিরুত্তরে রাঙা নদীর যে বাঙ্ময় নীরবতা, তার কোনো সমাধান কিন্তু এই কবিতায় হয়নি। বলছিলাম না যে অনিশ্চয়তারও অনেক লুপ্ত ডালপালা নিয়ে খেলতে ভালোবাসেন অলোকরঞ্জন, এই কবিতাটি পড়লে তা বোঝা যায়।

বোঝা যায় ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’ বইয়ের নামহীন ভূমিকা কবিতাটিতেও। গোটা কবিতাটির মধ্যে যে আন্দোলন আছে, যে গরিমা আছে, যে ছন্দ আছে, তাকে শুধু প্রাত্যহিকতার অন্ন দিয়ে প্রথমার্ধে অল্প টোকা দিয়ে কবিতার একদম শেষ তিনটি শব্দে মুহূর্তে হরণ করে নিলেন। ‘মন্ত্রের ভিতরে আমি তোমাদের দারুণ আরামে রেখে মন্ত্রের বাহিরে / শীতের উঠোনে কাঁপব, ডেকো, ওকে ভয় করলে সুন্দরের দরকার পড়লে’। সুন্দরের দরকার পড়ে না যে দুনিয়ায় তাকে যে শুধু ‘নির্বস্তুক’ গরিমা দিয়েই ‘ধাপ্পা’ দিতে চান না তিনি, সে কথা পীড়িত কৈফিয়তের মতো আগে একবার বলেছেন বটে, কিন্তু সুন্দর আর দরকার — এই দুটো শব্দ পাশাপাশি বসানোর মধ্যে যে জেদ কাজ করছে, দুঃসাহস কাজ করছে, বিষাদ আর আত্মবিশ্বাসের সম্মোহন কাজ করছে, তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে পাঠককে বিমূঢ় করা, বিব্রত করা, হতচকিত করা। এই অতিজাগতিক লক্ষ্য পূরণে অলোকরঞ্জন যে শুধু সফল

তা-ই নয়, তাঁর কবিতা সংগ্রহের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই সাফল্যের শীর্ষ মুহূর্তের নির্মাণ।

এই নির্মাণের, আগেই লিখেছিলাম, অনেকগুলো তল আছে, অলিন্দ আছে, চবুতর আছে, গুপ্তকক্ষ আছে। চেনা মানুষের নাম উচ্চারণে, সংলাপে, ছন্দের সচেতন অপহরণে, পরস্পর বিরোধী দুটি শব্দের মধ্যবর্তী নৈঃশব্দ্যের উদ্‌বোধনে, এমনকি ঐশ্বরিক সান্নিধ্যের নানা মৌলিক খেলায় আমাদের যুক্ত করেছেন অলোকরঞ্জন। খেলায় যে আমাদের টানছেন তিনি সেটা কখনওই স্পষ্ট করে বুঝতে দেননি। এমনকি কখনো কখনো প্রতারক অন্যমনস্কতার অর্চনা করেছেন। সদা সকৌতুক, মেধাবী, দীপ্ত, উৎসুক অলোকরঞ্জনের মুখটি তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে আমি সবসময় দেখতে পাই। 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'রই 'দুর্বলতা' কবিতাটিতে যে-মধুর অতিশয়োক্তি অক্ষতই রেখে দিলেন তিনি, তাকে নীরবতা দিয়ে বরণ না করে আমাদের উপায় থাকে না। এই নীরবতার ভাষা রচনা করে দেন অলোক নিজেই। রেললাইনের নির্দিষ্ট 'ওপার'-এর উল্লেখে। ছাউনি'র প্রথম, দ্বিতীয় এবং গগনচুম্বী তৃতীয়টির স্পষ্ট বর্ণনায়। 'হিড়হিড়' করে 'আমন্ত্রণ'-এর শুভ বিরোধাভাসে। এই কবিতাটি অলোকরঞ্জনের সেই সব সীমিত লেখাগুলির একটি, যা পাঠকের মুখের ওপর শেষতম দরজাটিও বন্ধ করে রাখে। দরজার ওপাশেই আলোর অধিক সেই আঁধার সম্ভাবনায় পূর্ণ। বাইরে দাঁড়িয়েই পাঠক শুনতে পাবেন, মাঝে মাঝে ভেতরের উপদ্রুত বার্তা আর গুঞ্জন। মৃদু বাদ্য ও লয়। চকিত ব্যঞ্জনধ্বনি। কবিতাটি পড়ার পর হিরন্ময় এক অপেক্ষা আর অস্থিরতাই, শেষপর্যন্ত পাঠকের অর্জন হোক- এমনই যেন দাবি কবির।

এই দাবি আমি টের পেয়েছিলাম তাঁর আরেকটি কবিতায়। 'জবাবদিহির টিলা' বইরের দ্বিতীয় পর্বের নামহীন সূচনা কবিতা। ছোটো কবিতা, শেষ লাইনের আগে পর্যন্ত অতিলৌকিক কোনো প্ররোচনা রাখেননি অলোকরঞ্জন। কিন্তু শেষ লাইনে এমন সাংঘাতিক বাঁক নিল কবিতাটি যে আমি এখনও পর্যন্ত এই ঘূর্ণি মুহূর্তে হতচকিত, স্তব্ধ, পরাস্ত হবার অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত হতে পারিনি। অন্য আরও নানা কাজ আছে এই কবিতায় সেগুলোও কম মারাত্মক নয়। 'গণিকা রাত্রি দাপট বাড়ছে ক্রমশ, দিন-দিন / রাত-রাত'—দ্বিতীয় এই লাইনটিতে 'দাপট'-এর অতিরিক্ত মাত্রা আমরা যে অগ্রাহ্য করতে পারছি, তার একটি সরল এবং আর একটি মস্ত কারণ আছে। সরল কারণটি উহ্য রয়েছে 'রাত্রির' শেষ আর 'দাপট'-এর প্রথম অক্ষরের যুক্ত উচ্চারণে এবং 'দাপট'-এর স্বরধ্বনিহীন শেষ অক্ষরের লঘুতায়। কিন্তু আসল কারণটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বেনিয়া সময়ের দাপট যে বাড়ছে, তার বিরুদ্ধে কবি আমাদের প্রস্তুত করে তুলছেন এই লাইনটিতে একই সঙ্গে। এই প্রস্তুতির একটি দান অতিরিক্ত মাত্রাটি উপেক্ষা। সচেতন ছন্দ বিভ্রাটের সমর্থন অলোকরঞ্জন আদায় করলেন

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

বক্তব্য থেকে। বা এমনও বলা যায়, কথাকে সামর্থ্য দিতেই ছন্দের মধ্যে জরুরি দোলাচল তৈরি করলেন তিনি।

এই কবিতাটির প্রথমাংশ বুনুয়েল-এর The Exterminating Angel ছবিটির কথা মনে পড়ায়। বিত্তবান একদঙ্গল মানুষ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন এক বন্ধুর বাড়িতে, নৈশ সমারোহে। হুল্লোড়ময় কিছুক্ষণ পর তাঁরা টের পেলেন কেউই আর ফিরতে পারছেন না। ফেরার উদ্যোগ নিচ্ছেন কেউ, কেউ এগিয়ে যাচ্ছেনও দরজার দিকে, কিন্তু রহস্যময় কোনো কারণে আবার দলে এসে ভিড়ছেন, বেরোতে পারছেন না। গোটা ছবিটি জুড়ে তারপর অসহনীয় এক পরিবেশে আমাদের ভেতরের সব বদ, অশিষ্ট, আত্মরতিময় প্রবণতা ডালপালা মেলে দিল। এই অশিষ্টতার বিপক্ষে যে-তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ বুনুয়েল গোটা ছবিতে ঘনিয়ে রেখেছেন, অলোকরঞ্জনের এই কবিতার কটাক্ষ সেই ঘরানারই।

এই পর্যন্ত তো ঠিকই ছিল। কবিতায় বাণী আর বিন্যাসের সম্পর্ক নিছক পুনর্মুদ্রিত যে হয় না অলোকরঞ্জনের কবিতায়, সে তো আমরা জানিই। কথা আর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অতিরিক্ত স্তর রচনা না করে তিনি স্বস্তি পান না। ছন্দ আর ভাবনার শব্দ আর বিরতির, ধ্বনি আর গন্তব্যের মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক চলাচল তাঁর কবিতার অন্যতম ভর, সে কথা আমরা আগেও বলেছি। যত দিন গেছে, এই ধরনটি তাঁর কবিতাকে আরও উদ্দীপক করেছে, আরও আলোকময় করেছে। কিন্তু এই কবিতাটির শেষ লাইনে তিনি যে কাণ্ডটি করলেন, তার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। শেষের এই লাইনটির সূত্র শুরু হয়েছে তার তিন লাইন আগে। এইভাবে প্রসঙ্গটি শুরু করছেন তিনি 'যদি বা আমার আলিঙ্গন/ বয়সোপযোগী নম্র হয়ে আসে, দৃষ্টির কিরণ/ তোমাকে অবজ্ঞা করে আসর জমায় স্বনির্বাসে''। নিজের স্থগিত ও অপরপ্রবণ একটি অবস্থার আশঙ্কা করছেন তিনি এইখানে। কিন্তু একই ঘরানায় তারপরেই বললেন, 'আমার কবিতা যদি আমার জীবন গ্রাস করে'। 'কবিতা' শব্দটি যে-বিপুল প্রতারণায় আমাকে পথভ্রষ্ট করল, তার আঘাত আমি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। জীবন যদি কবিতার বশ হয়, তার অধীন হয়, তাহলে তা আমাকে উদ্‌বেগের সরণিতে কেন শরণার্থী করবে সেটা বুঝতে বুঝতেই এই কবিতার সঙ্গে এতদিন ঘর করা হয়ে গেল আমার।

অলোকরঞ্জনের কবিতার নানা স্পর্শের একটি, লিখেছিলাম, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্য। এক মুগ্ধ অস্থিরতাই তাঁর কবিতায় ঈশ্বরের নশ্বর ছায়া টেনে এনেছে। তাঁর অনেকটাই অনুজ রণজিৎ দাশের কবিতাতেও, মনে পড়ল, ঈশ্বর একটি আচ্ছন্ন কিন্তু অবধারিত সূত্র, জীবনের অসম্ভব রহস্যময়তা বুঝতে এই সূত্রটিকে না ধরে উপায় নেই। ঈশ্বরের আসন তাঁর কাছে বীজগণিতের 'এক্স'-এর মতো, এই কথাটি বলতে পছন্দ করেন রণজিৎ দাশ।

কিন্তু অলোকরঞ্জন এতটা গাণিতিক মাধুর্যে ঈশ্বরকে পাননি, স্পষ্ট আর পরিসরময় আনুগত্যই ঈশ্বরভাবনার বৈশিষ্ট্য, যা 'যৌবনবাউল'-এর সেই আরাধনাময় কবিতায় সবচেয়ে উদ্যমী ভাষায় ধরা পড়েছে 'বন্ধুরা বিদ্রুপ করে তোমায় বিশ্বাস করি বলে;/তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হলে / আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো"? এতটা সরলভাবে যখন শুরু করেন অলোকরঞ্জন, তখন বোঝা যায়, ঘোরতর এক ঘূর্ণি অবশ্যই অপেক্ষা করছে কোথাও। আমাদের এই বাসনা চরিতার্থ হয় কবিতাটির একেবারে শেষ স্তবকে। 'এখনো তোমাকে যদি বাহুডোরে বুকের ভিতরে / না পাই, আমাকে যদি অবিশ্বাসে দুই পায়ে দলে / চলে যাও, তাহলে ঈশ্বর / বন্ধুরা তোমায় যেন ব্যঙ্গ করে নিরীশ্বর বলে'। যে-সচেতন নৈঃশব্দ্যে বিশ্বাসের আশ্রয় সরে গেল, কবি নয় ঈশ্বর স্বয়ং লক্ষ্য হলেন 'নিরীশ্বর' অভিধার, সেই সতর্ক, সচেতন, তীক্ষ্ণ আর প্রশ্নময় মননের সান্নিধ্য অলোকরঞ্জনের কবিতাকে সারাজীবন নিয়ন্ত্রিত করেছে।

'Poetry' পত্রিকায় 'A Few Don't নামে তাঁর সেই সুখ্যাত আদর্শলিপিতে (যার সোৎসাহ অনুসরণ করে এখানেও বুদ্ধদেব বসুরা বেশ বিস্তারিত নিয়মাবলি তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সেভাবে কাজে লাগাতে পারেননি) পাউন্ড লিখেছিলেন, "An Image is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time'. মেধা ও আবেগের যৌথ উদ্যমে চিত্রকল্প রচনার অতুলনীয় ক্ষমতা ছিল অলোকরঞ্জনের। কোন কবিতা ছেড়ে কোনটার কথা বলব। আপাতত 'রক্তাক্ত ঝরোখা'র 'বাজি' কবিতাটিই ধরি। একদমই ছোট্ট কবিতা 'শান্ত একটা লণ্ঠন দাও। তাঁর নীচে বানাব / অশান্ত চরিত্র। / দশ-বারোজন শয়তান দাও, গড়ব অমিতাভ / সংঘমিত্র / নারী নিবাসের মেট্রন দাও,/ 'স্পর্শভীরু নিশিগন্ধাও,/ এক মুহূর্তে গড়ব দুঃসাহসিক তথ্যচিত্র"। মৌলিক শুধু চিত্রকল্পই নয়, ভঙ্গিমাটিও। 'স্পর্শভীরু নিশিগন্ধা'য় যে-'emotion', আবেগ, স্বীকার আর সঞ্চয়, তা পরের লাইনটির উদ্যমময় উচ্চারণে সমে ফিরেছে। সমে ফেরার এই স্বরলিপি রচনা করেছে অশান্ত চরিত্র আর অমিতাভ সংঘমিত্রও। সবটা মিলিয়ে এবার এক intellectual complexity এক নিমেষে অর্জিত হয়েছে।

বললাম বটে সমে ফেরা, কিন্তু অলোকরঞ্জনের কোনো কবিতাই গোল হয়ে সমে ফিরে আসে না। পূর্বানুবৃত্তিও করে না। কবির সচেতন অনিচ্ছে এখানে জাগ্রত থাকে। বরং আমার বলা উচিত ছিল, 'দুঃসাহসিক তথ্যচিত্রে'র রূপকে নিশিগন্ধার স্পর্শ আরও উসকে দিয়েছেন তিনি। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর 'চরাচর'-এ পাখিপ্রবণ চরিত্রটি অনুভূতির লালন ও কল্পনায় রচনা করে চলে শিল্পেরই অন্য এক প্রকরণ। তার মাধ্যম পাখি। পাখির প্রতি সর্বস্ব মমতায়, স্নেহে স্বপ্নে আলোড়নে সে অন্য সবার থেকে বিশিষ্ট। একজন কবি যেভাবে একক, সেও তাই। ছবির গুরুতেই সমুদ্রবিস্তারে অসংখ্য ডানা আর এই ছন্দের সঙ্গে মিল দিতেই যেন,

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

তারপরেই, প্রস্তুতির মতো একটি খাঁচা, ভেতরে একই রকম চঞ্চল, উচ্ছ্বসিত পাখির গুচ্ছ এবং একটি অবধারিত হাত সন্তর্পণ মমতায় একটার একটা পাখিকে মুক্ত করে, পরের দৃশ্যবিন্যাসে সেই হাত মুক্ত পাখিগুলিকে ভোর-হয়ে-আসা আকাশে ভাসিয়ে দেয়। প্রসঙ্গটি এবং সেই সঙ্গে দৃশ্যের অভ্যন্তরী সম্পূর্ণতার আরাধনা মিলটিও, সম্পূর্ণ হয়। এই সম্পূর্ণতার আরাধনা অলোকরঞ্জন করেননি কখনও। আমরা যারা 'এক ভাষায় কথা বলি, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর লেখালেখির বিস্তর স্তরান্তর তাদের বিমূঢ় করে দেয়। একই সঙ্গে আচ্ছন্ন আর প্রতিহত করে তাঁর লেখা। তাঁর প্রতিটি কবিতা রহস্য আর বিপ্রতীপতায় ভরা। একটা বয়ানের ভেতরে ঢুকে ছিন্নভিন্ন আরেকটা বয়ান। ঠিক তাঁর অনতিপ্রচারিত গল্পের মতোই 'মেয়েটি তার শরীরভরা ভারতবর্ষ মেলে দিল চেখভের পায়ের কাছে, মাথা নীচু করে বলল, 'বলো, আর কী চাও? দোভাষীটি সেই ভারতবর্ষে কনুই ছুঁইয়ো শেখভকে বলল, 'ইনি জিজ্ঞেস করছেন আজ রাতে কখন কোথায় ওর সঙ্গে আপনার দেখা হতে পারে'। শেখভ উত্তর করলেন, 'আজ রাতে আর সময় নেই। আমাকে ফিরতেই হবে।। ফেরার অন্য নাম মৃত্যু।'

ঠিক এভাবেই অনেকগুলি পরত রচনা করেন তিনি কবিতাতেও। এই স্তরান্তর শুধু বিষয়ের নয়, বর্ণনারও। খুব নিরীহ সূত্রপাত থেকে এগোতে এগোতে নির্বিকার পাঠক হঠাৎই বুঝে ফেলেন, কী নিপুণ বিপথেই না তিনি ভ্রষ্ট হয়েছেন। কলাচর্চায় আধুনিকতম তত্ত্বভঙ্গিমায় যাঁরা উৎসাহী, তাঁদের কাছে অলোকরঞ্জনের লেখা বিপুলভাবে লোভনীয় বলেই আমার মনে হয়। রঁদ্যা সম্পর্কে রিলকের সেই বিস্ময়ভারাতুর কথা আছে এই মর্মে: এই ঐশ্বর্যময় শিল্পী নিজের ভেতরেই সংরক্ষণ করছেন অন্ধকার আর নীলিমা নিজেই তিনি এক অরণ্য, যার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মুগ্ধ জলধারা। অলোকরঞ্জনের রচনা সমগ্রের দিকে তাকিয়ে আমার কথাটা মনে পড়ে। নানা মাত্রার, চরিত্রের, ঘটনার আয়োজনের বিন্যাসে তৈরি হয়ে উঠেছে তাঁর সমগ্র নির্মাণ। এমন অবশ্যই নয় যে প্রতিটি রচনার মধ্যে প্রতিটি প্রসঙ্গের মধ্যে প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্ট না অপরিহার্য যোগাযোগ আছে। কিন্তু আমার বরাবরই মনে হয়েছে, হয়তো একটা সূত্র ভেতরে ভেতরে কাজ করেছে একটি প্রসঙ্গের সঙ্গে আগে বা পরের অন্য কোনো অনুভবের সম্পর্ক ধরিয়ে দিয়েছেন লেখক নিজেই একটা বা দুটো বাক্যে, কিন্তু সেগুলো না টের পেলেও আলাদা ভাবে এবং সমগ্র ভাবেও তাঁর অখণ্ড সূত্রের মূল ভর টোল খায় না। মনে হয়, বিভিন্ন চরিত্র আর ঘটনার আর অনুভবের স্তর বুনতে বুনতে কবি আমাদের জীবনের যে সমাধানহীনতা, তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছে। জীবন তার নিজস্ব গতিতে একটি স্বাধীন অর্থ রচনা করে, জীবনের নানা ঘটনা আর নানা আয়োজনের স্তর পরপর দেখাতে দেখাতে এই বিশ্ব মুহূর্তের আদলে আলো ফেলাই অলোকরঞ্জনের লক্ষ্য বলে আমার মনে হয়েছে। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি

সম্পর্ক, প্রতিটি বর্ণনা আমাদের এই যে ভুবনজোড়া জীবন প্রবাহ তার নিশ্চিন্ত অংশ হয়ে ধরা দিয়েছে। সেই জন্যই কখনো কখনো একটি অস্পষ্ট উপলব্ধির রহস্য তৈরি করে তাকে বহুমাত্রিক সংকট হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন তিনি। এমন অনেক মহৎ ছবির কথা আমরা জানি যে ছবিগুলোর ভর আসলে এক একটা দৃশ্যের এক একটা অংশের মৌলিকতায়। পুরোটা মিলিয়ে যেমন একটি গঠন তেমনি সেই গড়নের ভেতরে ভেতরে যে বিচ্ছিন্ন শৈলী তারও আলাদা মানে থাকে। যেমন গোদারের ছবি। অবশ্য এটাও বলা দরকার যে, প্রায়ই এমন হয়েছে যখন নিটোল একটি ছবির ভেতরের অংশগুলোও অর্থময় হয়ে উঠেছে। অলোকরঞ্জনের কবিতা প্রথম ঘরানাটিকে বেশি গ্রহণ করেছে।

সারা পৃথিবীতেই সময় ও সমাজপ্রবণ কবিতার একটি সবল ধারা আছে। কখনও সরাসরি, কখনও অন্য নানা প্রবণতাকে আশ্রয় করে সময় আর সমাজের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের কথা দায়িত্বের সঙ্গে জানিয়ে দেবার ঝোঁকে রচিত হয়েছে বহু উজ্জ্বল কবিতা। বাংলায় এই ঝোঁক প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল চল্লিশের দশকে, যখন দেশে-বিদেশে তীব্র আর উদ্ধত অনেকগুলি ঘটনার ধাক্কা মুহুর্মুহু এসে পড়েছিল আমাদের মধ্যে। তার আগে বিষ্ণু দে প্রত্যক্ষভাবে আর তাঁর সতীর্থ কবিরা তুলনায় নিচু স্বরে, নিজেদের মতো করে চারপাশের ঝড়ের কথা ধরে রেখেছিলেন কবিতায়। জীবনানন্দের 'বেলা অবেলা কালবেলা'র কথা বিশেষভাবে মনে পড়বে। 'অন্ধ হলে যে প্রলয় বন্ধ থাকে না', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সে কথা আমাদের খরতরভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। তবে চল্লিশের দশকে এই আওয়াজ বাংলা কবিতার প্রধান ধরন হয়ে উঠল। যে সময়ে লেখালেখি শুরু করেছিলেন এই কবিরা, তার দহন থেকে আজও আমাদের ক্ষত তৈরি হয়। পুঁজ। দুর্গন্ধে ভরে ওঠে দেশ। সারা পৃথিবীতে অমানবিকতার উগ্রতা যেমন ছিল, পাশাপাশি তার সংঘবদ্ধ বিরোধিতার আন্তর্জাতিক এক জাগরণ শুরু হয়েছিল। যে কবিরা সেই আত্মঘাতী সময়ের মোকাবিলা করেছেন সরাসরি, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, নিজেদের লেখায় প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে ধরে রেখেছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা, আমরা তাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী, একথা আমার বারবার মনে হয়। সুকান্ত ভট্টাচার্য, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র সহ অনেকের লেখা প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে। মনে পড়বে তাঁদের পরের প্রজন্মে শঙ্খ ঘোষ, মণিভূষণ ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকের কথাও। অলোকরঞ্জনের নাম এই প্রসঙ্গে। আমাদের মনে পড়ে না। না পড়ার অনেক অভ্যন্তরীণ কারণ তো আছেই, কিন্তু অলোকরঞ্জনের নিজের ভাষাও এই বিচ্ছিন্নতাকে ইন্ধন দিয়েছে। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন। 'ধনুরি দিয়েছে টংকার' বা 'নিজস্ব এই মাতৃভাষায়' পর্বেই 'আপন হতে বাহির ও তা বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর আর্তি' জেগে উঠেছিল তাঁর কবিতায়। স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন

উপসাগরীয় যুদ্ধের কথা। তাঁর পর থেকেই, লিখেছিলেন তিনি, 'জগৎজোড়া শরণার্থীদের সঙ্গেই আমি তখন থেকে অষ্টপ্রহর সম্পৃক্ত হয়ে আছি'।

খুব সম্প্রতি শঙ্খ ঘোষ একটি রচনায় অলোকরঞ্জনের এই পর্বভাগ প্রসঙ্গে সঙ্গত সংশয় জানিয়েছেন। শুরু থেকেই যে অলোকরঞ্জনের কবিতা সময়কে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছে, উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন তা-ও। এই লেখার শুরুতে 'নিষিদ্ধ কোজাগরী' বইয়ের নামহীন ভূমিকা কবিতাটি স্পর্শ করেও আমরা তা টের পেয়েছিলাম। সারা পৃথিবীতেই প্রত্যক্ষ ও সরাসরি কথা বলার এক আগ্নেয় ঐতিহ্য আছে। সহজ কথা সরাসরি বলার মধ্যে অনেক ঝুঁকি থাকে, হঠকারিতার সম্ভাবনা থাকে। কবিতায় সোজাসাপটা কথা বলা হলেই তাকে খাটো মনে করার কোনো কারণ নেই। সারা পৃথিবীতেই সহজে লক্ষ্যভেদী বহু কবিতা লেখা হয়েছে, বাংলায় অনেকেই এই ধরনের কবিতাকে দাপটের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এত সহজে বলবার কথাটি তাঁরা জানাতে পারেন যে পাঠক মুহূর্তে আক্রান্ত হন, নানা জায়গা ঘুরে বিভ্রান্ত ও বিরক্ত হতে হতে গন্তব্য পৌঁছোতে হয় না। আমাদের সময়ের নানা বিপন্ন ও বিমূঢ় অবস্থার শরিক তাঁরা। যে পীড়িত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিনযাপন করছেন। তাঁরা, তাঁদের কবিতা সেই স্পর্শ এড়াতে পারেনি, এড়াতে চায়ওনি। কেনই বা চাইবে? কবি তো তাঁর সময়ের কাছে সহজাতভাবেই দায়বদ্ধ। সেই দায় কেউ স্বীকার করেন, কেউ করেন না। যাঁরা করেন না, তাঁদের কবিতাতেও সময়ের সঞ্চার থাকে, একটু গোপনে, কখনও সবান্ধব সংকেতে। তাঁরা সময়ের ধ্রুপদি রূপকার, তাঁদের কবিতাও ভাষাকে সামর্থ্য দেয়। যে কোনো ভাষা-সাহিত্যের শীর্ষবিন্দুগুলির বেশ কয়েকটি তাঁদেরও নির্মাণ। আর যে কবিরা সময়কে এগিয়ে এসে টেনে নেন, তাঁদের কবিতার সঙ্গে প্রচারিত সখ্য তৈরি করেন, তাঁরাও, নিজগুণেই, পাঠকের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম অর্জন করেন। অলোকরঞ্জন, লেখা বাহুল্য, মিশ্র ঘরানার কবি।

চেনা নাম, ঘটনা, এমনকি রটনাও এমন নির্দোষ উত্তেজনায় আলোকরঞ্জন ব্যবহার করেন কবিতায় যে পাঠক প্রথমে সানন্দে ঝুঁকে পড়েন, কিন্তু তার পরেই টের পান যে সুদূর প্রসারী প্রস্তুতির পদচারণা ছাড়া সেই শীর্ষে পৌঁছোনোই যাবে না। 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে' বইয়ের একটি কবিতার নাম 'হ্যাম্পস্টেড, যেখানে রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছিলেন'। ছোটো কবিতাটি এইরকম : 'আজ সেখানে / টিনের কৌটো, কোকা কোলার, কানীন একটি শিশু / সেটা দিয়েই বানিয়ে নিল জুতো,/ তাকিয়ে আছে তার দিকে এক নারী-পুলিশ তার / রয়েছে আব্রু তো?'?

শিরোনামে বিশ্বাস করে আমরা যে সরণিতে উঠব, কবিতাটি তার শাখা প্রশাখায় দূরত্বের একটি বাঁক এমন দুরূহভাবে স্পর্শ করল যে আমরা সেখানে পৌঁছোতে পারব কি

না তা নিয়ে আমাদের মনে ঘোরতর সন্দেহ তৈরি হয়। প্রথম দুটি, এমনকি তৃতীয় লাইনের সিঁড়িতেও আমরা সাহস করে পা রাখতে পারি। কিন্তু শেষ দুটি লাইনের দরাজ বন্ধুরতা অতিক্রম করার দম আমাদের কজনের আছে আমি জানি না।

এমন নির্মম আতিথ্যের উদাহরণ আলোকরঞ্জনের সারাজীবনের কবিতায় অজস্র ছড়ানো রয়েছে। কখনও হাত বাড়িয়ে রেখেছেন এমনভাবে যেন মনে হয় আমরা হাত বাড়ালেই তাঁকে স্পর্শ করতে পারব। কিন্তু মধ্যবর্তী উর্বরতার ঝুঁকি এতটাই যে, যে কোনো মুহূর্তে খাদে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা জাগ্রত থাকে। 'লঘু সংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে' বইয়ের 'আমাদের বাড়ি' কবিতাটি এই রকম : 'সৌরেনের টেলিফোন নম্বর / রজতের ঠিকানায় ঢুকে গিয়ে ঘটায় গার্হস্থ্য বিপর্যয়....'। এই নিরপরাধ ধরনটিকে যে একদম বিশ্বাস করা চলবে না, সেটা না বুঝলে একদম শেষ লাইনটিতে গিয়ে সর্বনাশ হতে বাধ্য। কখনও হাত স্পর্শই প্রায় করে রাখেন তিনি, কিন্তু আমরা আটকে থাকি এমন প্রিয় ও অপরিচ্ছন্ন সংস্কারে যে, এগোতেই পারি না। 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে' বইয়েরই সূচনা কবিতাটির কথা এখানে মনে পড়ছে। 'শিশুকে যেমন আদর করেন চিত্রাভিনেতা ড্যানি কে / বুকের জ্যোৎস্না ঢেলে...' ইত্যাদি। কবিতাটির পরের অংশে এই মধুর চিত্রাভিনেতার জন্য মহার্ঘ আসনটি ঠিক কোথায় পাতব আমরা, সেই ভাবনায় উদ্‌বেলিত হওয়া ছাড়া আর কিছু কি করণীয় থাকে আমাদের? কখনও প্রত্যাখ্যানের ভাষার মধ্যেই সহাস্য প্রশ্রয় রাখেন। 'জবাবদিহির টিলা' বইয়ের 'ভাইকেও ভালোবাসতেন নোভালিস' কবিতাটির কথা মনে করুন। কবি ও মানুষ হিসেবে আমাদের আর দীক্ষার যে চলাচল, যে দ্বিধা, দায়, দীপ্তি ও সন্ন্যাস, তার একটি আলোচনাময় উদ্‌বোধন এই কবিতাটি। কবিতাটি নিজেই তার ভঙ্গির মধ্যে এই সম্পর্কের স্বভাবকে গ্রহণ করেছে। মেধার সান্নিধ্য স্বীকার করেও যে কবিতা শিল্পের অচরিতার্থতা বজায় রাখতে পারে, বাংলায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাবে তা আমরা টের পাই অলোকরঞ্জনের কবিতা পড়েই। এই প্রত্যেকটি ঘরানাই বাংলা কবিতার শিরোধার্য অহংকার, যার সমূহ স্বত্বাধিকারী একমাত্র অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

'ফিলমের মধ্যে কবিতা' নামে একটি লেখায় শঙ্খ ঘোষ একবার জানিয়েছিলেন, 'সত্যি সত্যি কবিতায় ভর দিয়ে গোটা একটি ছবি তৈরি করে ফেলার, কিংবা ছবির আদলকে পুরোপুরি ভেঙে দিয়ে তার মধ্যে অবচেতনকে ধরবার কবিতাস্পৃষ্ট আয়তন নিয়ে আসা, সে সব চর্চায় পৌঁছোতে বাংলা ফিল্মের আরও খানিকটা সময় লেগে যাবে বলে মনে হয়"। 'কবিতাস্পৃষ্ট' শব্দটি পড়ে আমরা বুঝতে পারি, অবচেতনের ভাঙনময় পর্যটন কবিতার একটি মৌলিক আদল বলে মনে করছেন তিনি। আমরা যদি উলটো দিক থেকে দেখি, তাহলে অলোকরঞ্জনের কবিতা প্রসঙ্গে হিচককের ছবির কথা মনে পড়বে আমাদের। অলোকরঞ্জনের মতোই এই সম্ভাবনাময় নৈরাজ্য হিচককের ছবিরও সম্পদ। সাদা-কালোর

নাছোড় বিভাজ নেই তাঁর ছবিতে। 'স্ট্রেনজারস অন আ ট্রেন' ছবিতে একজন তরুণীকে সদ্য গলা টিপে হত্যা করে এসে কেউ অন্ধ মানুষকে গভীরভাবে রাস্তা পার করে দেয়, 'রিয়ার উইনডো' ছবির সচেতন নায়ক স্বল্পবাস তরুণীকে দূরের জানালা দিয়ে দেখে গোপন আনন্দ পান, 'রেবেকা'য় অভিজাত ও রুক্ষ মানুষটির মধ্যে ভালোবাসার আগুন গনগন করে। 'সাশপিশন'-এ প্রতারণাময় কেরি গ্রান্টের মধ্যে বেদনা আর ভালোবাসার স্থায়ী অন্তঃসঞ্চার ছবির একেবারে শেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

বৈপরীত্যের এই শক্তিই হিচককের ছবির সম্পদ লিখেছিলেন এক সমালোচক। স্বাভাবিকতা ও সন্দেহ, গতি ও মন্থরতা, আতঙ্ক আর উল্লাস, কোলাহল এবং নৈঃশব্দ্যের বুননে তৈরি হিচচকের ছবি। নীরবতা তাঁর ছবিতে সবচেয়ে বেশি মুখর। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি ছবির স্মরণীয়তম মুহূর্তগুলোয়, ভেবে দেখুন, কথা নেই। 'নর্থ বাই নর্থওয়েস্ট'-এ রাস্তা পেরিয়ে খেতের মধ্যে দিয়ে ছুটছেন কেরি গ্রান্ট, মাথার ওপরে তাড়া করছে শত্রু, 'রিয়ার উইন্ডো'-তে অসহায় জেমস স্টুয়ার্ট দূরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন আততায়ীর ঘরে আটকে পড়া প্রেমিকার দিকে, 'সাইকো' ছবিতে জেনেট লি চিঠি লিখছেন, ছিঁড়ে ফেলছেন, ছিন্ন টুকরোগুলো ফেলে দিলেন, স্নান করছেন শাওয়ারে, পেছনে ছায়ার মতো এগিয়ে এল আততায়ী। 'নটোরিয়াস'-এ হারানো চাবির জন্য উৎকণ্ঠার গোটা পর্বটি, তিন মিনিটেরও বেশি, নির্বাক। নির্বাক ছবি দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন হিচকক, তাই তিনি জানেন নৈঃশব্দ্যের শক্তি কত। 'রিয়ার উইন্ডো' ছবির শুরুর প্রথম চার মিনিট নির্বাক। আর এই মুখর চার চার মিনিট ধরে ক্যামেরা নিঃশব্দে আমাদের সবকটি জানালার বিচিত্র জীবনযাপন, দ্রুতপদ পাখিদের উদাসীনতা, কলরবময় পথ দেখিয়ে দিয়ে চলে আসে নিজের ঘরে, যে-ঘরের জানালা পরের কয়েক ঘণ্টা আমাদের চোখ হয়ে উঠবে। সেই ঘরে চিত্রশিল্পী স্টুয়ার্ট পা ভেঙে পড়ে আছেন, সারা ঘরে তাঁর কীর্তি আর স্মারক সাজানো। একটি রূপপত্রিকার প্রচ্ছদও দেখা যাবে, তাঁর প্রেমিকার অগ্রিম সূত্র হিসেবে। পুরো ঘরটিকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখানোর কারণ আছে অপরাধের রুদ্ধশ্বাস ঘনঘটাই যে ছবির সবটা নয়, সেটা শুরুতেই ধরানো জরুরি ছিল, যাতে দর্শক রোমাঞ্চের ভুলভুলাইয়াতে মজে না যান। পাঠককে না—মজানোর এই সচেতন লক্ষ্যের দিক থেকে অলোকরঞ্জন, হিচকক, গোদার, ব্রেখট সবাই এক সরণির সাধক। নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিচারে আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি মেরি অলিভার কয়েকবছর আগে প্রয়াত হবার পর একজন বলেছিলেন, তাঁর লেখা পড়ে মনে হত তাঁর প্রিয়তম কাজ হল বানে গিয়ে একটা কুটির বানিয়ে কবিতা লেখা। কবির কাজ, বলতেন তিনি, এমনি চোখে যা দেখা যায় না, তা-ই দেখানো। পৃথিবীটাকে পরিস্রুত করে তারপর পরিবেশন করা। কিন্তু অলোকরঞ্জনের সাধনা এই গোত্রের নয়। বনান্তের কুটির তাঁরও প্রার্থিত, কিন্তু চারপাশের লুব্ধ ক্রেতাদল, বীতশ্রদ্ধ প্রদর্শনী, পাহাড়ে

থেকে দেখা উৎফুল্ল গোধূলি, সাঁওতালি প্রত্যুত্তর, বীজগম নিয়ে দ্রুত সেরে ফিরে আসবে যে রমণী তাঁর জন্য অপেক্ষা তুচ্ছ করে সেই নিরুদ্‌বেগ প্রত্যাহার তিনি বরণ করতে পারবেন না। নিরুপায় বিস্ময়ে তাই তিনি প্রকাশ্যেই বলেন—"কী করে যে অতটুকু ঘরের মধ্যে আছ।/ বাইরে কত সমারোহ শালতমালের কত / সমারোহ নানারকম ফুলের / কত পাখির হাট বসেছে বাইরে'। খেয়াল করতে হবে, 'পাখির' পরে 'হাট' লিখতে অসুবিধে হয়নি তাঁর। তাঁর মতো আমর্ম সচেতন শিল্পীর এই উদ্যোগ তাই সুপরিসরে অর্থময়। ডানা মেলার আওয়াজ শুনতে চেয়েও মানুষের সরব আনাগোনায় তাঁর আপত্তি নেই। বরং আমন্ত্রণ আছে। আহ্বান আছে। আগ্রহ আছে। আর্তি আছে। এই সাগ্রহ আকুলতাই অলোকরঞ্জনের কবিতাকে পবিত্রতার ব্যক্তিগত সংজ্ঞাটির আরাধনায় বাধা দিয়েছে। 'ওল্ড পিপলস হোম'-এর তৎপর ম্যানেজার'-এর মৃত্যু পরোয়ানাকে তাই এতটা নীরবে ব্যঙ্গ করতে পারেন। 'ম্যানেজার দিলেন চাবি, সর্বোপরি পারেন। কুশলজিজ্ঞাসা/ মৃত্যুপোশাক এনেছেন তো? সেটাও লাগবে বাঁচার পরিশেষে'। বাঁচার এই মর্মান্তিক পরিশেষের বিরুদ্ধেই যে তাঁর চলা তা তাঁর আরও অনেক কবিতার মতোই এই কবিতা পড়েও বুঝি আমরা।

'জবাবদিহির টিলা' বইয়ের দ্বিতীয় পর্বের নামহীন সূচনা কবিতায় ছন্দের সচেতন দোলাচলে বিষয়ের সমর্থন আদায় করেছেন তিনি, আগে লিখেছিলাম। প্রসঙ্গটি আবার মনে করছি এইজন্য যে, ছন্দের এই সৃজনশীল উদযাপন আর একটু স্পর্শ না করলে অলোকরঞ্জনের কবিতা নিয়ে কথা ঊন থেকে যাবে। চিত্রকলার আলোচনায় এমন কথা অনেকে বলেন যে, একটি ছবির কোনো একটি অংশ প্রত্যাহার করলে যদি সেই ছবির কোনো ক্ষতি না হয়, লুপ্ত সেই অংশটি যদি সেই ছবির মর্ম গ্রহণের সময় স্মরণীয় মনে না হয় কারও, তাহলে সেই ছবির গুণমান সম্পর্কে অবশ্যই সন্দেহ করতে হবে। একটি ছবির যে কোনো বিন্দুই যেমন অবধারিত, অলোকরঞ্জনের কবিতার প্রতিটি শব্দ এবং ছন্দের চলনটিও তেমনই অনিবার্য ও জরুরি। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ছন্দের ভূমিকা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু যা বলেছিলেন, সেই কথাই বলা যায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং আমাদের সময়ের যে কোনো গীতিকবির কবিতা প্রসঙ্গে। আলোকরঞ্জন কখনোই চাইতেন না ছন্দ তাঁর কবিতায় আলাদাভাবে বেজে উঠুক। তাঁর বক্তব্যেরই সম্প্রসারণ তাঁর ছন্দ। সব ছন্দেই অলোকরঞ্জন লিখেছেন এবং প্রতিটি কবিতার ছন্দই সেই বিশেষ কবিতাটির কথাকে সমর্থন করেছে। ছন্দ যখনই দুলে উঠতে চেয়েছে তখনই তাঁর কথা বলার কৌতূহলী ধরনটি দিয়ে তাকে ভেঙে দিয়েছেন। সত্যজিৎ রায় যেভাবে তাঁর ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের আগ্রাসন বাড়তে দেন না, ফিল্মের ভাষার আওতার মধ্যেই সুরের ভুবন বিজয়ী স্বরলিপি ব্যবহার করেন, আলোকরঞ্জনও ছন্দের সাম্রাজ্যবাদী চলনটি পদে পদে ভেঙে দেন। শব্দের অযুত কোষাগার দখলে ছিল তাঁর, ফলে এমনকি অক্ষরবৃত্তের মতো

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

কঠোর ছন্দেও উথলে উঠতে চাইত শব্দ। কিন্তু প্রত্যাহারের শিল্পও তাঁর করায়ত্ত ছিল 'নিষিদ্ধ কোজাগরী' বইয়ের 'আসন্ন' কবিতার প্রথম স্তবকটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া যাক 'প্লাবিত জ্যোৎস্নায় ও কে মাউথ অর্গ্যান / বাজায় প্রকাশ্য রাজপথে? / লঘু সুরে কাকে অর্ঘ্যদান / করবে অদূরভবিষ্যতে"? প্রথম লাইনে 'প্লাবিত' ও 'জ্যোৎস্নায়' এই দুটি শব্দের তরল প্রবহমানতাকে থামালেন তিনি যান্ত্রিক। অর্গ্যানের কৌশলে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, মাউথ অর্গ্যান বাজানোর পদ্ধতি তাঁর কথাকে পরের লাইনে নিয়ে এসে, তার মধ্যে প্রশ্নের ধরনও এনে দিয়ে সব নমনীয়তা উপল বন্ধুর করে দিল। আরও আছে। প্রশ্নের ধরনটি চালু রাখলেন তিনি, কারণ তৃতীয় লাইনেও আছে আবার অর্ঘ্যদান-এর মতো আলুলায়িত শব্দ। সেই মায়াও কাটল, এবং তা আরও শক্তি পেল 'অদুর' আর 'ভবিষ্যতে' এই দুটি শব্দকে সমাসবদ্ধ করে দিয়ে। এত নেপথ্য কাণ্ড টের না পেয়েই যে আমরা কবিতাটি পড়তে পারি, তার কারণ অবশ্যই অলোকরঞ্জনের অভূতপুর্ব সামর্থ্য।

অলোকরঞ্জনের যে-কোনো কবিতায় এই পদধ্বনিময় আরাধনার স্পর্শ পাব আমরা।

উৎস : কৃত্তিবাস, জানুয়ারী ২০২১

ঈশ্বর-প্রকৃতি-মানুষের কবির রক্তে অমূর্ত আগুনের কথা : আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

দেশ যখন স্বাধীন হলো পঞ্চাশের কবিরা অধিকাংশই যৌবনে পা রেখেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তেজনা এঁদের কাউকে কাউকে ছুঁয়েছিল বলা যায়। স্বাধীনতার ফলভোগও করতে হয়েছে এঁদের। এঁরা দেখেছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তসমুদ্র। দেশভাগ, ছিন্নমূল সমস্যা। দেখেছেন সুবিধাভোগী রাজনীতিকে। ধান্দাবাজিকে। দেখেছেন সংস্কারে আহুত মূল্যবোধগুলির নির্মম মৃত্যুকে। খুব সংশয়ের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখা ছিল অনিবার্য। কাউকেই যেন বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। অসহিষ্ণুতার এই দশক দাপিয়ে বেড়িয়েছে আত্ম-আবিষ্কারে। এসেছিল সংঘবদ্ধতার স্বপ্ন। এহেন দশকে কবিতার ভুবনে কাব্যচর্চায় মগ্ন হয়ে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও কিন্তু সময়কে অস্বীকার করতে পারেননি আদৌ। তিনি তাঁর 'নিজেকেই যেন দিয়েছি শ্রুতিলিখন' শীর্ষক সাক্ষাৎকারে বলছেন—

"...এই যে আমাদের সময়ের বিরাট সব সংঘটনগুলো আমি যদি সেদিকে চোখ বুজে থাকি, তাহলে মনে হতে পারে কবিতা শুধু সোনার নৌকা, সেটা নোয়ার নৌকার মতন, শুধু নির্বাচিত কিছু প্রজাতি তার মধ্যে থেকে যাবে। কিন্তু কবিতা তো আমার কাছে মহাতরণী, যে-তরণী অনেক সময় আমার মনে হয়েছে ঢেউ দিয়ে গড়া।"

কিন্তু এও আমরা জানি কবি আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতাকে আলোচনার সময় আমরা তাঁর কবিতার শব্দ নির্মাণের দীপ্তি, নিত্যনতুন চিত্রকল্প নির্মাণের দীপ্তির কথাই বলি। প্রাবন্ধিক বর্ণিক রায়ের গ্রন্থ 'কবিতা : চিত্রি ছায়া'-তে তাই বলতে দেখি "অলোকরঞ্জনের কবিতার শব্দ এমনিভাবেই শব্দের অভিঘাতে নূতন শক্তি লাভ করছে, শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ঘটনা জগতে নূতন ঘটনার জন্ম দেয়।" অর্থাৎ তাঁর কবিতার প্রথম এবং শেষ সৌন্দর্য শব্দ নিয়েই আলোচনা হয়েছে বেশি।

অনেকেই তাঁর কবিতার প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলেছেন। বলেছেন সৌন্দর্যকে তিনি অনুভব করেছেন নগরজীবনের ক্লেদাক্ত থেকে সরে গিয়ে গ্রাম জীবনের নিসর্গের আঙিনায়। বাউলের মতন তাঁর পরিভ্রমণ এই কারণেই। রূপোলি ডানার পাখি, গ্রামের মানুষের হাসির মায়ায় তিনি তন্ময়। আর সেখানেই তাঁর ঈপ্সিত মুক্তি।

অধিকাংশ মননশীল কবিতার পাঠকেরই মত হল তিনি প্রকৃতি, ঈশ্বর আর মানুষ নিয়ে এক সর্বজনীন জীবন জিজ্ঞাসার ভেতর দিয়ে আত্ম-অবগাহনের দিকপ্রান্তে তাঁর পরিভ্রমণ।

এই কারণেই ঈশ্বর তাঁর কবিতায় আলাদা কোন সত্তা নন, ঈশ্বর যেন প্রকৃতি আর মানুষের ভেতরের সত্য ও সৌন্দর্যের মধ্যে বিরাজমান। ঈশ্বর কবির কাছে মাটির প্রতি তীব্র টান, মানুষের প্রতি অনাবিল প্রেম, সর্বোপরি নিসর্গের ভেতরই বহমান সত্তা। আর এই কারণেই রহস্যের ভেতর ঢুকে, পরতে পরতে রহস্যের অলীক মায়া খুলতে খুলতে তিনি চলেছেন 'যৌবনবাউল' হয়ে। এই জগতে চলমান জীবনের প্রতিটি রূপইতো আসলে রহস্যময়। আমরা যদি প্রকৃত জীবনপ্রেমিক হই তবে উপলব্ধির অভিজ্ঞতার দর্পণে সমস্ত রহস্যের রূপ-রঙ সম্পর্কে আমাদের অবগত হতে হয়। আত্ম অবগাহনের পথকে চিনে চিনে জীবন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়েই আমাদের পথ চলতে হয়। জাগ্রত রাখতে হয় ভেতর আর বাইরের দুই চোখের দৃষ্টিকেই। আর এই কারণেই কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন, ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে। কবি কোন সময় চিত্রকর, কোন সময় হয়ে ওঠেন কথক। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতায় নানা চরিত্রের মোড়ক দেখি আমরা। দেখি জীবনের নানান দর্পণ। কোন সময় আলোর অফুরন্ত ভাণ্ডারে তা পূর্ণ। কোন সময় বৃত্তের একাগ্র অভিযানে তা মগ্ন। কোন সময় বৃষ্টিতে ভিজে, কোন সময় অলীক মায়ায় আচ্ছন্ন ভাটিয়ালীর ভেতর দিয়ে চলার মতন। কোন সময় আবার বকুল মাটির আকাশের গন্ধ ছুঁয়ে থাকা ভালবাসার মতন। মানুষ-প্রকৃতি-ঈশ্বরে এক সর্বজনীন জীবনজিজ্ঞাসার পথ কাটতে কাটতে কবির এগিয়ে চলা। কিন্তু এত কিছুর পরেও আমরা এই আলোকপাতে দেখতে চাইবো এক ভিন্ন ধর্মী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে। যেখানে তিনি এই সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে একজন প্রতিবাদী সমাজ সচেতন শিল্পী। প্রগতি চেতনার কবি।

আমরা প্রত্যেকে জানি কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর প্রথম কবিতার বই 'যৌবনবাউল' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। তারপর ১৯৬৭-তে 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', ১৯৬৮-তে 'প্রতিদিন সূর্যের পার্বণ', ১৯৬৯-এ 'রক্তাক্ত ঝরোখা', ১৯৭৩-এ 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ', ১৯৭৭-এ 'লঘু সংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে', ১৯৮২-তে 'জবাবদিহির টিলা', ১৯৮৪-তে 'এবার চলো বিপ্রতীপে', ১৯৮৫-তে 'ঝরছে কথা আতসকাঁচে', ১৯৮৮-তে 'ধুনুরি দিয়েছে টংকার', ১৯৯০-এ 'এক-একটি উপভাষায় বৃষ্টি পড়ে', ১৯৯৬-এ 'তুষার জুড়ে চিহ্ন', ১৯৯৭-এ 'অস্তসূর্য এঁকে দিলো টেম্পোরা', ১৯৯৮-এ 'মুঙ্গেশ্বরী ফেরিঘাট পার হতে গিয়ে', ১৯৯৯-এ 'ধুলোমাখা ঈথারের জামা, এই একই বছরে প্রকাশ পায় 'শীতের গোধূলি' প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থের জগত। এই জগতে কবির প্রতিবাদী মন আর মননের দিক সন্ধান আমাদের বহমান আলোচনার সুলুক সন্ধান।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রসঙ্গে অধিকাংশের অভিমত নিয়ে আমরা যে কথাগুলি বলে নেবার চেষ্টা করলাম, সেখানে তাঁর ঈশ্বর প্রেম, প্রকৃতি প্রেম আর মানুষকে ভালোবাসার কথা জানলাম। তিনি নিজেই লিখছেন 'বন্ধুরা বিদ্রূপ করে।'—তে

"বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে;
তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হলে
আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো?"

কিন্তু তাঁর চোখের সামনে বদলে গেছে চেনা দেশ। বদলে গেছে চেনা বিশ্ব। পৃথিবীতে এক সময় উপসাগরের যুদ্ধ পরিস্থিতি বিশ্বের মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল আর একটা বিশ্বযুদ্ধ হয়ত বাঁধতে চলেছে এমন ভয়ে। দেশের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি হয়েছে বারে বারে। সায়ত্তশাসনের নাম করে দেশভাগের নতুন চক্রান্তে দেশ ভয়ার্ত হয়েছে বারে বারে। বারে বারে দেখা গেছে কৃষকদের দুঃখ সাগরে ভেসে যাওয়ার বিষয়। শিল্পকে কেন্দ্র করে বেঁধেছে শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব। কবি সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে ভয়ার্ত হয়েছে। প্রতিবাদী হয়েছেন নানা প্রশ্নে তাঁর কবিতার অন্তরমহলে। না। এর জন্য কবিকে গিয়ে দাঁড়াতে হয়নি কোন রাজনৈতিক দলের পাশে, নেতার পাশে। কবি তাঁর 'ভাবমূর্তি' নামের লেখায় দ্বিধাহীনভাবে লিখেছেন—

"একটু একটু অনীশ্বর হয়েছি। এখন
প্রেতপিশাচের দল ডম্বরু বাজায়, শর্বরীতে,
তথাপি যেহেতু কবে 'যৌবনবাউল লিখেছিলাম
ঈশ্বরের কথা বলি, ভাবমূর্তিটুকু রেখে দিতে।"

কবি এই প্রশ্নেই অকুণ্ঠ হৃদয়ে বলে নিতে পারেন তিনি ঈশ্বরকে চাইছেন অংশত বিদির্ণ পৃথিবীতে। তিনি বলেন "অংশত ঈশ্বর চাই বিদীর্ণ নিখিলে।" তিনি হৃদয়গত জায়গা থেকেই বলে দিতে পারেন—

"মাঝে মাঝে স্পষ্ট করে বলা দরকার
ঈশ্বর আছেন।"

আমরা যে সাক্ষাৎকারটির কথা প্রথমদিকেই বলেছিলাম, সেই "নিজেকে যেন দিয়েছি শ্রুতিলিখন"-এ বলছেন একেবারে স্পষ্টাস্পষ্ট-"ঈশ্বর আছেন কি নেই সেটা আমি জানি না। কিন্তু আমার কবিতায় ঈশ্বর একটি শর্ত হিসেবে থেকে যান।" কবির ভাবনায় আমরা এও বলতে শুনেছি "সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই প্রাণ ও প্রেম বারবারই প্রকৃতির মাধ্যমেই আবহমানের শিল্পরূপে অঙ্কুরিত হয়েছে"।

যখন কবি দেখতে পান প্রেম আজ অপ্রেমের আঘাতে সত্যি সত্যি ব্যাহত হচ্ছে, প্রাণ আজ অত্যাচারীর হাতে বিপদগ্রস্ত। যা হওয়ার কথা নয়, তাই-ই হচ্ছে দেশ জুড়ে, বিশ্বময়। কবি এতে সত্যিকারের রক্তাক্ত হন। বিক্ষত হন। তিনি তাঁর "বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে : দ্বিতীয় পর্যায়" -এ ভগবান বুদ্ধের কাছে বলেছেন—

"আমারই বিরোধাভাস বেড়ে যায়? স্বজাতীয়তার
নাম নিয়ে পারমাণবিক বিস্ফোরণ
সেরে এসে ওরা যেই বলে উঠল, সিদ্ধার্থের মুখে
সুস্মিতি ফুটে উঠেছে' তুমি তো করনি তিরস্কার।"

এই লেখা পোখরান পরমাণু বিস্ফোরণের প্রেক্ষিত থেকে উঠে আসে ব্যথিত হৃদয়ের আর্তনাদ। কি যন্ত্রণা থেকে কবিকে লিখতে হয়—

"এখনও তুমি বুঝতে পারছ না
অজানা এসে মিশেছে, সাইরেণ?
বন্ধুরা সব মৃত বা অপহৃত
যুদ্ধ এসে লুপ্ত করে দিল
সভ্যতার গ্রন্থাগারগুলি,
এখন আর সকাল নেই শুধু
সারা সময় অনন্ত গোধূলি
গোধূলি নয়, বারুদ ছাওয়া মেঘ।"

এই অসুস্থ পরিবেশের দেশ ও বিশ্বকে দেখে কবি কিন্তু আশাহত হয়ে পড়েননি, ভেঙে পড়েননি। কষ্টের ভেতর থেকেও আলোর স্বপ্ন তাঁকে তন্ময় করে রাখে। তাই বলতে শোনা যায় সেই দৃঢ়তায় সংলগ্ন কথামালা—

"জাতকবুদ্ধের মতো এখনো অনেক তিতুমীর
জন্ম নেবে, এবং তাদের চরিতার্থ করে শেষে একদিন সর্বাঙ্গীণ মুক্তির সময়
মানুষকে মনোনীত করে নেবে, আগে দেবে স্বাধীনতা, শেষে মুক্তি।"

ছোট্ট কবিতার বই 'গোলাপ এখন রাজনৈতিক'। প্রকাশ পাচ্ছে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে। বাংলায় তখন ঘটে গেছে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরে রাজনৈতিক ঘটনাবলি। নন্দীগ্রামে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে গুলি চালাবার ঘটনা ঘটে গেছে। উল্লেখিত গ্রন্থটির প্রয়োজন প্রসঙ্গে কবি লিখলেন "এমন সময় নন্দীগ্রামে আবার আমলা সমর্থিত কয়েক রাউণ্ড হামলা চলল। তারই অভিঘাতে কিছু বাসি কিছু তরতাজা প্রতিরোধের গদ্যপদ্য সাজিয়ে দিতে হল আমায়।"

একসময় কথাটি বলেছিলেন এরিশ ফ্রিড। বলেছিলেন আজকের গোলাপ ফুলও রাজনৈতিক। কবি তাঁর গ্রন্থের কবিতাগুলির ভেতরে যেন গোলাপের মতন স্নিগ্ধ কবিতার ভেতর ছুঁয়ে দিতে চাইলেন সমসাময়িক রাজনীতির রক্তাক্ত পরিবেশ।

'গোলাপ এখন রাজনৈতিক' গ্রন্থের কবিতাগুলির ভেতরে যে প্রতিবাদের রক্তাক্ত অধ্যায়ের কথা উঠোনের আলপনার মতন এঁকে দিতে চেয়েছেন তার প্রমাণ পরতে পরতে

রয়েছে। যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা চয়ন করছি আলোচিত গ্রন্থের 'রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ' কবিতাটির কিছুটা অংশ।। কবি লিখছেন—

"নৌকা আছে, রয়েছে মাল্লারা
তবে কি জানো রাষ্ট্র নায়কেরা
জল্লাদেরে দিয়েছে আস্কারা।"

কবি প্রশ্ন তোলেন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের রক্তাক্ত অধ্যায় নিয়ে। তিনি কি অনায়াসেই লিখতে পারেন 'সুমন' নামের কবিতাটিতে—

"তোমরা আমায় বলতে পারো
দুদিক-জোড়া কাশের বনে
রক্ত...এত রক্ত কেন,"

কৃষকের ন্যায্য দাবিকে দমিয়ে দেবার জন্য রাষ্ট্র বারে বারে মুখর হয়েছে অদূর অতীতে। নন্দীগ্রামের গুলি চালনাতেও সেই ঘটনাধারারই পুনরাবৃত্তি। কবি তাঁর 'হেই সামালো' কবিতায় লিখলেন,

"গাইতে গিয়ে লাগল বুকে
বুলেট এসে, মারছে যেজন
বলে উঠেছে সকৌতুকে
"খুন করাটাই শিল্প এখন।"

আবার প্রতিবাদী কবি নিজের ভেতরে জ্বলতে থাকা আগুনকে সঙ্গে নিয়ে 'প্রলয়শিল্প' কবিতায় লিখে দিতে পারেন—

"এখন আমার লড়াই এক হাতে,
যদিও সেই প্রতিবাদের ভাষা
অন্যরকম,"

রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসের প্রেক্ষিতকে মনে রেখেই তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর 'ঝরা পাতা কবিতায় লেখেন—

"অন্তহীন
দল-রাজনীতির অজ্ঞেয়
কারসাজিতে চলছে ভাঙচুর—
স্থান আর স্থিতি নয় আজ,"

আলোচক কবি অধ্যাপক ড. জহর সেনমজুমদার তাঁর 'কবিতার দীপ', 'কবিতার দীপ্তি'-তে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর প্রতিবাদে ভাস্বর এই ধরণের কবিতা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'... এই

যুগজাত সংকটের পরিবেশে অলোকরঞ্জনের কবিতা কিন্তু আমাদের সব অর্থেই 'ডিস্টার্ব' করতে শুরু করছে।' আসলে তিনি যেন বলতে চাইলেন যে কবিকে আমরা ঈশ্বর বিশ্বাসী, প্রকৃতিলগ্ন কবি বলেই ভাবতে ভালবাসি, বা ভাবতে ভালবাসতাম, তিনিও কিন্তু প্রয়োজনে রাষ্ট্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে দ্বিধা করেন কি একেবারেই। এখানে তো কবিদের পূর্ণাঙ্গতা। পূর্ণতা।"

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কিন্তু প্রয়োজনের সময় গর্জে উঠেছেন অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে। ঘাতকের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের অবমাননা যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে। কবির প্রখ্যাত কাব্য 'দুধে আলতার কুয়াশায় আঁকা ছবি' কাব্যের 'হেঁটে যেতে গিয়ে' কবিতায় লিখছেন—

"আমি ইতিহাসে হেঁটে যেতে চাই, তবুও দেখি সেখানেও যানজট
জুড়ে দেয় কিন্তু ক্ষমতাপ্রাপ্ত উড্ডীন, যারা মুছে দেয় জনপদ—
****
প্রতিবাদ নাকি কবিতা হয় না, তাই কান্নায় ভেঙে পড়ি সে সময়,
পাড়ার ছোকরা বলেছে তখন আমায় দেখলে কাপুরুষ মনে হয়।"

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতা যেন স্বর্ণস্খলিত এক কিন্নরের কথালাপ-আদ্রে ব্রেতোঁর এক মূর্তিমান প্রতিমূর্তি। তাঁর কবিতায় ঈশ্বর, মানুষ, প্রকৃতির সাথে সাথে এসেছে সময়ের অসুস্থতা, ক্লেশ, ক্লিন্নতা, আর রক্তপাতের দুঃস্বপ্ন। সময় যন্ত্রণার অভিক্ষেপে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু তিরিশের জীবনানন্দীয় সংশয়বাদ এবং আশাহীন অন্ধকারে মগ্ন না হয়ে আঁধার কেটে কেটে আলোর স্বপ্ন দেখেছেন। প্রতিবাদী ভয়হীন অবস্থার গভীরে প্রবেশ করে দেখেছেন মুক্তিস্বপ্ন। তিনি নিজেই বলছেন "আমার রক্তের মধ্যে আজ শুধু অমূর্ত আগুন"। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে পঞ্চাশ উর্দ্ধ সময়ে তাঁর "শঙ্খ" কবিতায় মানবিকতার শঙ্খকে তুলে ধরে প্রগতিবাদী পথের সন্ধান দিয়েছেন, কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও বিশেষ করে তাঁর শেষ পর্বের কবিতায় প্রতিবাদী রক্তক্ষরণে এঁকেছেন কবিতার শব্দ-আলপনা।

তথ্যঋণ :

১। সাক্ষাৎকার (এপ্রিল/২০০৬)/ নিজেকেই যেন দিয়েছি শ্রুতিলিখন/অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।
২। বন্ধুরা বিদ্রূপ করে/তদেব।
৩। ভাবমূর্তি/তদেব।
৪। বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে : দ্বিতীয় পর্যায়/তদেব।
৫। হেঁটে যেতে গিয়ে/তদেব।

৬। গোলাপ এখন রাজনৈতিক (২০০৮)/তদেব।
৭। হেই সমালো/তদেব।
৮। ঝরা পাতা/তদেব।
৯। রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ/তদেব।
১০। সুমন/তদেব।
১১। প্রলয়শিল্প/তদেব।
১২। কবির প্রেম, কবির প্রতিবাদ/তরুণ মুখোপাধ্যায়।
১৩। কবিতার দ্বীপ, কবিতার দীপ্তি/ড. জহর সেন মজুমদার।
১৪। শ্রেষ্ঠ কবিতা/অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত/প্রমা।
১৫। বাংলা কবিতার কালান্তর/ড. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়/দেজ।

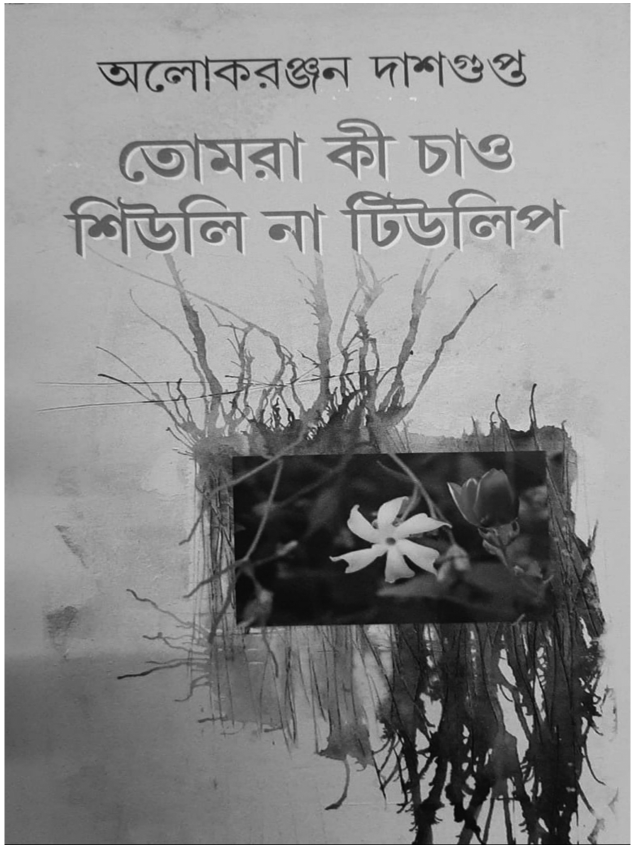

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা : পুনঃপাঠ

দেবকুমার সোম

আমাদের বিশদ সাহিত্য আলোচনায় কখনো কখনো এমন কিছু নাম উঠে আসে যাঁদের নাম আমাদের জানা থাকলেও তাদের স্পর্শ করার সুযোগ ঘটে না। এমনকি আমরা যারা নিজেদের কবিতা পাঠের নিবিষ্ট পাঠক হিসাবে দাবি করি এবং অর্থ ব্যয় করে থাকি, তারাও বেশ উদাসীন থাকি তেমন নামের প্রতি। কারণ হয়তো বহুবিধ। তবে সে-সব নামে আমাদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা থাকলেও পাঠে তড়িদাহত হওয়ার সম্ভাবনা কি থেকে যায় না? ফলে আমাদের সাবেক পাঠ অভিজ্ঞতায় শ্রমশীলতা না থাকার দরুন অনেক ক্ষেত্রে তারা অপঠিত থেকে যান। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তেমনই একজন কবি— যাঁকে আমরা নিবিড়ভাবে পাঠ করে উঠিনি। কবির নিজস্ব আবরণ উন্মোচনের মূল সুত্রগুলো যখন অধ্রুবক, তখন আমাদের বোধের নক্ষত্রদূরে থেকে যায় তার অবিস্মরণীয় বহু উচ্চারণ।

বাংলা শব্দে (বিশেষত অর্ধতৎসম শব্দে) এলানো উপাদান থাকায় বাংলা কবিতায় লিরিকের খুব সূক্ষ্ম কাজ দেখা যায়। এখানে কর্কশতা প্রায় বিরল এক অভিব্যক্তি। মাইকেল মধুসুদন দত্তকে পাঠ করতে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল তার সমকালের তার দায় কার ছিল? কবির? না পাঠকের? পয়ারের চোদ্দোমাত্রার কাঠামো অটুট রেখে তাঁর মধ্যবর্তী কোনো জায়গায় থেমে যেতেন বলেই তো মধুসুদনকে প্রাথমিকভাবে আমরা পাঠ করে উঠতে পারিনি। মধুসুদন সম্পর্কে যেমন শঙ্খ ঘোষ বলেছেন: "ছান্দসিকদের এই ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হল যে অক্ষরবৃত্ত তিন মাত্রা অথবা বিজোড় সংখ্যক মাত্রার পরে একেবারেই দাঁড়ায় না। এর ফলে দৃশ্যে এবং শ্রবণে আমাদের অসোয়াস্তি আমাদের মধুসূদন পাঠের আস্বাদন থেকে দূরে সরিয়ে দিল। আমরা বাংলা কবিতার সাধারণ পাঠকেরা অনুভব করতে চাইলাম না পাঁচালি কিংবা মঙ্গলকাব্যের মতো নয়, মধুসুদন বাংলা কবিতায় আমদানি করেছেন পৌরুষ। তাঁর কবিতা ভীষণভাবে ম্যাসকুলিন। সেই পরম্পরায় আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা। যিনি প্রাচ্যের একজন মরমি। কবি হয়েও ছিলেন খুব বড়ো মাপের এক আন্তর্জাতিক কবি। সমকালে কিংবা একালেও কেবলমাত্র পাঠ ও পুনঃ পাঠের শ্রমটুক আমাদের উপার্জিত না থাকার কারণে আমরা সুধীন্দ্রনাথের গুপ্তধন আবিষ্কারে প্রায় ব্যর্থ থেকে গেলাম। অলোকরঞ্জন কি সেই রেখার অন্যতম কোনো বিন্দু?

'মরণমাতাল ডোম   সবি করুক উপশম
শ্মশানে, আমি জীবন ছাড়বো না।
গঙ্গাজলে উঠুক পাপ   সূর্য্য হোক অপ্রতাপ
সকালে, আমি কিরণ বিকাবো না।

ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর
ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না।

কবির বহু আলোচিত কবিতার বই 'যৌবনবাউল'-এর আখ্যানভাগের অংশ আমরা একবার দেখে নিতে চাইছি বিরক্তিকর পৌনঃপুনিকতায় দুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও। কবিতার বইয়ের আখ্যানভাগ মুল কবির বই আর কবিকে খানিক উন্মোচনের পর্দা হিসাবে কাজ করে। ফলে বাংলার সাবেক ত্রিপদী ছন্দে গেঁথে যে কথাটা অলোকরঞ্জন এখানে বলা সাব্যস্ত করলেন, তার নির্যাস হল তিনি ছন্দে কবিতা লিখবেন। আর লিখবেন নাই বা কেন। শ্মশানের ডোমের কাজ যেমন মৃতদেহ সৎকার, কিবো সুর্যের ধর্ম যেমন কিরণ নিঃসরণ, তেমনই কবিতায় ছন্দ। তবে অলোকরঞ্জনীয় ছন্দে শ্বাসাঘাত সাবেক ত্রিপদীর মতো নয়। একটু বেয়াড়া। এই বেয়াড়াপনা অলোকরঞ্জনের কবিতার শরীর জুড়ে। 'যৌবনবাউল'-এর বহু পরে ১৯৮৮ সালে 'ধুনুরি দিয়েছে টংকার' কবিতার বইয়ে 'যুক্তি' নামের নাতিদীর্ঘ এই কবিতায় আমরা দেখতে পাই তেমন বেয়াড়াপনা।

'একজন আছে বটে, দূর সম্পর্কের সেও টিকিটবিহীন—
খুড়ো-বলে-ডাকা-সেই-সৌদাসের ছোট্ট ছেলেটা,
খুড়ো বলে কেন ডাকে ঈশ্বর জানেন। খুব ক্ষীণ
আরও একজন আছে, হয়তো দুরতর সম্পর্কের,
অথচ আত্মীয় ওর। আমি সেইজন
আরও একজন, আপনি, আপনি ছাড়া ওর কেউ নেই।
তা ছাড়া আপনার নয় একচেটিয়া ক্যানিং স্টেশন।

আমরা বুঝতে পারি এই কবিতায় ছন্দ অনুবর্তীতা মেপে গেঁথে তোলা কোনো ইমারত। ছন্দের দৃশ্যগত সৌন্দর্যায়নের কোনো খামতি যাতে না থাকে, সেজন্য তিনি কবিতার লাইনের মধ্যেও বিস্তর ফাঁকা জমি রেখে দিয়েছেন। আমরা স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্রনাথের কথাকে 'তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ।' উক্তিটিকে।

আমরা অলোকরঞ্জনের কবিতায় দেখি বিভাষের পরিমিত ব্যবহার। কবিতা নির্মাণে তিনি একজন চিত্রীর ভূমিকায়। সুন্দর একটি কন্যার কল্পিত মুখ চিত্রিত করার পর চিত্রী যেমন ছবির মেয়েটির ঠোঁটের কোণে একটি ছোট তিল এঁকে মেয়েটির হাসিকে মোনালিসার মতো স্বর্গীয় করে তোলেন, অলোকরঞ্জনের কবিতায় শব্দ ব্যবহার ঠিক তেমন। কবিতার শরীরের মোক্ষম জায়গায় তিনি এমন একটি অপার্থিব শট বসিয়ে দিতেন, যে কবিতার পারিপার্শ্বিক বদলে গিয়ে সম্পূর্ণ অন্য কোনো এক ভাষা পেয়ে যেত। 'প্রতিকল্প' কবিতাটি উদাহরণ হিসাবে আমরা একবার দেখে নিতে পারি—শংকরটা তো/ বলিষ্ঠ ছিল, তবে কেন

তাকে/ চলে যেতে হল, ক্ষীণ প্রতিবাদে / ভর করে ভাবি নীল শূন্যের/ টুটি চেপে ধরি।' পরের স্তবক 'এই প্রতিবাদও/ বুকের ভিতরে গুমরিয়ে উঠে।/ মিলাবে, ত্রিকুটে মাথা কুটে কুটে / হঠাৎ মেধাবী/ এই দিন হবে অমাশর্বরী।' শেষ স্তবক 'তবু বুক বাঁধো'/বলি বন্ধুকে ধরে নিয়ে যাই/ সুতৃপ্তি রেস্তোরাঁয়, কিংবা / শ্যামল দত্ত রায়ের বাড়িতে/ শিল্প বিষয়ে আলোচনা করি।' —এই কবিতায় কোনো ভাণ নেই, আছে শোকচিহ্ন আর সেই শোক থেকে উত্তরণের জন্য ব্যাবহারিক জীবনে ফের ফিরে যাওয়ার আহ্বান। কবিতাটি সাধারণ অর্থে খুব স্মৃতিধার্য হওয়ার নয়, অথচ ওই 'অমাশর্বরী' শব্দটির মোক্ষম ব্যবহার তাকে অন্য এক উচ্চতায় যেন পৌঁছে দিল। অলোকরঞ্জনের কবিতায় এই ধাঁচ মণিমুক্তোর মতো ছড়িয়ে রয়েছে— পাঠক প্রত্যাশায়।

শব্দ ব্যবহারে তূণীরে অপ্রচলিত কিংবা স্বয়ম্ভু শর্তের প্রেক্ষিত নির্বাচনে অলোকরঞ্জনের এই অনলসতা নিয়ে আমরা তর্ক জুড়তে পারি। বলতেই পারি তার কবিতায় সব শব্দ স্বতঃসারিত নয়। বরং বিনির্মিত। তার সমকালের সহকবিদের মতো তিনি শত নির্বাচনে তেমন উদার নন, ফলে তাঁর কবিতার রাস্তায় বিস্তর চোরকাটা কাপড়ে বিঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কথাটা ফেলে দেওয়ার নয়। তবে কবিতাকে বহুকৌণিক স্থান থেকে পাঠ করার দুঃসাহস নিলে কবিতা পাঠের আনন্দ কি চৌপদে বেড়ে যায় না?

কোনো কোনো আলোচক অলোকরঞ্জনকে ক্লাসিক ঘরানার কবি বলতে চেয়েছেন। 'ক্লাসিক' এই বিশেষণটি সম্ভ্রম জাগানোর মতো হলেও পাঠকের সঙ্গে নিবিড় সখ্যতার বদলে দুরত্ববিধির সতর্কীকরণ তৈরি করে। অলোকরঞ্জন বা তাঁর কবিতা অবশ্যই সহজবাচ্য ও সহজপাচ্য নয়, তার অর্থ এই তো নয় কবিতায় তিনি দূরত্ব তৈরি করেছেন। আমাদের আপত্তির জায়গা এইখানে। অলোকরঞ্জনের কবিতা স্লোগানমুখর বা আবৃত্তিযোগ্য নয় হয়তো, তাঁর কবিতার ধরন নিভৃত পাঠের। তাই তাকে ক্লাসিকের মর্যাদা দিয়ে দূরে ঠেলে রাখলে আখেরে আমাদের ক্ষতি। এ কথা আমরা কেন বলতে চাইছি? কারণ আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি এক শ্রেণির সাহিত্যকীর্তিকে আমরা 'ক্লাসিক' তকমা দিয়ে পাঠ বিবর্জিত রেখেছি। আমরা সে-সব সাহিত্য আর তাদের সৃষ্টিকর্তাদের সম্ভ্রমের সঙ্গে দুরে সরিয়ে রেখেছি। হাতের কাছে এমন উদাহরণ গদ্য, পদ্য সাহিত্যে বিস্তর। আমরা ধুর্জটিপ্রসাদ কিংবা কমলকুমারকে যেমন সম্ভ্রমের সঙ্গে দূরে সরিয়ে রেখেছি, তেমনই তো কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ, রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী বা গীতা চট্টোপাধ্যায়ের জন্যও উচ্চাসন নির্মাণ করেছি। অথচ, কোনো শিল্পীরই কাঙ্ক্ষিত নয় এমন দুরত্ব চেতনা। অঙ্কভীতির মতো যা মূলত কল্পিত অনাকাঙ্ক্ষিত।

'এখন অরুণোদয় তোমার উপরে
নির্ভর করছে, তুমি ঠিক কোন শব্দ

ব্যবহার করবে, তুমি শব্দের প্রস্বরে
সচেতন কিনা, কিংবা নিজের শপথ
নিতে পেরেছিলে নাকি পুনর্নব করে?

‘জ্ঞানসূর্য’ কবিতায় এমন জরুরি আলোচনা তাঁকে করতে হয়েছে পরিণত বয়সে পৌঁছে। আমরা যদি ফের একবার ‘যৌবনবাউল’-এর রেফারেন্স টেনে আনি তাহলে দেখতে পাব তিনি ঠিক ততটা অস্পষ্ট নন, যতটা বলা হয়ে থাকে। “স্বচ্ছ এই শালিখের মতো/ কবে হবে আমার হৃদয় ?/ হার মেনে হয় না আহত/ নিয়তি করে না যারে ক্ষয়।” পরের স্তবক “কখনো টিনের ছাদে ও যে/ রোদ্দুরের জলে অবলীন/ সাগরিকা শালিখ সহজে / পার হল ঢেউ-কাপা টিন।” (ফিরোজাবাদ স্টেশন থেকে)।

কর্মসূত্রে পশ্চিম ইউরোপের একটি প্রধান নগরে তাঁর জীবনের তিনের চার ভাগ কেটেছে। যেখানে এসে মিলেছে পূর্ব পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দেশের মেধাজীবীরা। গত পাঁচ-ছয় দশক ধরে দুনিয়া জুড়ে শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতিতে যেসব পালাবদল ঘটেছে, তিনি ছিলেন সে-সব আলোচনার আঁচের মধ্যে। ফলে তাঁর কবিতায় আমরা আন্তর্জাতিক কবিতার ধরন-ধারণগুলোর খানিকটা আঁচ পেয়ে যাই। তিনি বাংলাভাষার মতো পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভাষায় কবিতা লিখেছেন। জর্মান থেকে অনুবাদ করেছেন। ফলে “পুব ও পশ্চিমের মধ্যে সেতুসাধনের গরজে গ্যোয়েটের বীক্ষণ ‘ঈশ্বরের নিজস্ব এই প্রাচী।/ ঈশ্বরের নিজস্ব প্রতীচী।’/ ছিল তার অন্যতম আরাধ্য মন্ত্র”। তাঁকে পাঠ করায় আমরা সেই মন্ত্রকে যেমন অনুভব করতে পারি, ঠিক তেমনই দুই গোলার্ধের সম্মিলন খুঁজে পাই তার কাব্যচেতনায়। উদাহরণসূত্রে আমরা তাঁর ‘প্রকরণ’ কবিতাটিকে একবার পাঠ করে নিতে পারি। “একবিন্দু সরোবর হয়ে আছে/ চেতন্যের এইখানে,/ রাত্রি-নীল/জল।/ কেউ যেন কাছে এসে চলে যেতে চায়।/ সব জেনে তীরে তীরে পাতায় পাতায়/ উৎসর্জনের আলিম্পন;/ কম্পিত দিনরজনী চতুর্দিকে/সমুদ্র আকৃতিশূন্য। শুধু/ বিচ্ছেদের প্রকরণে নিটোল একটি সরোবর/চেতন্যে গীতিকবিতা/নির্ণীত বিষয় নেই বলে কোনো শিশুও এখন/ আপত্তি করে না যেন। প্রকরণ এখন ঈশ্বর/ এবং ঈশ্বর প্রকরণ।”

অলোকরঞ্জন এক ঈর্ষণীয় সময়কালে বেঁচে ছিলেন। তাঁর বন্ধুবৃত্তও ছিল তেমন ঈর্ষণীয়। দেখতে-দেখতে তাঁরা প্রায় সকলেই একে-একে চলে গেছেন জীবনের অন্যপারে অন্ধকার অনিঃশেষিত জগতে। আজ দেশে দেশে যখন ভোগবাদের প্রাদুর্ভাব আর ঈশ্বর নামের ব্যক্তিগত চেতনাকে কুলুঙ্গিতে লুকিয়ে রেখে রাজনীতির কারবারিরা ধর্মের আঁটোসাটো রক্ষীর পোশাক পরে আমাদের নিত্যদিন ভয় দেখাচ্ছেন। আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে এমন

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

দুর্ঘণ্ট — এমন কৌশলবাজি, তখন পরিত্রাণ শব্দটি কেবল পুঁথির মধ্যে আটকে থাকতে পারে না। ইতিহাস আসলে ফলিত বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাইছে ভোগবাদ আর ধর্মান্ধতাবাদ মূলত একই মুদ্রার দুই পিঠ — তার মৃত্যু আসন্ন। অলোকরঞ্জনের মতো কম পঠিত অথচ বেশি উচ্চারিত কবিদের কবিতা পুনঃপাঠের এই হল মোক্ষম সময়। ইতিহাসের এই নির্দেশ অমান্যতার পরিণাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হয়ে ওঠা জর্মানি, যেখানে ছিল অলোকরঞ্জনের অভিবাসএই তথ্য যেন আমরা না ভুলে যাই।

উৎস : কৃত্তিবাস, জানুয়ারি ২০২১

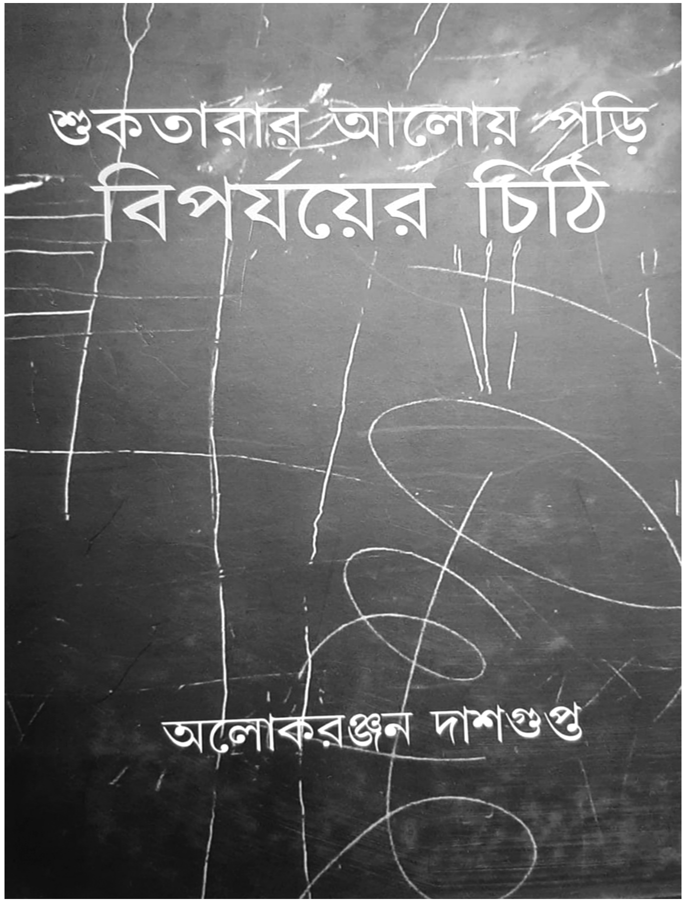

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতাবৃত্তে

জয়গোপাল মণ্ডল

'এমন নিপুণভাবে সূর্যের বিলয় হবে ভাবতে পারেনি কেউ।
এত কমনীয়ভাবে সর্বনাশ ঘটে যাবে সে কথা স্বপ্নেও
গোচর হয়নি কারো। সৌরপরিবারের রাত্রিতে
হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে
আচম্বিতে থেমে গেল মূল্যবোধপ্রিয় এক প্রৌঢ়ের স্পন্দন।' (শেষ সওদা)

এখানে কি সত্যি 'ধনুরি দিয়েছে টংকার'? খুব নিবিড়ভাবে ফেনিলশব্দে হৃদয় তীরে আছড়ে পড়ে একটা সংবাদ—'মূল্যবোধপ্রিয় এক প্রৌঢ়ের স্পন্দন'—সমশব্দ 'সূর্যের বিলয়', কী অলৌকিক অভিধেয় উপমা! এ তো চলমান পরিবর্তমানতা। কিংবা বিষয় ও ভিত্তির অবস্থান বদল, নাকি ভাষার বিকল্প ব্যঞ্জনা? নিত্য-নৈমিত্তিক বৈধ দ্যোতনা কেমন করে বৈপ্লবিক বিন্যাস গড়ে তোলে—

'সুষ্ঠুভাবে ভেবে নিতে গিয়ে দেখি সূর্য নিভে গিয়ে ট্রাফিকের
সূর্য জ্বলে ওঠে, আমি ছুটে যেতে চাই তবু নত হয়ে থাকি,
আমার বিদ্রোহ আর সৌজন্যের বিমিশ্র চালাকি
অস্তসূর্যে অনুস্যূত হয়ে থাকে।' (শেষ সওদা)

কৃত্রিমতা কীভাবে 'প্রতীতি' বিলি করে দেয়, পথে পথে রেখে দেয় 'রঙীন মাভৈঃ'—যেন স্ফুটিক জলধারায় মিশে গেছে আর্সেনিক, তবুও কী চকমকি; উজ্জ্বল, কবির চোখ ধাঁধায় না। বরং তীক্ষ্ণ শলাকায় বিদ্ধ করতে চাইলেই 'নত হয়ে' যায় চোখ। এ যেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের একচ্ছত্র সত্তা—স্বকীয় শব্দবিন্যাস বা পদন্যাসে বিস্ময় জেগে ওঠে—

এখন তবুও দ্যাখো অমনস্ক ব্যাপারীর হাতে
রিবেটে খরিদযোগ্য, ধ্রুপদী ও নতুন সময়
মিশে আছে, কিনে নাও, কাজে লাগবে হৈয়ঙ্গবীন সুপ্রভাতে।'(ঐ)

সমকালের রূপের এ বিনির্মাণে প্রতিভাত ইমেজের অবিকল্প রূপবাহার, সাতরঙের মাখামাখি—চিনে নিতে হবে 'সংক্রান্তি'। বদল সময় বদলে যাওয়া বিকৃত মন—বিপর্যয়ের পটচিত্র সব আঁকা তাঁর কবিতাঙ্গনে। তাই তো অনায়াসে 'মৃত্যু'র মাঝে কবি খুঁজে পান বিপ্রতীপ 'নিরাময়'—'শেষ অব্দি মেয়েটি আজ পৌঁছোবে কি পি. জি. হাসপাতালে /প্রপিতামহকে নিয়ে, নাকি তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি/ নিরাময় হয়ে যাবে মধ্যপথে?' (এ

আরেক চৈতালি) এমন অরূপরতন নির্মাণে স্তম্ভিত সবাই—'ছায়ার সঙ্গে ছায়া জুড়লে ভেসে উঠবে নাকি/ গোটা মানুষটাই?'

ব্যক্তিগত শোকের মরমী ব্যালাড 'আমার মেজভাই'—'পাশের ঘরে যিনি/চলে গেলেন ফিরবেন না', কবি চিত্তে আশ্চর্য অবলোকন——'এখন যেই দেখি/কাজরীমেঘ ককিয়ে ওঠে তিনটে ডাহুক ডাকে/ আমার নদীর বাঁকে'—একটা নদী—একটা জীবন, যেভাবে বহমান থাকে—কৈশোরের সঙ্গলাভ; পক্ষীসঙ্গীতের বিশেষ সুরে স্বনিত বেদনার লয়। কবিতালালন কি থেমে যাবে? রুদ্ধ হবে, শোকের পাথরচাপা 'গড়খাই'? কীভাবে চলবে আবার সেতুবন্ধন—কবির হৃদয়ের বীণ বেহালার ছড়ে যেন বিস্রস্ত। তাই অকপট স্বীকারোক্তি—'মা এসে রজন থেকে ধুলো-মাখা আমার এস্রাজ/ধুয়ে ফের বেঁধে দিলে সব সময় কবিতা লিখব।'

এমনই বিপন্ন পৃথিবীতে যখন 'মৃত্যু ছিল ওৎ পেতে/ মন্দিরে অন্দরে' তখনও ব্যক্তিগত আর্তলিরিকে সংবাদ ও সাংবাদিকতার প্রহসন কবিতার আশ্রমে তীব্র কটাক্ষে শিল্পশ্রী রূপ পায় :

'মৃত শহরের মধ্যে শুধুমাত্র সাংবাদিকদের
গাড়ি চলে যায়—
কিছুই ঘটে না, তবু না-ঘটা দুর্ঘটনার জের
নিয়ে
সমাচার ইনিয়ে বিনিয়ে
কফিন-ফিটনগাড়ি চলে যাচ্ছে। মরুময়তায়
এক নতুন কাগজ বেরিয়েছে" (কাগজের গাড়ি)

শোকে পাথর হৃদয়, তবুও 'শিশিরের নিভৃত শিকড়' যখন কেউ হাঁসুয়া' দিয়ে কেটে নেয়—তখনও কি নিশ্চুপ থাকতে পারে? কবিমন? এই সব আলোহীন রাজপথে তাঁর নির্দিষ্ট অভিযান—একক আন্দোলন চলে। যেন যুত স্তরান্তর পরস্পর দৃশ্যবিন্যাসে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সারস্বত সৃষ্টি। চেনা বিষয় কেমন অচেনা শিল্পসুষমায় নান্দনিক হয়ে ওঠে। তাঁর কাব্যপ্রযত্নে সহজ ও গভীরে মনস্তত্ত্ব সুস্পষ্ট দর্পণে পাঠকের হৃদয়ে পল্লবিত করে—

'আজ সৈন্যদের ছুটি; ময়ূরপালক গুঁজে নিয়ে
মাদল বাজিয়ে ওরা বনে গেছে মৃগয়াবিলাসী।
এরকমই হয়; সৈন্য ছুটি পেলে বাধ্য হয়ে যায়
নারী বিদ্ধ করে আনে, তবু তৃপ্তি পায় পুরবাসী।' (শশব্যস্ত দশটা খরগোশ)

ক'জন স্রষ্টার এমন সৎ-সাহস আছে? কী সমুদ্র-মেঘ দুই ধারে! দিগন্ত বিস্তৃত। এই কবির আন্তর্জাতিকতা বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র—পৃথিবীর কোনো রাজসক্তির অনুগত নন তিনি—নির্দ্বিধায় শব্দব্রহ্মে ঘোষণা করেন। মূল্যবোধের নৈতিক প্রতিষ্ঠা—'এইবার অন্তত যাঁকে ভোট দেব তিন কালেও/তাঁর জিতবার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই।' এই নির্মম সত্যসিঞ্জিত তাঁর কবিতার ভাস্কর্য নির্মাণ। যেন কোনো এক অমলিন স্থাপত্য নির্মাণ চলে শব্দের হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে। কখনো বাটালি দিয়ে চিত্তমন্থনের অস্ত্র ঝনঝনি তোলেন। সে তো শিরদাঁড়া সোজা করা সৈনিকের বুক—দৃপ্ত—দৃঢ়পিনদ্ধ বন্ধুকের নিশানা—ট্রিগারে আঙুল রেখে উচ্চারণ করেন—

না, এভাবে মানুষ কখনোই ফুরিয়ে যেতে পারে না—
শেষবার বাঁক নেবার আগে
অনন্ত এক বিদীর্ণ কিংশুক
উত্থাপিত করে শূন্যে," (আরেকটি মৃত্যু)

বারে বারে উচ্চরবে সত্য ও সাহস পাশাপাশি কাব্যরক্তে ধ্বনিত হয়। বিবেকের স্পষ্টোদ্ধত পরাগরেণু পাখির কণ্ঠে সুর হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দিক থেকে অন্তে—নিষ্প্রভ আঁধারে কবিতাযাপন যে সুচারু পটভূমি গড়ে তোলে—সে কেবল অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, পাঠকও আপ্লুত মগনে চিরায়ত চিত্রকল্পে উপলব্ধি করে—

'তবুও বিশ্বাস রেখো। বিশ্বাস এবং আশ্রয়ের
কোনোই সম্পর্ক নেই, যেমন প্রেম ও যৌনতার
মধ্যে কোনো অন্তর্মিল-স্বরসাম্য থাকতেই পারে না।'

(কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে)

—এই 'স্বকল্পিত জীবনীই ঋজু চলন, চিরকাল শিখরসঞ্চারী, বাংলা সাহিত্যের অলিন্দে যেন একা যুবরাজ। অন্যরকম উত্তরণে দিশারী কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। অনর্পিত মেরুদণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকেন শ্মশান-সৈকতে। সব বিকল্প চূর্ণ করে যেন অন্য এক অবিকল্পের সন্ধানে তাঁর কবিতাশ্রম। সত্যিই 'ধ্রুপদী গান সাঙ্গ হলেই আসল মজা'। তাঁর পদবিন্যাস শৈব সন্ন্যাসীর শীর্ষ ছুঁয়ে পৌঁছে যায় বিশ্বের নানা প্রান্তে। কবির স্বগতোক্তিতেই তাঁর কবিতা সৃজনের কলাদৃশ্য সুস্পষ্ট :

বিবৃতি দিতে যাব না, শুধু যখন আমার কুয়াশাকে
রোদঝাপটে ঘিরবে তুমি জানতে পারবে আমার সব কথা"

(রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ)

তাঁর কবিতাবৃত্তে ঘুরতে ঘুরতে দেখি কী অনায়াস দক্ষতায় অন্তরীণ দ্রোহ অগ্নি স্ফুলিঙ্গের

মতো ছিটকে পড়ে প্রতারকের দিকে—'মেহনরত মোহান্তেরা এখন/ দিগ্বিদিকে মহান পুরুষ কার্ল মার্কসের নামে/ লেলিয়ে দিচ্ছে খচ্চরদের।' কী অসাধারণ তিরস্কার, সামান্য বিবেক থাকলে অপমানবোধে ঐসব মেকি নকল নেতারা আত্মগোপন করবেন।

২.

মুগ্ধতার স্ফূরণ :

এবার একটু অন্যভাবে অবগাহন চলতে পারে—পংক্তি থেকে পংক্তিতে যাতায়াতের অন্বয় গড়ে তোলা হোক—কবিতা থেকে হয়তো বা কবিতার গঠন।

'বাগদত্তা' কবিতার সরস্বতী মূর্তিটি রমণীয় কমনীয় রূপদর্শী নয়, কে নেবে? গড়িয়াহাটের মোড়ে 'বুলভারে' একা অবিক্রীত, পরনের শাড়ি বিস্রস্ত—হাঁটু আর পায়ের পাতার মাঝখানে থতোমতো'। হাঁটতে-হাঁটতে আরও কাছে গিয়ে দেখি কী দেমাক তার! প্রকৃত প্রজ্ঞা যার সে এমনই অবিক্রীত থাকেন : 'অহংকার ঝরছে তার চোখে-মুখে।' দৃঢ় চিত্ত, সংহত হিমালয় যেন 'গরঠিকানিয়া' কবি বাড়ায়ে হাত যেন কবেকার 'বাগদত্তা'। 'শাড়িটা একটু দক্ষিণী ধরনেই গুটিয়ে পরেছে'।—বুঝতেই পারছেন মালকোছা মারা বাংলা পুরুষের মতো। 'কবিয়ালের সাথে তার 'অসবর্ণ বিবাহ'। চালচুলোহীন—সাহসী নারীকে নিয়ে কবিয়ালের নতুন জীবন—বিত্তহীন। এ জীবন সহজ মসৃণ রাজকীয় নয়—'এবার তাকে এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় হাঁটতে হবে।'

'পুড়ুক আমার কুশপুতুল' কবিতার শিরোনাম লক্ষ করুন, কী ব্যঙ্গ! তীর্যক সম্মতি নাকি স্বতোৎসারিত স্বীকারোক্তি! যখন রাত্রি ভোর হয়, হালকা হয় শরীর চোখের অবাড়ে তারায় তারায়, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার মাথায় চামর দোলাই—কেউ দেখতে পাবে না। তুতুল জামদানি গায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল কবির কালাপানি যাত্রা, শুধু অদৃশ্য চতুরালি? হঠাৎ ধোয়া তুলসিপাতা হয়ে সাঁতরাগাছির 'বৈষ্ণবদের গ্রন্থাগারিক' ভূমিকায়—এ কি শুধুই ভদ্রতা।

বুর্জোয়া শ্রমণ? এ তো একটা নমুনা মাত্র। তারপর বাঁকুড়ের গ্রামে তো অজ্ঞানীদের কাছে জ্ঞানী স্কুলমাষ্টার—জমিয়ে চলছে রকমারি। চোখের সামনে পুকুর চুরি হলেও, 'পার্বতীহরশৃঙ্গার প্যানেল' চুরি করে টুরিষ্ট, চোখের সামনে—তবু নীরব নিস্পন্দ—রাজা নেতা ক্যাঁতা সবাই।—এ সবকিছু 'জানাজানির ভয়ে', আরও আছে। কলঙ্কিত কবি আদিখ্যেতায় 'অদূরে দূরে' পণ্ডিচেরির কবিবন্ধুকে এনে দেয় তার জন্য রাখা পুরস্কার—সাজানো, যেমনটা হয় আর কী! সিংহাসনের কাছাকাছি কবিতা অকাদেমী—চেয়ারম্যান হলেই সব হয়।—স্বাভাবিক, কলকাতার প্রবাসী কবিবন্ধুদের তো রাগ হওয়ারই কথা। তারপর বিক্ষোভ, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজপথ, চৌদিকে তার চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজানো—এ তো 'এক গীতিকাব্যের ক্ষুদ্র প্রদেশ'—'গহন রাত্রিবেলা হস্তগত—তবে আর কী—জয় তো অনড়,

হয়তো কোনো এক সুবোধের পাশে মাছি ভন ভন করে, এত কিছুর পরও ঘুম পায়?—তবে কোনও ক্ষোভ-বিপ্লব তাঁকে ছুঁতে পারে না, পাবলিক তাকে অশরীরী আত্মায় ঘিরে ফেললেও চন্দনের ধোঁয়ায় আবেশ অটল। কানে দিয়েছি তুলো, কত কিলোবি কিলো। তাই তো সৎ সাহসী কবির ব্যঙ্গোক্তি—'পুড়ুক আমার কুশপুতুল আস্ফালিত চন্দনের ধূপ'।

'আপেক্ষিক' যতটা না আপেক্ষিক, তার চেয়ে অনেক বেশি সুস্পষ্ট, দেশ-কাল আলিঙ্গনে গড়া—"বাতিদান হাতে নিয়ে ঘর থেকে ঘরে/যে ঘুরে চলেছে তার সমস্ত সঞ্চার/থেকে যেত, না যদি থাকত অন্ধকার"—সূচনা কী চমৎকার। দৃশ্যমান উপমা। এমন উদাহরণ ভাবের পূর্ণিমা, অমানিশাকেও আলোকিত করে। যদিবা জীবনে আসে সংকট—বিপন্ন-আশ্রম—যদি না থাকত অন্ধকার, তোমার কি প্রয়োজন হত 'বাতিদান'? যে আজ 'শ্রমণ', প্রথম জীবনে তো সে ছিল আশৈশব প্রেমিক, এই ক্ষমতাই তো তাকে 'দৃপ্ত করে সংরাগের আভা'—সিদ্ধ সন্ন্যাসী। যে নারী কয়লারাতে বাতিদান হতে ঘুরে চলেছে কলুর বলদের মতো, তার মতো তার পথে দেখা হয়ে যাবে 'এক অমাবস্যা রাতে'।—এ মিলন তো শাশ্বত-অনপনেয়।---কী অপূর্ব বিস্ময়বোধ! অথচ কী সহজ চেনা আবেগ—আবেশ—কবির চেতনায় রাঙা হয়ে উঠল।

গোধূলিময় একটি যুগল (২) এক বিস্ময় বোধ : 'এখন বাড়ির ছায়া বাড়ির উপরে ভেসে থাকে।'—বেঘর-এর এমন অরূপ ছবি কে দেখাতে পারে? একমাত্র অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। শব্দের এমন রূপদর্শী মায়া গড়ে ওঠে তাঁর ভাবদ্যুতিতে। প্রাকৃতিক—এ জীবন, ইশারায় দেখা যায়, ভাঙা ঘর, ছায়া কেবল ঘরের ওপর কল্পিত মায়া—ঐ যে মনে পড়ে ওইখানে ছিল তার দেবালয়। চোখ খুলে দেখো, 'দেবতারা' (স্বচ্ছল, বিত্তবান—সম্ভ্রান্তরা) এখন আশ্রয়চ্যুত, তাই শরণার্থী—'ভেসে থাকে বাড়ির ছায়া।' 'কেউ কেউ ছত্রীসেনা আজ অবুঝ, নেমে এসেছে তাদের 'দেবায়তন'—সাজানো সুরম্য—অট্টালিকা থেকে 'ছায়াচ্যুত' ওরা। তাই পুনর্বাসন লোভে 'তাদের' কায়ারূপী 'ছায়া' ছাই। 'মানুষ এখনো, কিংবা এখনই দাক্ষিণ্যপরবশ'—এমন অটুট মানবিক মুখ কবির, মানুষের'—রেশন কার্ড থেকে প্রাপ্য যেন নলেন গুড়ের 'কিছু অংশ' 'ছেড়ে দেবে'। 'পাকাপোক্ত নয়' আজও মানুষের আশ্রয়—ঝড়ঝাপটা আর প্লাবনে নাকি জেগে আছে জলছাদ! তবুও মানুষ 'জলসত্র' খুলে দেয়—'দেবতারা মেটাক পিপাসা'। কী উদার', কী অমূল্য মানবপ্রেম—'তার পাটাতনে' ঐ দেবাত্মা এবং মানুষ জায়গা বদল করেছে,—প্রত্যয়ী কবিমন।

প্রবল বানে বদলে গেছে চিত্র—মানচিত্র—জলরাশির মাঝে ডেকটা দেখা যায়—'বাড়ি না জাহাজ'—এমন ভয়ঙ্কর চিত্র। বাঁচার আর্তিতে উপরতলা আর নিচুতলা একাকার। বরং নিচুতলা এখন ভগবান। অদম্য উচ্ছ্বাসে কবিমন উতলা—"উতুঙ্গ খেলার প্রথমার্ধ শেষ, দ্যাখো মানুষ কিন্তু জিতে আছে।"

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

'গাজন', এও এক কবিতা। চিরায়ত সংস্কৃতির সারাৎসার নবরূপে। চৈত্রের পবনে খরতাপে অগ্নিশ্বাসে সব হলুদ কত রাজা—উজির—বরকন্দাজ—মহারাজ——'কত জন্মেঞ্জয় যযাতি অম্বরীষ কত নহুষ ভস্মিভূত, হিসেব কেউ রাখেনি', আত্মগ্লানিতে যেন 'ধুতরা শুধু ধৈর্য বিষে ফেনিল'। এ কঠিন পরিস্থিতিতে অন্ত্যজ—প্রান্তিক মানুষের লড়াই—অসম—নির্মম পরিণাম। কবি চান—"হে ঝরাপাতা ঝরবি যদি ঝরিস পাতা শব্দ করে ঝরিস"। তোমার আসা-যাওয়া তো নিত্য লীলা গাজন—'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে' (মধুসূদন), অথচ কর্মই অমর। জীবনের জ্যোতিপ্রভা সদা দীপ্যমান। কবি বিস্মিত—'লুপ্ত হয়ে যাওয়াই যেন আজও 'অহর্নিশ মজ্জাগত নিয়ম'—এই নিয়মের নিগড় ভেঙে ক্ষুদিরাম পতঙ্গ হয়েছিল, 'রমেন সৌতি অনিন্দিতা নরেন্দ্র আর সতীশ' 'ঐ অগ্নিকুণ্ডে ধায়', জীবনের দায় থেকে এই যে আত্মোৎসর্গ যাপন, সেখানে যেন অস্তিত্বের দাপট থাকে—'ঝরিস পাতা শব্দ করে ঝরিস'।

যার শরীর পোড়ে অঙ্গারে, সূর্যতাপে—হর্ম্যরাজি মাথা তোলে বনবাদাড়ে—সেই তুমিই 'ঝরাপাতা'—কবির প্রাণে অকুণ্ঠ আকুতি—'দোহাই, পাতা, ঝরতে হলে শব্দ করে ঝরিস'।—এ তো মর্মরিত জীবনের পরম পথ—কবির অনপনেয় দর্শন। এ ডাক বয়ে যায় দিক থেকে অন্ত্যে—প্রান্তিক মানুষ—তোমরা, আমরা—শুনছ, কবির আহ্বান—বেঁধেছেন নতুন গাজন গান—জীবনের তান—'ঝরিস পাতা শব্দ করে ঝরিস'।

'শ্রীমদভাগবত' তো জীবন্ত মিথ। এমনও কবিতার শীর্ষনাম, এভাবেই হয়ে ওঠে। 'শ্রীমদভাগবত'—এই গ্রন্থ সবার জানা—যেন জাতীয় প্রেক্ষাপটে দেশজ দর্শন, হে দেবরাজ ইন্দ্র তুমি যেন সংশয় দ্বিধাদর্পণে বন্দী, কে বা কারা করেছে ফন্দি। কবিতার শুরু দেবরাজ ইন্দ্রকে 'মঘবন' সম্বোধনে, অপূর্ব সুন্দর উপমাযোগে বক্তব্য উপস্থাপন—'দারুময়ী নারী কিংবা পত্রময় হরিণ যেন স্বইচ্ছায় নাচতে পারে না, শুধু কেউ সুতো নাচালে তখন অঙ্গ সঞ্চালন করে যায়, 'এভাবেই আমাদের করতে চেয়েছিলে নিয়ন্ত্রণ।'—এই অবস্থার কি পরিবর্তন ঘটেছে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় যে অমানবিক চিত্র উপস্থাপন করেছেন—এ যেন তারই কাব্যরূপ, স্বল্প পংক্তিতে গোটা শাসন ব্যবস্থার প্রকট ছবি। কিন্তু এর বাইরেও কবি দেখছেন আলাদা, আজকের পৃথিবীতে তিনিও (দেবরাজ), ক্ষমতাহীন—'আসলে তুমিও কিন্তু ক্ষমতা খুইয়ে অসহায়—'। কী হবে ঐ দর্শনধারী 'শ্রীমদ্ভাগবত' গীতার ভূমিকা।

তোমার ইচ্ছায় যেন তারাময়ী নাচে, নাচে জগৎ—'নাচতে পারে না 'স্বইচ্ছায়', অথচ যাদের আছে 'দিব্য অনটন', তাদের তো এটাও অহংকার। কবির বিস্ময় যেন—এ কী শুনি যমরাজ! তুমি অনিবারণীয় ভগ্নদূত! সিংহাসনের ঐশ্বর্যলুপ্ত—অসহায়? তুমি শাসক—তুমিই বিচারক—অথচ হায়—। প্রত্যয়ী নন্দনবিকেকে আবার ব্যঞ্জনা—এ কি ব্যঙ্গ, নাকি স্পষ্টতর

নৈতিক মূল্যবোধের জয়—শ্রেণীর জয়? 'মাথানত বেতসরা' কেমন উঠে দাঁড়ায়, 'আবহমান কবিতার উৎসে' গরজে গরজে 'স্বনিত'—'আমাদের অন্তত রয়েছে দিব্য অনটন'! 'হে মঘবন', —গিরিখাত থেকে উঠে দাঁড়ায় মানবজাতি—মহামানব, আর তুমি? সমূল বিচার প্রার্থী।

কবি যেন বলতে চান—উপেক্ষিত, বঞ্চিত বর্ণহীন মানুষের সংরাগ সারস্বত সাধকের অন্বয়—তুমি তো অনিকেত। 'আপোগাণ্ড হলেও আমরা পায়াভারি'।

সমাজপতির দল : এ এক অনন্য কাব্যপ্রতিমা। সমাজপতিদের রূপ—অরূপ নির্মাণ। পাঠক প্রত্যক্ষ করে : কত রঙে কত ঢঙে চালচলন---বেশ চটকদার। কেউ প্রতিক্রীয়াশীল—প্রতিহিংসাধারী, 'স্পর্শকাতর', 'কার বিশ্বাস গেরুয়া কার কান্নামেরুন' —শব্দের কী অনিন্দ্য প্রয়োগ! কেউ বা সাদা—নিপাট আন্তরিক, অথচ মিছিরির ছুরি, কেউ বা ধর্মভীরু। এমন 'দশ-বারোজন সমাজপতির দল চত্বরে একপাক ঘুরপাক খায়, তাদের মুখে তুখোড় অনর্গল', ভীষণ হৃদয়গ্রাহী---'সৌজন্যের চাঁপা জ্বলে' চোখে মুখে, লাল—নীল—সুবজ—সব মিলেমিশে 'সৃষ্টি করে সর্বনাশ সেতু'— মীমাংসা —'ধূসর বৈতরণী'। তুমি না পারবে উড়তে, না পারবে থাকতে এই সমাজে। সমাজপতিদের চরিত্র নির্মাণ অপূর্ব। এই যে কবিতাঘর যেন গুরুতর সংবাদ।

'বহিরাগত'—গভীর ভাবের দহন এ কবিতা। সংশয়—দ্বন্দ্ব—যুগের খেয়াল আর পরম্পরার সংঘাত। নিময় ভাঙার নিয়ম যেন অভ্যন্তরঃশুচি---শিকড়ের গভীরে অন্তর্লীন—'নীল অন্ধকার'। ওদের মন্ত্রপুতঃ অধিকার—'এ উপাসনা'! কবিমনে প্রশ্ন—"তবে কি উপাসনাও সন্ত্রাসবাদ গণ্য এখন?" ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি বর্তমান জগৎ—নাকি আজ 'বৈধ যত মূল্যবোধও গর্ভগৃহের আড়ালে—যাপন করতে শিখতে হবে ওদের মতো'? এই কবিতাকণিকার দ্যুতি যেন আচার্যের।

যখন সূর্যালোক উতরোল হবে তখনও কি ওরা প্রকাশ্যে থাকবে উতল, ওদের ঐ উপকল্প, উন্মূল হয়ে কত রাত আঁধার রাখবে। দরজা ঠেলে অভাবিত কবির প্রবেশ—ছন্দভাঙা সুডৌল উপকথা—"হাঁটুজোড় ভেঙে উঠে এগিয়ে এসে বলল', বসুন, 'আসুন, চা খাবেন? মেয়েটি তার বক্ষে ঢেকে মিত আগুন অতিথি বরণ করার ডৌলে এসে বলল, 'আমায় তুমিই বলুন'—সত্যি কি এ সৌজন্য, ভদ্রতা?'—কী অনায়াস নিপুণ বারাঙ্গনা—একটুও জড়তা নেই।—তাই 'আমার কেমন ঘুলিয়ে উঠল শরীর, ভাবলাম এ তো অমিতাচার'—'বললাম : পালাও, নইলে গুণ্ডা দিয়ে, উঠিয়ে দেব।' —কিন্তু এও কি এত সহজ? এও কী সংশয়—বৈপরীত্য নয়?—কবির এ উল্লোল কীভাবে সম্পন্ন হবে! বেদনার উষ্ণাংশুতে দগ্ধ কবিকণ্ঠ 'ওরা যে থাকবে বলেই এসেছিল আমার পাড়ায়।'—মরমী চিত্ত, শব্দ সংশ্লেষে গড়ে তাঁর বেদনার জলছবি। 'বহিরাগত' শব্দে কেমন টাল খায় তাঁর অন্তর—দোদুল্যমান হৃদয়; সময়ের

উন্মার্গগামীতার প্রতি বিরূপ, আবার এভাবে কি উপেক্ষা, উৎপাটন সম্ভব? এমনই গড়ে ওঠে কবিতার ভাস্কর্য।

যদিও মনে হয় নিবিষ্ট কবি—আত্মার ধিক্কার প্রকটিত, উষ্ণ মানবিক অপত্যেও ঠাঁই নেই ব্যাভিচার—উদগ্র বেনিয়ম। তবুও প্রীতিরসে জারিত হৃদিমাঝে আধূত আদহন চলে পাড়ায় পাড়ায়—সংশয় উঁকি দেয় ঐতিহ্যের ডালে; প্রজন্মের ফাঁকে কি এই আত্যন্তিক বিস্ময়! ভাষান্তর এ 'ডৌলে' কি নিগড় ভাঙাই আধুনিক মূল্যবোধ?—এই প্রশ্ন যেন নিবিড় ভাবের গোপন কক্ষ থেকে উত্থিত হয়। 'গর্ভগৃহে' এই নতুন আদত—অশ্বিনী কুমারদের, এই পরিণতি! কাব্যপ্রযত্নে কিন্তু কাব্যলক্ষ্মীর অষ্টধাতু যেন তেমন নয়। তাই কবি ধিক্কার দেন এ নবীন প্রজন্মকে।

'রাজধানী'— এই শব্দবন্ধে নিহিত বিস্তার কবিলোচনে অদ্ভুত রহস্য প্রকাশিত। 'নোটারি পাবলিক' কত সহজ অথচ গুরুত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থায়! অথচ গুরুত্বহীন, গাছতলায় থাকে, খোলা আকাশের নিচে—সহজপ্রাপ্য অথচ সরকারি তকমা পাওয়ার কী অনন্য স্বীকৃতি। যেখানে সময়ের কোনও দাম নেই—'অহেতুক'। 'এখানে—রাজধানীতে—সময় শুধুই যায় ক্ষয়ে'। আচ্ছা, শহর আর নগরে কী ফারাক আছে? আর 'রাজধানী' মানেই নগর—নগর মানেই বিধিবদ্ধ শাসনব্যবস্থার হদ্দমুদ্দ কারখানা—সেখানে শোকটোকের কোনো মরমী জায়গা নেই, থাকেও না, শুধু যাপানের সুরম্য পাহাড়, ছলাকলা। কবিভাষ্যে 'অশ্বত্থপুঞ্জের নীচে' 'নোটারি পাবলিক' বসে থাকে, থাকে দালাল—সঙ্ঘবদ্ধ 'ছয়জন'। 'দৃশ্যটা' কল্পনা করো : তিনদিনও কাটেনি আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর, তলব পড়েছে সেই কথা,/ মাকে সই করতে হবে নোটারির কাছে—লৌকিকতা"—কী অনন্য না? এ হারাসভ্যতা, মায়াসভ্যতা যেন নরম রৌদ্রের ডানায় ভর করে আসে 'শোকের শিলমোহর' নিয়ে। কী অসহনীয়—এটা নাকি সুরভি গণতন্ত্রের আর্তনাদ, কি আহ্লাদ।

শুধু একটা 'শিলমোহরে'র আশায়—'মাকে নিয়ে ভোর থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠায়(এখানে—রাজধানীতে সময়—শুধুই ক্ষয়ে যায়)"—ভাবুন কী আবদার, কী যন্ত্রণাদীর্ঘ শাসন—অচৈতন্য আবেশ! শোক—রোগ-ভোগ— যাই নিয়ে আস না কেন এ রাজধানীতে সময় মূল্যহীন, এ অচিনবাবু তোমাকে চেনাবেই নাকে খত দিয়ে, অথচ এ যেন অন্য চেনামহল; অচেতন এই সুখপুরী, যেন ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়।

"যেই চলে যাচ্ছিলাম, দাপট দেখিয়ে ছয়জন দালাল 'বাঙালিসুলভ অভিমান অতি প্রত্যবায়—মৃত্যুর দলিল আছে? ব'লে আর অপেক্ষা না করে যা ছিল ছিনিয়ে নিয়ে স্টাম্পের কাগজে হিজিবিজি টাইপ করিয়ে বলল, 'তোমাদের কাল খুব ভোরে নিলাম করানো হবে, আপিল করবে কী ভাষায়? হিন্দিভাষী এসব অশথ বোঝে না ইংরিজি।"—কী অসাধারণ!

দেশের রাজধানীর অমানবিক, প্রহসন, অগণতান্ত্রিক অবস্থার নিপুন চিত্রণ। যেন কোনো চিত্রনাট্য কবিতাঙ্গনে। রাজধানী—শহর—নিয়ম আছে ভাই, যা কিছু আনবে সাথে নিয়ে যেতে নাই—। হিন্দি পাখোয়ারা এমনি চলে? অচিত্ত যজ্ঞপুরী 'হিজিবিজি' মামদোবাজী শহর জানা চাই।—এই ছন্দোময় দ্যুতিময় শহর তথা রাজধানীর মূরতি রচনা করেছেন কবি।

এক অপূর্ব বেদনালিপি 'অকৃতজ্ঞ' সূর্যমুখীর ব্যালাড'। যেন এক বীরগাথা — গীতিকা —গাথাকাব্য। শিল্পীর সম্মান—মর্যাদা—সম্ভ্রম যা কিছু প্রাপ্য, সবকিছু হয় মৃত্যুর পর। জীবিতকালে জোটে অবজ্ঞা—তীর্যক সমালোচনা—কিংবা উপেক্ষা। এমন অকপট সত্যের 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' মূর্তি কবি-শিল্পী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত রচনা করেছেন এ কবিতায়। বাংলা কবিতালোকে আমরা জানি কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনে এমনই ঘটেছিল। এখানে অন্য চিত্রময়তার ইতিহাস—'জীবদ্দশায় একটিমাত্র ছবি কোনোক্রমে বিকিয়েছিল তার, ভাইয়ের দেওয়া ঈষৎ মাসোহারায় সেই শিল্পীর স্বগত সংসার"। জীবিতের কী প্রয়োজন? শিল্পীর জীবন তো আধমণ-বন্ধক দেওয়া, উপবাস যাপন—উপসন্ন্যাসগত। জীবদ্দশায় গুরুত্বহীন গহন রাতে গোপন প্রলাপ। কবি যেন এসবই ভাবছেন। তাই মনে মনে প্রশ্ন করো—তুমি শিল্পী? ভিনসেন্ট ভান গগ? কে চেনে? কী চাই তোমার? কলা? পাগল?—সারস্বত, সাধনালক্ষ্মী স্মরণ করো—শরণ করো। যাপনের যা কিছু উপ্ত—ফলনের আশা ক'রো না। তাই তো সারাজীবনে কোনোক্রমে একটি ছবি বিকোয়। এ উদাহরণ সবারই জানা। তবু শিক্ষা হয় না। বিমর্ষ শিল্পীর আত্মহনন—সেও যেন নিয়তি। শিল্পীর বীরগাথা—ব্যালাড গাওয়া হবে 'পরলোক' 'পর।

ভাস্কর হওয়ার উপেবশ—'আত্মহত্যা করার আগে' সূর্যমুখীর সাতটি ছবি' আঁকে ভ্যানগগ—তারপর কর্ম্মকারের কর্মকাণ্ড জগৎজোড়া খ্যাতি—'সাত মিলিয়ন ইয়েন দিয়ে জাপান সেই সিরিজের একটি নিল কিনে"। কষ্টিপাথরে জ্যোতিষি যেন লিখে গেছে—"জীবদ্দশায় বাঁচতে দেওয়া মানা।"—এ কি সত্যিকারের ভবিতব্য? কবি কখনো দেখান অতিদূরে থেকে অকবি পান পুরস্কার, কখনো দেখি 'শিল্পীর' বাঁচতে দেওয়া মানা'। সৎ সাহসী কবি অলোরঞ্জন দাশগুপ্ত এভাবেই কটাক্ষ করেন শাসককে।

৩.

কবিতাবিশ্ব :

তাঁর কবিতাবিশ্ব—ভাবনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। "কোথাও কি কবিতার মহাবিশ্ব আজকের ইহজগৎটিকে স্পর্শ করেও নিজের কাছে সৎ হয়ে আছে? কবিতা নামক মহাবিশ্ব যদি মানুষের বোবা পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে বসে তাহলেই কি সে তার জাত খোয়াবে? কবিতায় যদি ঘটমানতার মর্মে দার্শনিক একটি বেদনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তাহলেই কি

তাকে—বঙ্গীয় এলিয়টের পূর্বাচার্যরা, যেরকমটা ভেবে থাকেন—তার অকাল সমাধি প্রণীত হলো?"—কবি যেন নির্দিষ্ট করতে চাইছেন 'বঙ্গীয় এলিয়ট' অর্থাৎ বিষ্ণু দে—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখদের পূর্বাচার্যগণ—তথা রবীন্দ্র যুগের মহাত্মাগণের যে সুন্দরের অর্চ্চনা সে কি শিল্পশ্রী হারাবে? না কখনো না। তারা সেই যুগেই সম্ভব ছিলেন। এলিয়টের সময় থেকে কবিতার মহাবিশ্বায়ন ঘটেছে—ঘটেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—তারপরও অনেক ঘটমানতা মানুষকে বিব্রত করছে। তাই কবি বলছেন, "কী হচ্ছে এখানে কবিতায়? যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনবরত আর্তনাদ করে চলেছেন কবিদের আচার্যবৃন্দ হ্বান্টার, য়েনস, গুণ্টার গ্রাস, হ্বলি সারা, হানস্, মাগনূস এনৎসেনস বার্গার। শেষোক্ত মানুষটি নানাভাবেই এযাবৎ তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছেন। মজাটা হচ্ছে এই যে, গলদ তাঁর কলমদানিটিকে শূন্য করে রেখে গেছে।

তিনি আর লিখতে পারছেন না।...এর চেয়ে মর্মান্তিক আর স্বাভাবিক কী হতে পারে?...অমিয় চক্রবর্তীর মতো অতীন্দ্রিয়ী মানুষও একদা পর পর দুটি যুদ্ধের ফলে বিপর্যস্ত তৃতীয় পৃথিবীতে কেন আর কবিতা লেখা হবে এই মর্মে সংশয় জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাঁকে আমি তাঁর অপ্রতিরোধ্য ভক্ত হওয়া সত্বেও, সশ্রদ্ধ প্রতিবাদের সুরে জানিয়েছিলাম, এখনই তো যথার্থ কবিতা রচিত হবার সময়।...মানুষকে এখন রক্তপ্লুত গ্লোবের নীলাভ রশ্মিতেই নিজের অস্তিত্বের স্বরলিপি খুঁজে নিতে হবে এবং সেই স্বরলিপির নাম কবিতা।"—এই ধ্রুপদ চিন্তা যেমন কবি আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতার আধার তেমনি তিনি 'অপরাপর পূর্বসংস্কার'—এর প্রতি শ্রদ্ধাও রেখেছেন। তাই তিনি অনায়াস দক্ষতায় বলেন, 'কবিতায় এখনো ফুল থাকুক, পাখিও থাকুক—কিন্তু সেই সঙ্গে তার মধ্যে যদি সদ্য ঘটে যাওয়া প্রলয়ের পরিমণ্ডলে উচ্চার্য শোচনা যদি বিবেচিত না হয়, তাকে আমরা কোন অর্থে এই সময়সন্ধির কবিতা হিসেবে দীক্ষিত করব?"—কবি নিজেও কবিতাশ্রমে রেখে গেছেন এই সত্যভাষণও।

এজন্য তাঁর কবিতার নাম হয় 'দুগাশংকর কুয়াশা খুঁজছে'—কুয়াশা—আলো আঁধার—জীবনযন্ত্রণা। সে কি মুক্তি? না কি ধাঁধা। এহেন দুধঘন ফগ অনপগত, প্রত্যকায় যে কবির ক্রান্তিপাত, সে দীর্ঘায়ত ক্রান্তিবৃত্তে দ্বিধাহীন। কথাচিত্র নির্মাতা কবির বন্ধু দুর্গাশংকর, তার খুব প্রয়োজন—'তিন মিনিটের শট', যেখানে দ্বিধা আর বিশ্বাস টালমাটাল খেয়ে আবার নিজের জায়গায়, অথবা ভূমিকা বদলে নেয়। তবুও 'সুদক্ষিণে' কম্পোজিশনের সুযোগ নেই, উত্তরমুখী পাড়ায় দুধঘন কুয়াশা—কবি ভাবালু, চৈতন্যের—নির্মাতা বন্ধুকে এ কুয়াশায়?—'কী করে আমি তার হাতে রৌদ্রের বদলে শুধুই কুয়াশা তুলে দেব?"—এই হচ্ছে কবি আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের দর্শন।

৪.

কবিতাভাষা :

তাঁর কবিতাভাষাও চমৎকার—স্বতস্ফূর্ত, ধ্রুপদী—অনায়াস গতিময়—সুন্দর। ‘আমার ভিতর দিয়ে ‘বহিত্র’ চলুক তোমাদের’—দীর্ঘ শিরোনাম কবিতার, ‘বহিত্র’—এ শব্দ তো প্রাচীন বাংলার। কখনো নৈঃশব্দে ‘দোরঘন্টি’ বাজিয়ে আসে ভাষা, ‘ছেলেবেলার সহপাঠী, অনেক দিন হয় মারা গেছে’—সরল বেদনায় শব্দচয়ন ধ্রুপদ থেকে যেন নেমে এসেছে গন্ধমাটিতে—‘একা একা কিছুই করতে করতে ভালো লাগে না’—এমন অকপট, সহজ অথচ নিবিড়।

যখন কল্পদ্রুম কবির আকাশ—তখন কী অপূর্ব ভাষা-দ্যুতিতে চকমকি পাথর—‘এখনো এক একদিন যুগল কিরীট গির্জা পার হয়ে যেতে গিয়ে ভাবি, শীতের সকালেও গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের ভান করে দৈনন্দিন ছুঁয়েও সেই সুদূরবর্তিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি...”—কবির এ শব্দমালায় ভর করে আছে এক বেদনার আকাশগঙ্গা।— নিপাট কাব্যস্পন্দিত গদ্যে চমকে যাই। শব্দ ব্যবহারের এ লীলাক্ষেত্র দেখে। কথ্য আর সত্যরূপক যেন—ভাস্কর হয়ে ওঠে। আদি-মধ্য-বর্তমানের অপরূপ শব্দচাতুর্যে অথবা অপ্রচলিত তৎসমে শব্দসাধকের কবিতার আয়াম—আয়াত। এইভাবে দেশ থেকে বিদেশ—নদীপথ থেকে গিরিখাদ—বড় হতে হতে কবি, তুমি ভাষাকে করেছ সমুদ্র—অপদেশ, এ ভাষা নগর না, ভাষার ঐশ্বর্য থেকে আয়াস—শূন্য থেকে মহাশূন্য—জাতিক থেকে আন্তর্জাতিক—সেই তুমি। তোমার ভাষাও অলোকরঞ্জন।

কবিতাবিশ্বে তোমার আলেখ্য আন্তনিও পিকাসো-ভ্যান গগ—সবাই, ‘সময়বিহীন পরিসরের দিকে’। জননী মাদার তেরেসা—যেন একরাশ আকাশ। কখনো ‘আয়না’ লিখেছ, কখনো ‘আরশি’—সব রূপেই তোমার শাশ্বত চেতনারঙ, তোমার শব্দে তোমার ধ্বনিমাধুর্যে ধ্রুব নির্মাণ। এ ধূনক চিরপ্রজ্জ্বলিত। তাই তো বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা ‘রাস্তা কারও একার নয়’ আবার ধুপছায়া হয়—‘তাছাড়া আপনার নয় একচেটিয়া ক্যানিং স্টেশন’। চারদিকে ধূম ধূম কীর্তন যেন বিষম বিড়ম্বনায় তোমার কবিতায় ধুন স্বনিত। কোনো এক ম্যাজিকে তুমি গড়ে তুলেছ ভাষাইমারত—‘যখন ইন্টারভ্যু নিতে গেছি, -ওড়িষী আঙ্গিকে তূর্ণ সে ঘুরে দাঁড়াল, যেন সে—ই মাণদণ্ড।’—এও তো অনন্য ভাষাশিল্প নির্মাণ। এই তো তোমার অনন্য অবধূপিত নির্মাণ:

‘তাঁর পঞ্জরাস্থি স্তরে স্তরে বিনস্ত হয়ে আছে কান্দাহার তক্ষশিলা বোরোবুদুরে, সেগুলি সঠিক শনাক্ত করতে পারলে জানা যাবে মানুষের সভ্যতাকে তিনি কোন কল্লাদর্শের আদল দিতে চেয়েছিলেন,’ (সিদ্ধার্থের জন্মদিন) যেভাবে খুশি সাজাতে পারেন পংক্তি, একটুও টোল খায় না দ্যুতি। ভাষা এবং শব্দ-প্রকৃতি যেন প্রাকৃতিক। তাই তো কবিতার নাম হয় :

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

‘জৌগ্রামে চলন্ত নহবৎ’, আর তার অবয়ব গড়ে ওঠে প্রচলিত কথ্যে—

‘সাইকেল রিকশায় যায় কনেবউ, খুঁটেবাঁধা
নিদবরখানি। ধানকেয়ারির পাশ দিয়ে
চালাচ্ছে টোপর পরা রিকশাঅলা, তার পিছনেই
ত্রিভঙ্গমুরারি বসে শানাইদার যেই-না বাজায়
ভোরের রৌদ্রের সুর, অমনি খুব বৃষ্টি নেমে আসে,”।

বাংলা শব্দের যে মাধুরী আর জীবনে যে আর্থ-সামাজিক উপাদান—তার সঙ্গে যেন লিরিক মিশিয়ে মিশকালো মেঘে ‘নহবৎ’-এর ধুন তোলেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কখনো স্বতোৎসারিত শব্দমালায়, কখনো বা পুনর্নির্মাণে গড়ে উঠেছে তাঁর ভাষাসাগর, যে তরঙ্গমালার বাংলা কবিতার পাঠক ‘কখনো টিনের ছাদে ও যে/রোদ্দুরের জলে অবলীন’ হয়ে যায়। এই সহজাত শিল্পবৈভব চিরকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নজলে ভেসে থাকবে উত্তরাধিকারীর আঙিনায়।

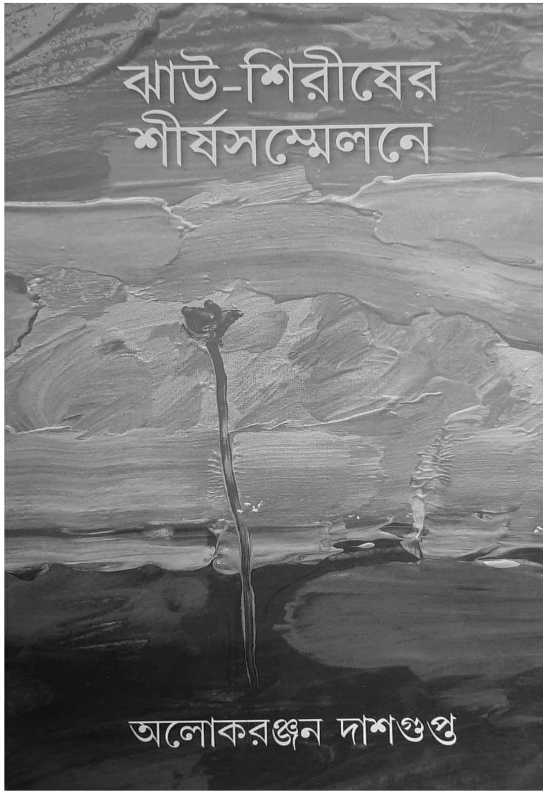

বেলাশেষের গান

বরেন্দু মণ্ডল

অলোকরঞ্জনের কাব্যের গোধূলি পর্যায়ের মুখোমুখি বসে আবারও মনে পড়ে যাচ্ছে প্রথম পড়া তাঁর সেই কবিতাটাই :

"তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হলে
সহজ হবে তুমি আমার মতো,
নৌকো হবে সব পথের কাঁটা,
কীর্তিনাশা পথে নমিতা নদী!
গোধুলি হল।

তুমি যে বলেছিলে রাত্রি হলে
মুখোশ খুলে দেবে বিভোরবিভা
রাত্রি হল।"

ঠিক সেমিনার নয়, ছাত্র বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের শ্রেণীকক্ষে (১৯৯৩) বিকেলবেলায় তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম এক আলাপচারিতায়। কবিতা নিয়েই তাঁর আলোচনা সেদিন কখন যে দেশীয় চৌহদ্দি পেরিয়ে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল সেদিকে আমাদের খেয়াল ছিলনা। কবিতার শব্দ চয়নের মতো ওঁর নিজস্ব বাচনভঙ্গি স্বাভাবিক ভাবেই সেদিন আমাদের হিপনোটাইজ করে রেখেছিল, যেমন রাখে। কবিতার কাছে এই শুশ্রূষাটুকু ছাড়া আর তো কোনো প্রত্যাশা নেই। গ্যোয়েটে আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রয়, তাঁদের আলোয় তিনি আলোকিত, সেই আলোই ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। হাইডেলবার্গ থেকে এসেছেন দু'দিন আগে, শরীরটা ততোটা ভালো নেই। বলতে বলতে কাশি ওঠে কয়েকবার, বাঁদিকের কোনার বেঞ্চিতে বসা বিদেশিনী (ট্রুডবার্টা) তাঁর ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় ট্যাবলেট বাড়িয়ে দেন চন্দন রঙের মানুষটার দিকে। ওই বিরতিটুকুর পরেই শুরু হয় কবিতা পাঠ- 'তুমি যে বলেছিলে' কবিতার জন্যই এক মায়াবী গোধূলি সেদিন নেমেছিল কলেজস্ট্রিট জুড়ে। সামনা-সামনি বসে প্রিয় কবিতা, প্রিয় কবির কণ্ঠে শোনা এ তো দৈবাৎ ঘটে। গোধূলি নামে তখন কবিতার ঘোরে তরাজু কেঁপে যায় 'তুমি যে বলেছিলে' এই কথাটাই গুনগুনিয়ে নিত্য ফেরে, কারণে এবং অকারণে এই কথাটাই কখনো কখনো হয়ে ওঠে ধ্রুবপদ।

দুই

আমরা মূলত অলোকরঞ্জনের কবিজীবনের শেষ এক দশক নিয়ে কথা বলব। সেদিক

দিয়ে দেখতে গেলে প্রণীত অগ্নি কাকে বলে তুমি জানো? (২০১১), সে কি খুঁজে পেল ঈশ্বর কণা (২০১২), নিরীশ্বর পাখিদের উপাসনালয়ে (২০১৩), এখন নভোনীল আমার তহবিল (২০১৪), চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো (২০১৫), দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি (২০১৬), তোমরা কী চাও শিউলি না টিউলিপ (২০১৭), শুকতারার আলোয় পড়ি বিপর্যয়ের চিঠি (২০১৮), ঝাউ-শিরীষের শীর্ষ সম্মেলনে (২০১৯), বাস্তুহারার পাহাড়তলি (২০২০)—এই দশটি কাব্যের কবিতাই আমাদের অন্বিষ্ট।

অলোকরঞ্জনের শেষ পর্বের কবিতায় মৃত্যুর অনুষঙ্গ এসেছে বারবার। 'মৃত্যুমদির ভানসি হ্রদের তীরে, আলো আরও আলো, অতন্দ্রগোলাপ'-এর মতো নাট্য-কোলাজ থেকে খনিকটা সরে এসে আমরা যদি তাকাই তাঁর কবিতার দিকে, তাহলে দেখতে পাব জীবনবোধকে তিনি কখনও মৃত্যু-চেতনা থেকে পৃথক করে দেখেননি। তাঁর গোধূলিবেলার কাব্যের শব্দ-অক্ষরে, হাজার সংলাপিকায় যে বিশ্বাত্মবোধ ধরা পড়েছে তাঁর মধ্যেই আছে মৃত্যুর নিভৃত নির্মাণ:

"অতঃপর, যেরকম প্রত্যাশিত, মৃত্যুদূত এসে
আমার গহন গ্রন্থাগারে, আমি দিন শেষ হলে
যেখানে শয়ন করি, সহজ সুন্দর অট্টহাস্যে
আমাকে সংগ্রহ করে নিতে এল।
আমিও তা বলে
তত অপ্রস্তুত নই, তাকে বলি! 'তুমি কি আমায়
জন্ম দিতে পারো? তুমি আমায় কি নিতে পারো কোলে?
তুমি অনুর্বর, তুমি একদিন অপৌরুষেয় হলে
তাহলে তোমার সঙ্গে যাব', শুনে ভারি অপ্রস্তুত
মৃত্যুদূত।"

('অপ্রস্তুত': শুকতারার আলোয় পড়ি বিপর্যয়ের চিঠি, পৃ. ৬৬)

মৃত্যু অনুর্বর, সে জন্ম দিতে পারে না, সে কেবল নিতে পারে—এটাই তার নিয়তি। সৃষ্টির ক্ষমতা নেই তার, সে লালন করতে পারে না, পারে না নিরাশ্রয়কে কোল দিতে। 'বেদ অপৌরুষেয়' মৃত্যু যেদিন অপৌরুষেয় হবে সেদিন কবি তার সঙ্গে যাবেন, এখন এভাবে যাবেন না অসময়ে। অপ্রাপ্তযৌবন কিশোর নচিকেতা যেভাবে যমরাজের কাছে প্রশ্ন তুলেছিল সেভাবে কবি মৃত্যুদূতের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। শুনে ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে মৃত্যুদূত। মৃত্যু সম্পর্কিত এমনতর জিজ্ঞাসা কখনও কখনও তাঁর কবিতায় দার্শনিক বীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখি:

"একরাশ নতুন ছড়া লিখে দিলাম, তবু

মৃত্যু এসে লিখল পরোয়ানা:
'লেখা-টেখার মানেই হয় না' বলেই আমার লেখার ঘরটাকে
ঝলসে ছিল।
তা সত্ত্বেও লিখি
'মৃত্যুর মানেই হয় না'
লিখতে গিয়ে ছন্দে ভুল করিনি কি? "

('লেখা-টেখা': ঝাউ-শিরীষের শীর্ষসম্মেলনে, পৃ. ৫০)

প্রাথমিক পাঠে মনে হতে পারে এবুঝি মজার ছলে মৃত্যুকে নিয়ে কিছুটা ঠাট্টা, উপহাস হয়তোবা। ছড়ার বিনিময়ে 'মৃত্যু' কবিকেও ছাড় দিতে চান না, 'লেখা-টেখার মানেই হয় না' বলেই তখন হাজির হয় তার অমোঘ পরোয়ানা। খেয়াল করলে দেখা যাবে 'মৃত্যু'কে এখানে কবি personify বা ব্যক্তিসত্তায় মণ্ডিত করতে চান। একদিকে মৃত্যুর অমোঘ উপস্থিতি, অন্যদিকে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'মৃত্যুর মানেই হয় না' বলার দুঃসাহস, কবিতায় ধরা পড়ে ছন্দ-বন্ধনে। পাঠক হিসেবে 'কবিতার সত্য' বনাম 'মৃত্যুর সত্যে'র একটা দ্বৈরথ তখন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। 'জন্মিলে মরিতে হবে' মানবজীবনের এই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিকে আস্বীকার করতে শেখায় তাঁর জিজীবিষা। মৃত্যুকে অস্বীকার করার এই প্রকল্প গড়ে উঠেছিল বেদ-উপনিষদের যুগ থেকেই। 'আত্মা অবিনশ্বর' বা 'জন্মান্তর'-এর ধারণা সেই সময়ই গড়ে উঠেছিল। মৃত্যুকে মোহনরূপে না দেখে, অকারণ মায়া-অঞ্চলে না মুড়ে মৃত্যুর মেটাফরের মুখোশকে অলোকরঞ্জন এখানে খুলে ফেলতেই চেয়েছেন। যত এগিয়ে গেছেন মৃত্যুর দিকে, অলোকরঞ্জনের বেলাশেষের কবিতায় মৃত্যুর উপস্থিতি ততটাই নিবিড় হয়ে উঠেছে।

"সন্ধেবেলায় নতুন আশা হঠাৎ জাগে যদি
দেখতে পাবে উড়াল দিল একটি প্রজাপতি।

তবুও যদি শেষ কবিতা প্রলয়কালের মেঘে
লিখে উঠতে না পারি তবে কী হবে বেঁচে থেকে?

আমার ডান কনুই ঘেঁষে মৃত্যুপরোয়ানা
খারিজ করে কাঁপতে থাকে প্রজাপতির ডানা "

('ধ্বংস ও প্রজাপতি': বাস্তুহারার পাহাড়তলি, পৃ. ৯)

'প্রলয়কালের মেঘে', 'তোমার সৃষ্টির পথ' আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ ইশারায় ডেকে নিয়েছিলেন রাণী চন্দকে, প্রোস্টেট গ্লান্ডের অপারেশন টেবিলে ওঠার আগে সকালবেলায় (১৪ শ্রাবণ ১৩৪৮) ধীরে ধীরে বলে গিয়েছিলেন তাঁর শেষতম কবিতাটি "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি " লিখে নিয়েছিলেন রাণী চন্দ। জ্বরের তীব্রতার

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল যন্ত্রণা, একটুখানি বলে রবীন্দ্রনাথ থামছিলেন। শীর্ণ হাতদুটো বুকের উপর জড়ো করে বলেছিলেন- "অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে / সে পায় তোমার হাতে/ শান্তির অক্ষয় অধিকার।" এত নিগূঢ় অথচ নিরালম্ব, দার্শনিক অথচ নির্ভার কবিতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে বোধকরি দুটি নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মোপলব্ধি ও বিশ্ববীক্ষা এই কবিতার ছন্দ-বন্ধনে সংহত হয়ে আছে। পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পী-দার্শনিকেরা জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে জীবন, জগৎ ও নিজেরই সৃষ্টির দিকে ফিরে তাকান তখন এই দার্শনিক উপলব্ধিতে তাঁরা কেউ কেউ পৌঁছে যান অনায়াসে, এই তাঁর অধিকার। যাঁরা তা পারেন না, বুঝতে হবে সে অধিকার তাঁর আয়ত্তাধীন নয়, মহত্তম শিল্পীর (ঈশ্বর) কাছ থেকে পাননি সেই ছাড়পত্র। পাঠক হসেবে আমরা কী তাহলে ধরে নেব 'সুন্দরের অভ্যর্থনা'য় হয়তো কোথাও কার্পণ্য ছিল সংশ্লিষ্ট কবি বা শিল্পীর? অলোকরঞ্জনের জীবন উপান্তের শেষ দুই-তিন মাসের কবিতা এখনও প্রকাশিত হয়নি, ফলে জীবন আর মৃত্যুর মধ্যবর্তী সীমা রেখায় দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মোপলব্ধি ও বিশ্ববীক্ষাকে সম্যকভাবে এখন ব্যাখ্যা করা যাবে না। তবে তাঁর গোধূলিবেলার কাব্য-প্রবাহের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর পরিণতির গ্রাফটিকে। খেয়াল করলে দেখা যাবে এখানে পৃথক দুটি কাব্যগ্রন্থের (ঝাউ-শিরীষের শীর্ষসম্মেলনে ও বাস্তুহারার পাহাড়তলি) দুটি ভিন্ন কবিতায় ('লেখা-টেখা' ও ধ্বংস ও প্রজাপতি') এসেছে 'মৃত্যুপরোয়ানা'-র কথা, আশ্চর্য এই দুটি কবিতাতেই অলোকরঞ্জন সেই পরোয়ানা-কে তুচ্ছ করে এগিয়ে যান কবিতার কাছে, এগিয়ে যান 'শিল্পিত সুন্দরে'র দিকে; বৃহত্তর অর্থে জীবনের দিকে। সেই 'মৃত্যুপরোয়ানা'কে 'খারিজ করে কাঁপতে থাকে প্রজাপতির ডানা'—জীবনের এই উদ্ভাসনের কাছে প্রলয়কালের আঁধি তুচ্ছ হয়ে যায়। 'প্রজাপতির ডানা' ঘোষণা করে জীবনের জয়যাত্রা, অলোকরঞ্জনের কাব্যের গোধূলি পর্যায় ভরে উঠেছে জীবনের জয়গানে। যাকে আমরা বিশেষীকরণ করতে চেয়েছি 'বেলাশেষের গান' ব'লে।

"বয়সের সূর্যাস্তমদির উপত্যকায় পৌঁছে আপনার কিছু কবিতার ('নিরীশ্বর পাখিদের উপাসনালয়ে', 'দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি', 'তোমরা কি চাও শিউলি না টিউলিপ') ভিতর দিয়ে যেন নেমে এসেছে মৃত্যু-চেতনার রহস্যময় সিঁড়ি, বেজে উঠেছে বিদায়ের বিষন্ন-বিধুর সুর। আপনার কি মনে হয় না, অনেক জরুরি কাজ এখনও করা হয়ে ওঠেনি?"

অনিন্দ সৌরভের এরকমই একটি প্রশ্নের উত্তরে অলোকরঞ্জন বলেছিলেন:

"বয়সের একটা ঢালু উপত্যকায় পৌঁছে জীবনবোধকে মৃত্যু-চেতনা থেকে বিবিক্ত করে রাখা যায় না। এছাড়া যখন এই সময়ের নিখিল মানব নিয়তির দিকে তাকাই তখন একটা স্বকপোলকল্পিত নিরাপত্তার সৌধ-শিবিরে আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাই না। আজ সারা বিশ্বের অনির্দেশ্য নিয়তি এত বিপুল একটি সংগঠন যে তাঁর সঙ্গে একটা একাত্মীকরণের এষণা আমাকে অধিকার করে নেয়। সেই সঙ্গে এটাও বলা দরকার আমি

আমার ঐহিক অবস্থানের সীমাবদ্ধতা কবুল না করে আরও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে চাই, কেননা অনেক কাজ ঘুমে ও জাগরণে আমার দিকে অপেক্ষাতুর চাহনিতে তাকিয়ে আছে বলে মনে হয়। রবার্ট ফ্রস্টের প্রতিধ্বনি করে বলব, 'miles to go before I sleep'।

('জবাবদিহির টিলায় অলোকরঞ্জন', কবিতীর্থ, আশ্বিন ১৪২৫)

এর দুবছর দশ মাস পরে অলোকরঞ্জন আমদের ছেড়ে চলে যাবেন, না ফেরার দেশে। তাঁর এই বক্তব্য ও কবিতার 'ভাবকল্প' থেকে আমরা বুঝতে পারি জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছে তাঁর জীবনবোধ, মৃত্যু-চেতনা, ঈশ্বর-ভাবনা মিলেমিশে নির্মাণ করে তাঁর বিশ্বাত্মবোধ।

তিন

শরীরী বার্ধক্য থেকে সূচিত হয়নি তাঁর চেতনার জ্বরা, বরং অশীতিপর ('এখন হাঁটতে গেলে চৌকাঠে ঠোক্কর লাগবেই') বয়সের প্রজ্ঞা অলোকরঞ্জনকে পৌঁছে দিয়েছিল পূর্ণতার বোধে। বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি যাঁর ছিল ব্যক্তিগত পক্ষপাত, তিনি যে পূর্ণতার সেই বোধ থেকে এগিয়ে যাবেন শূন্যতত্ত্বের দিকে এ তো খুব স্বাভাবিক। 'এখন নভোনীল আমার তহবিল' কাব্যগ্রন্থের 'শূন্যকোষ' কবিতাটির তত্ত্বকাঠামোর দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর আত্মোপলব্ধি ও দার্শনিক প্রতীতির কথা:

"এখন নভোনীল
আমার তহবিল
তা ছাড়া আর কিছু নেই

যা-কিছু ছিল সবই
দেয়েছি ভৈরবী
শেষ কবিতাটির কাছে

একটি প্রিয়তম
বাকতিমা ছিল
সেটাও লাগিয়েছি কাজে

তোমরা বলো তবে
শূন্য ছাড়া আর
কার কী রাজকোষ আছে!"

('শূন্যকোষ': এখন নভোনীল আমার তহবিল, পৃ. ১১)

এক জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, এই জীবনের যা কিছু অর্জন কবিতার জন্য তার সবকিছু কবি বিলিয়ে দিয়েছেন।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

"আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে
এতকাল নদীকূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে থরে বিথরে
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে।"

'সোনারতরী'-র কবি/ মানবজীবন আবাদকারী কৃষক-এর কাতর প্রার্থনা ছিল এটুকুই। কিন্তু 'অধিষ্ঠাত্রী দেবতা' তাঁর জীবনের ফসল/ সৃষ্টি নিয়ে গেলেও তাঁকে নেননি 'সোনারতরী'তে। তিনি পড়ে রইলেন 'শূন্য নদী তীরে'। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র রূপকার্থকে মাথায় রেখেই অলোকরঞ্জনের 'শূন্যকোষ' কবিতার দিকে তাকালে বুঝতে পারি সমস্ত সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে তিনিও তুলে দিয়েছেন কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে। 'এখন নভোনীল/ আমার তহবিল' — তাঁর তহবিল (ভাণ্ডার) এখন অনন্ত শূন্যে পূর্ণ। আবারও রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় নিতে হয় 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,' ('চঞ্চলা': বলাকা) — বলাকা-র গতিতত্ত্বকে নদীর রূপক-এ রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখাতে চেয়েছেন। সেটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও আশ্চর্যের বিষয় হল সংশ্লিষ্ট কবিতার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ অনন্ত প্রবাহকে 'হে ভৈরবী, ওগো বিরাগিণী' বলে আখ্যায়িত করেন। অলোকরঞ্জনের কবিতাতেও আসে এই ভৈরবী'র প্রসঙ্গ, 'যা-কিছু ছিল সবই' কবি সবকিছু তুলে দিয়েছেন সেই ভৈরবী'র হাতে। 'সোনার তরী'র ফসল যে 'অধিষ্ঠাত্রী দেবতা'র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, অলোকরঞ্জনের 'শূন্যকোষে'র ভৈরবী' তাঁরই সমধর্মী। জীবনের অনন্ত প্রবাহ হিসেবে তাঁকে দেখা যেতেও পারে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা', 'মানসসুন্দরী', 'অন্তর্যামী'- নারী না পুরুষ, দেবতা না দেবী এ প্রশ্নের উত্তরে যেমন নিঃসংশয় হওয়া যায় না, তেমনি অলোকরঞ্জনের ভৈরবী' দেবতা না দেবী সেই উত্তরও আমাদের মাঝে এক সন্দিগ্ধতার বর্ণিমা রেখে যায়।

অলোকরঞ্জনের কবিমানস ও কবিতার 'ভাবকল্প' জুড়ে থাকে বৌদ্ধ-দর্শনের অনুষঙ্গ, বৌদ্ধ-পুরাণের কোনো কোনো মোটিফ ঘুরে ফিরে আসে তাঁর কবিতায় 'শূন্যকোষ' কবিতাটি সেই ভাবনায় বলয়িত। বৌদ্ধ ধর্মের 'নির্বাণ', 'শূন্যতত্ত্ব' ও 'পরমাপ্রকৃতি তত্ত্ব' কবির দার্শনিক প্রজ্ঞাকে বিশেষভাবে বিভাবিত করেছিল। সুমিতাভ ঘোষালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অলোকরঞ্জন স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন:

"বৌদ্ধ ধর্মের একটা ব্যাপার আমার মধ্যে রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের মতো সুন্দর নান্দনিক ধর্ম আর নেই, যেখানে নির্বাণের মতো কবিতার ধারণা রয়েছে। কী অসাধারণ ধারণা। বৌদ্ধ ধর্ম কবিতায় ভরা। তবে বৌদ্ধ ধর্ম যদি আমার কবিতায় আসে তবে সেটা কবিতার শর্তে আসতে হয়েছে। কোনও তথ্যের দিক থেকে আসেনি। মহাযানী বা হীনযানী কোনও রাস্তা ধরে আসেনি। আমার বিশ্বাস আজকে যতো নন্দনতত্ত্ব, কালকে সেটা ধর্ম হবে। আসাম্প্রদায়িক

একটা ধর্মবোধ তৈরি হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমার একটা গোপন সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ক আমার কবিতার মধ্যে শনাক্ত করে নিতে হবে।" ('সংবেদনশীলতার জন্য মানুষকে কবিতার কাছেই ফিরতে হবে, কবিতীর্থ, জুলাই, ১৯৯৩)

বৌদ্ধ-দর্শনের 'নির্বাণ' ও 'শূন্যতত্ত্ব' অন্যদিকে অলোকরঞ্জনের 'ঈশ্বরভাবনা' কবিতাটির তাত্ত্বিক-কাঠামো নির্মাণ করে দেয়। 'কবিকে এখন চূড়ান্ত জ্ঞানযোগী হতে হবে।'—শেষ পর্যন্ত তিনি এ কথা বিশ্বাস করতেন। মরমিয়া পথ কবির সাধন-মার্গ। তাঁর জ্ঞান, তাঁর চর্চা, তাঁর বোঝাপড়া কবিতার বহির্বিন্যাসে ছাপ ফেলবে না, তা থাকবে কবিতার অন্তঃশরীরে। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের অনুষঙ্গ সেভাবেই বিন্যস্ত থাকে তাঁর কবিতার অন্তঃশরীরে। 'শূন্য ছাড়া আর / কার কী রাজকোষ আছে!' পাঠককে এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে কেবল 'শনাক্ত করে নিতে' হয়।

চার

অলোকরঞ্জনের সৌন্দর্য-ভাবনার সঙ্গে ঈশ্বর-চেতনা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সুন্দরের প্রত্নরূপ বা 'আর্কিটেবল বিউটি' হিসেবে তাঁর কবিতায় আমরা নওল কিশোরকে দেখতে পাই:

"তীর থেকে দেখি ছ'হাজার আশি ফুট
সাঁতরিয়ে এল আমার বুকের তোলে
আশ্রয় নিতে, আমায় বলল: 'এই
দূরত্বটাকে ন্যাটিক্ল মাইল বলে
নাবিক ভাষায়', এ পর্যন্ত বলে
নওল কিশোর, যেন এক দেবদূত,
ঘুমিয়ে পড়ল শ্রান্ত আমার কোলে।"

('নওল কিশোর, এসেছে বুকের তোলে': এখন নভোনীল আমার তহবিল, পৃ. ১২)

এই নওল কিশোর "দেবদূত নন, ঈশ্বরও নন। বৈষ্ণব পদাবলি কিংবা ভানুসিংহের পদাবলিতে যে নওলকিশোরকে স্থাপন করা হয়েছে সে চির সৌন্দর্যের আধার। তাকে আমি কোনও দেবতায়নের মধ্যে সংকুচিত করতে চাই না। কখনও কখনও কবি বিদ্যাপতি যেন নিজেই নওলকিশোর। এইখানে যদি আর্কিটেবল বিউটি, প্রাক্রুপিণী সৌন্দর্য বলে কিছু থাকে, সেই নওলকিশোর আমাদের বারবার ভালোবাসতে ডাক দিয়ে যায়। কিন্তু ধরা দেয় না। সে কোনও নৈতিক সংস্কারও নয়। নওলকিশোর চিরদিনই নওলকিশোর থেকে যায় এবং সে সমস্ত ধর্মীয় কাঠামোর বাইরে। কবিতার ভিতরে এক নওলকিশোর আসে, বারবার জীবনটাকে পুনর্নব করে, বিরহের মধ্য দিয়ে জাগ্রত করে পলাতক থেকে যায়।" ('জবাবদিহির টিলায় অলোকরঞ্জন', কবিতীর্থ, আশ্বিন ১৪২৫) দান্তের সৌন্দর্যভাবনার 'ঐশী অতৃপ্তি' কবিকে এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। সুন্দর কখনও কখনও রূপ

পরিগ্রহ করতে চায়, তখন অস্তসূর্য এঁকে দেয় টেম্পেরো। অনিকেত সময়ে সে খুঁজে নেয় 'নিরাশ্রিতে'র 'আশ্রয়':

"কী করে তোমাকে দিতে পারি আশ্রয়
নিজেই যখন চরম নিরাশ্রিত?
নওলকিশোর আমার কোলে ঘুমায়।"

('নওল কিশোর, এসেছে বুকের তোলে': এখন নভোনীল আমার তহবিল, পৃ. ১৩)

কবির কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। সেখানেই নওলকিশোর শুশ্রূষা খোঁজে, পেয়ে যায় 'শুশ্রূষার মতো শত-শত/ শত জলঝর্ণার ধ্বনি'।

চর্যাপদ থেকে অলোকরঞ্জনের বাংলা কবিতা প্রধানত লিরিক প্রধান। হাজার বছর ধরে বাংলা কবিতা গীতিকবিতার চেনা পথ ধরে চলেছে। মুক্তচিন্তার দিক দিয়েই অলোকরঞ্জন যে কেবল বিশ্বনাগরিক ছিলেন এমন তো নয়, রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙালি কবিদের মধ্যে তাঁর আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিসর সবচেয়ে ব্যাপ্ত, আন্তর্জাতিক পরিচিতিও সবচেয়ে বেশি। নতুন সহস্রাব্দে এসে মনে হয় একদিকে বাংলা ও ভারতীয় কবিতার ঐতিহ্যের আত্তীকরণ অন্যদিকে আধুনিকতার পরিগ্রহণের মধ্যে দিয়ে অলোকরঞ্জন যদি বাংলা কবিতাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে পারতেন তবে কেমন হত সেই কবিতার সংরূপ, কেমন হত তার মানচিত্র? তিনি যে 'মেটা-প্রোজ'-এর কথা বলতেন তা দিয়ে বাংলা কবিতার লিরিক প্রাধান্যকে যদি আক্রমণ করতেন অলোকরঞ্জন, তবে কেমন হতো বাংলা কবিতার অবয়ব অথবা ভাবকল্প?

অলোকরঞ্জনের গোধূলিলগ্নের কবিতা : একটি মূল্যায়ন

সঞ্জীব দাস

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত যে আবহমান বাংলা কবিতাধারার একজন অনন্যপরতন্ত্র প্রতিভা একথা অবিতর্ক সত্য। সেই তিনি আজ অস্তাচলে। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় এবং পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা বহু বছরের । অথচ উনি থাকতেন সুদূর হিশবার্গে। আর আমি সুদূর পশ্চিমবাংলার মফস্‌সল শহর বৈদ্যবাটির বাসিন্দা। আইএসডি বাবদ খরচ বেশ বেশি, আর আমিও সকলের মাঝে থেকেও নির্জনতাভিলাষী। তাই ফোন করাও বেশি হত না। তাতে উনি মনে কিছু করতেন না। বরং এই ঠোঁটকাটা অর্বাচীনকে তিনি বেশ মনে রেখেছেন তা বুঝতাম তাঁর স-স্নেহ সংলাপে। তাই তাঁর প্রয়াণ সংবাদে আমার মন এখনো বিষাদ মেঘে ছেয়ে আছে। তবে সময় হলে সকলকেই তো চলে যেতে হয়। "কী ফল বিলাপে ! আর কী পাইব তাঁরে?" বরং পাঠক চলুন মনখারাপ করা দুপুরগুলো দূরে ঠেলে তাঁর কবিতার নন্দনকাননে বিচরণ করি। বোধ এবং মনন দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি তাঁর কবিতার প্রকৃতি। তবে একটি মিতায়তন প্রতিবেদনে এমন আলোকিত কাব্যবিশ্বের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তার থেকে চলুন পাঠক, তাঁর গোধূলিলগ্নের কবিতার স্বাদ নিই।

এখন প্রথমেই স্থির করা যাক অলোকরঞ্জনের কবিপ্রতিভার গোধূলি পর্ব বলতে কোন সময়কে ধরব এবং কোন কোন কাব্যগ্রন্থ এই পরিসরভুক্ত হবে। অলোকরঞ্জনের লেখনী পুরনো শতাব্দীর অন্তিম প্রহর অতিক্রম করে নতুন শতাব্দীতেও সৃষ্টি- প্রেরণায় অপরিক্লান্ত ছিল। জীবনের অন্তিম প্রহরেও তাঁর মননলোক এবং বোধির জগৎ ছিল তীক্ষ্ণ এবং প্রাণবন্ত। তাই নতুন শতাব্দীতে তাঁর রচিত সকল কাব্যই এই আলোচনায় আসবে। অর্থাৎ আমাদের আলোচনার পরিসরভুক্ত হবে 'এখন নভোনীল আমার তহবিল' থেকে, 'নিরীশ্বর পাখিদের উপাসনালয়ে', 'দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি', 'তোমরা কী চাও শিউলি না টিউলিপ,' 'শুকতারার আলোয় পড়ি বিপর্যয়ের চিঠি', 'ঝাউ শিরীষের শীর্ষ সম্মেলনে' এবং 'বাস্তুহারার পাহাড়তলি' ইত্যাদি সকল কাব্যগ্রন্থ।

নতুন শতাব্দীর প্রথম প্রহরেই বাউলের উদার প্রশান্তির সৌম্য সৌরভ গায়ে মেখে আলখাল্লার গোপনীয়তা ছেড়ে অলোকরঞ্জনের আলোকিত ছায়া এসে পড়েছিল 'উদার নভোনীলের স্নিগ্ধতটে!' যৌবনবাউল', 'নিষিদ্ধকোজাগরী,' 'রক্তাক্তঝরোখা' কাব্যগ্রন্থ যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন এই কবির কাব্য জনচিত্ততোষিণী নয়। এবং তাঁর উদ্দেশ্যও তা নয়। শিল্পের প্রতি দায়বোধ তাঁকে কবিতা রচনায় প্রাণিত করেছে। কিন্তু কোনো একটা তটে আটকে থাকা তাঁর স্বভাব নয়। তাই তাঁর কবিতায় এসেছে বারংবার ঋতু পরিবর্তনের

পালা। পঞ্চাশের দশকে তাঁর বাংলা কাব্যমঞ্চে সদর্প প্রবেশ। সেই সময়ের প্রকৃতিলগ্ন, ঈশ্বরবিশ্বাসী অলোকরঞ্জন জীবনদর্শনের দিক থেকে আজ অনেক বদলে গেছেন। কবিতার বিষয়েও এসেছে অনেক পরিবর্তন। আজকের অলোকরঞ্জন পরিবেশলগ্নতার কথা বলেন। আজ পুঁজিবাদী উন্নয়নের আগ্রাসী থাবায় বিপন্ন পরিবেশ। আমাজনের বনভূমিও ধ্বংস হয় লগ্নি পুঁজির গোপন সক্রিয়তায়! এইভাবে আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের যাপিত জীবনের অলিগলি থেকে ঘটে চলেছে সবুজের বিদায়। নতুন শতকের অলোকরঞ্জনের কবিতায় এই সংকটের ছাপ পড়েছে। যেমন 'ঝাউ- শিরীষের শীর্ষ সম্মেলনে' কাব্যগ্রন্থের 'বিভাব' কবিতার কথাই ধরা যাক। এই কবিতায় সাম্প্রতিক সকরুণ বাস্তবতা প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এখানে সূচনাতেই সবুজবিহীন একটি চূর্ণ পরিসরের ছবি আঁকা হয়েছে :

> ঝাউ শিরীষের শীর্ষ সম্মেলনে
> আমারও যোগ দেবার কথা ছিল
> গিয়ে দেখলাম একটিও গাছ নেই

'নেই'-এই নেতিবাচক পদটির সৌজন্যে সবুজ সংহারের জন্য কবির অসহায় হাহাকার যে এখানে দুকূলপ্লাবী হয়ে উঠেছে তা নিশ্চয় অনুভূতিশীল পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন! তবে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা অলোকরঞ্জনের স্বভাব নয়। বরং হতাশার মহাশ্মশানে বসে নতুন সম্ভাবনার নান্দীপাঠের দিকেই তাঁর সহজাত প্রবণতা। এখানেও সেই প্রবণতা অব্যাহত! তাই দেখি হতাশা ভুলে কথক বিকল্প এক কবি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। সেখান তিনি 'সভ্যতার গর্হিত পাপ' নিয়ে একটি কথাও বলেন না। বরং সেখানে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে দেখেন 'অমূর্ত গোলাপের' উদ্বোধন—

> এক হাজার কবিতার স্পন্দনে
> আচম্বিতে লক্ষ করা গেল
> চোখের সামনে অমূর্ত গোলাপ

'তোমরা কী চাও শিউলি না টিউলিপ' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের বিভাব কবিতাতেও কবির আশাদীপ্ত নিসর্গপ্রীতি উৎকীর্ণ। সেখানে দেখি 'বসত বাড়ির শেষ বারকার পুজোয়' শেফালিকার শুভ্র আগুনটাকে চয়ন করে কথক প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে বেরিয়ে পড়েছেন। এখানে বিরোধাভাসের দিকটি লক্ষণীয়। কথক যখন বেরিয়ে পড়ছেন তার পরেই এসেছে প্রতিমানিরঞ্জনের পালা। 'প্রতিমানিরঞ্জন' এখানে নেতিবাচকতার চিহ্নায়ক। কথক জীবনের এই নেতিবাচকতাকে হেলায় নস্যাৎ করেন। 'শেফালি কার শুভ্র আগুন'— এখানে ইতিবাচক বা সদর্থক জীবনভাবনার দ্যোতক; সেই জীবনভাবনাকে বরণ করেই কথক বেরিয়ে পড়েন ভিনদেশের উদ্দেশে। ভিনদেশের গাঁয়ে গিয়ে কথক লক্ষ করেন অজস্র টিউলিপের

সমারোহ :

সেখানে দেখি অজস্র টিউলিপ
যা শুধু লাগে নশ্বরের কাজে
শরণার্থীর ছাউনি প্রসাধনে
বাঁধন ছাড়া সৃষ্টির মেজাজে।

এইভাবে টিউলিপ ফুলও হয়ে উঠেছে ইতিবাচক জীবনের প্রতীক, যা শরণার্থীর ছাউনির প্রসাধনে কাজে লাগে। বাঁধন ছাড়া সৃষ্টির মেজাজে চলে সেই সৃষ্টির পালা। কবিতার সমাপ্তিতে দেখি কথককে ঘিরে তাঁর গুণমুগ্ধ, ছাত্র- বন্ধুদের মধ্যে ঘটে গেছে আমেরু বিভাজন। সেই বিভাজনেও সঙ্গ দিয়েছিল শিউলি ও টিউলিপ :

মীরা এখনও শিউলি নিয়ে বিভোর
টিউলিপেই বিহ্বল সুদীপ

আসলে কথক-কবি অন্ধকারের পৃথিবীতে চান আলোর উদ্বোধন। শিউলি এবং টিউলিপ এই শুভঙ্কর চেতনার প্রতীক। বক্রবাচনের সরসতায় এই সত্যই উঠে এসেছে শিউলি কিংবা টিউলিপ বেছে নেওয়ার কথায় : 'তোমরা কী চাও, শিউলি না টিউলিপ'?

অলোকরঞ্জনের গোধূলিলগ্নের কবিতায় ছেয়ে আছে নতুন বিশ্বের অভূতপূর্ব বিপন্নতা। এখন মানুষ যেন অনুভূতিহীন যন্ত্র। তাদের সংলাপে নেই গভীর বোধির স্নিগ্ধ ইশারা। তাদের মুখ থেকে শুধু ঝরতে থাকে ফাঁপা শব্দের অজস্র খই। এই সাম্প্রতিক বাস্তবতাই মূর্ত অলোকরঞ্জনের 'হাঁ -করা মুখ' কবিতায় :

হাঁ-করা মুখ শুনছে সব কথা—
এতদিন তো নিজেই অনর্গল
শব্দের খই ছড়িয়ে হেঁটে গেছে,

এসব দেখে কবি বোঝেন : 'কিন্তু আর-এক সময় এসে গেল।' আজকের লগ্নিপুঁজির ক্লিন্ন থাবা সৃষ্টিশীলতাকে গিলে ফেলতে চায়। লেখক থেকে গায়ক সকলকেই ঠিক করে দেওয়া হয় কী লিখতে হবে, কী বলতে হবে কী গাইতে হবে। কেউ তবুও স্বতন্ত্রতার সাহস দেখালে জোটে নির্বোধ প্রতিক্রিয়া। যেমনটি ঘটেছে অলোকরঞ্জনের কবিতার এক সাহসী কিশোরের ভাগ্যে :

ওরা বলল সংস্থা বলে দেবে
যা-কিছু কথা রয়েছে বলবার
একটি কিশোর বাগেশ্রী গাইতেই
ওরা বলল মিঁয়া কী মল্লার !

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

তবুও কিশোরটি শব্দ নিয়ে বাঁচার সাহস দেখালে নেমে আসে ডেমোক্লেসের খড়্গ:

হোয়্যাটসআপ শমন জারি করে
ভাষায় কথা বলার মানে নেই !

এমন অন্ধ সময়ে দাঁড়িয়ে একজন সৃষ্টিশীল মানুষের বিষাদ খিন্ন হওয়াটাই নির্মম নিয়তি। তাই কবির লেখনীতে আঁকা হয় জলের জন্য ময়ূরের আকাশের দিকে আকুল হয়ে মুখ বাড়ানোর দৃশ্য :

হা-উৎকর্ণ ময়ূর হয়ে যেই
মেঘের দিকে মুখ বাড়াল, আকাশ
নোনা জল ঝরাল দু-তিন ফোঁটা—

আজকের দিনে এদেশের ফ্যাসিস্ট সরকার যখন মানবতা, মানবাধিকারের আদর্শ ভুলে এন.আর.সি-এর ছুতোয় শরণার্থী বাঙালিদের পুনরায় দেশহীন করতে উদ্যত, যখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ফ্যাসিস্ট কায়দায় মেক্সিকো-আমেরিকার সীমান্তে পাঁচিল তুলে শরণার্থীদের আটকাতে দৃঢ় সংকল্প তখন শরণার্থী নিয়ে মানবিক অবস্থান অলোকরঞ্জনকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। স্মরণকরা যাক 'শরণার্থী' কবিতাটির কথা! কবিতাটির সূচনা সরস পদক্ষেপে :

পার্কস্ট্রিট পার হওয়ার মুখে
কোত্থেকে এক তুন্দ্রা হরিণ
আমার বুকেই খুবলে দিল
তীক্ষ্ণ শিংয়ের মেগাবাইট
সে, নাকি আমি অপরাধী

কথক মোদি বা ট্রাম্প নয়। তাই তাকে মার্জনা করে তার আপাত হিংস্রতার নিহিত কারণ খুঁজতে থাকেন স্তব্ধ বিস্ময়ে :

ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারি
শীতের দাপট এড়িয়ে গিয়ে
কলকাতার এই ফারেনহাইটই
তার পছন্দ, তাই কি অমন
সেজে উঠল নরঘাতী?

মানবিক কথক এক নারীকে দেন তার ভার :

অনেক শরণার্থী,
ওকে দিলাম তোমাকে,

আর তারপর! 'নিজে চলেন হরিণটির ভিসা আনতে'। কবিতার সমাপ্তি নামে এক চমৎকার খোঁচায় : 'বলব ও নয় মৌলবাদী'! এই খোঁচার লক্ষ্য কে নয়! ট্রাম্প থেকে হাঙ্গেরির মৌলবাদী রাষ্ট্রপ্রধান সকলেই কবির এই তীক্ষ্ণ বাক্য শরে বিদ্ধ!

এখন এক অন্ধকারময় সময়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসর সর্বত্রই অন্ধকারে ছাইছে। এসব দেখে মনে হতেই পারে বুঝি 'কোথাও নেই কোনো আলো, কান্তিময় আলো' এই অন্ধকার বেলায়! না, আছে। অন্তত অলোকরঞ্জনের কবিতায়। বারংবার তাঁর কবিতায় দেখি অন্ধকারের পাতাল ফুঁড়ে আলোর ইশারা। যেমন 'সিস্টিনে চ্যাপেলে শেষবার' কবিতার কথা স্মরণ করি। এর সূচনায় এসেছে জমাট অন্ধকারের এক চিত্রকল্প:

এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্য এক বধ্যভূমি ছুঁয়ে
যেতে যেতে ভেবে মরি মানুষ কি এতই পিশাচ
বনে গেছে? এক মৌলবাদ থেকে জিঘাংসু আর-এক
স্বৈরতান্ত্রিতার দিকে যেতে যেতে ভেবেছি তাহলে
এবার মানবজন্ম ব্যর্থ হল?

এই অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার আশায় কথক একদা যান মিকেলেঞ্জেলোর কাছে। তিনি কথককে নিয়ে যান সিস্টিন চ্যাপেলে। সেখানে কথক দেখেন ফ্রেস্কোর অলোক সামান্য কারুকাজ। সেখানে একটি কিনারে বিরাজমান ঈশ্বর স্বয়ং। কথক দেখলেন তিনি কীরকম অনায়াসে আদি মানবের দিকে সস্নেহ চ্যালেঞ্জে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আর আদমও প্রত্যুত্তরে তখন শৌর্যের লাবণ্যে প্রসারিত করলেন তাঁর সুদক্ষিণ করাঙ্গুলি। এই স্বর্গীয় দৃশ্য অবলোকন করে নিরাশাচ্ছন্নতার কালো মুহূর্তে সরে যায়। জেগে ওঠে আশার নতুন চর। আশাদীপ্ত কথক ভাবেন :

তাহলে তো এই জায়গাটা থেকে নতুন বিশ্বের
অভিষেক হতে পারে, সেটা হলে কীরকম হয় —'

তবে সেই সঙ্গে বিঁধিয়ে দেন ঈশ্বরের আদমের হাত না ছোঁয়ার জন্য মৃদু অভিযোগের তীক্ষ্ণ শলাকা :

সন্তর্পণে আরও—একটা কথা ভাবি, ঈশ্বর আরেকটু
এগিয়ে গিয়েই যদি আদমের হাত ছুঁয়ে দিতেন
তবে তাঁর জাত যেত ? মানুষ উচ্ছন্নে গেছে বলে
তাঁর সেই শৈথিল্যকে আমি আজ দায়বিদ্ধ করি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত রচিত 'শুকতারার আলোয় পড়ি বিপর্য্যয়ের চিঠি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এক অনন্যপরতন্ত্র বিশ্ববোধের কবিতা 'পরাভবের দ্যুতি' কবিতাটি আজও আমার

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

স্মৃতিধার্য্য হয়ে আছে। সন্ত্রাসধ্বস্ত পৃথিবীতে যখন সব আলো নিভে গেছে বলে মনে হয় তখন এমন কবিতা অলক্ষে মোমের নরম আলোর মতো জেগে উঠে, যেন বলে ওঠে সবকিছু এখনো শেষ হয়নি। অন্ধকারের আড়ালে থেকে গেছে আশার টুকরো আলো। তাইতো শতচ্ছিন্ন র‍্যাকেট জুড়ে কবি দেখেন সহস্র সূর্যের অলীক প্রতিশ্রুতি, পরাজয়ের গ্লানিমার মধ্যেও আবিষ্কার করেন এক অমলীন দ্যুতির সহজ উদ্ভাস। কবিতার পর্দা উঠতেই পরিসর জুড়ে একটি টেনিস লনের ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে। এমন সূচনা প্রত্যাশা জাগে, একটি নাট্যঘন টেনিস খেলার বর্ণনায় বোধকরি প্রাণিত হয়েছে কবিসত্তা। কিন্তু, কথকের সচেতন অন্তর্ঘাতে প্রত্যাশার সঙ্গে শিল্পের বাস্তবতার আসমান-জমিন পার্থক্য অচিরেই ঘটে যায়। কথকের বর্ণনার সূত্র ধরে আমরা দেখি সেই টেনিস লনে জড়ো হয়েছে সুদুর সুদান থেকে আসা মজুরেরা। তারাই আজ খেলার কুশীলব। তবে নাম যশ অর্জন তাদের লক্ষ্য নয়,তারা চায় পাশ্চাত্যদেশে থাকার সুযোগ! কথক জানিয়েছেন :

যে কিনা আজ হবে
শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়
সে পাবে এই দেশে
থাকার অধিকার।

এ তো গেল কিছু সৌভাগ্যবানের কথা, যারা টেনিস লনে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া রয়েছে শতসহস্র উদ্বাস্তুর দল। লনের বাইরে প্রকাণ্ড গহ্বরে তারা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে মগ্ন। তাদের র‍্যাকেট শতছিন্ন। কিন্তু কোনো প্রকার বিষণ্ণতা তাদের গ্রস্ত করেনি। জীবনকে, চলার পথে নেমে আসা বিপর্য্যয়কে তারা সহজভাবে গ্রহণ করতে শিখেছে। তাদের খেলার সরঞ্জাম সেই মানসিকতার ছোঁয়ায় লাভ করেছে এক আশ্চর্য্য দ্যুতি :

শতছিন্ন তাদের
র‍্যাকেট জুড়ে দেখি
সহস্র সূর্যের
অলীক প্রতিশ্রুতি।

কাল চেতনার বলিষ্ঠতায়, বিশ্ববোধের আন্তরিকতায়, মানবিকতার সহজ স্ফুরণে বক্ষ্যমাণ কবিতাটি হয়ে উঠেছে চিরকালীন বাংলা কবিতার এক দ্যুতিস্নিগ্ধ অর্জন ! অনেকের কাছে এই প্রতিবেদন বানানো, সুতরাং প্রাণহীন বাক্যের সমষ্টি বলে মনে হতে পারে। এই মনে হওয়ার কারণ অলোকরঞ্জন এবং অনেক অন্যান্যদের অবস্থান ও সেইহেতু তাঁদের চেতনার মেরুপ্রতিম পার্থক্যের মধ্যে নিহিত। অন্যের কাছে এই কবিতা বানানো বলে মনে হবে মূলত অনভিজ্ঞতার কারণে। কিন্তু জার্মানি যাঁর প্রণয় ভূমি, এশিয়া এবং পাশ্চাত্যে যাঁর

অবাধ বিচরণ তাঁর কাছে এমন কবিতা রচনাই তো প্রত্যাশিত ! বিশেষত দীর্ঘকাল ধরে তিনি আরব ভূমি নিয়ে, সেখানে মার্কিন আগ্রাসনের সূত্রে সতত উদ্বিগ্ন। সাম্প্রতিকালে যুদ্ধধ্বস্ত আরব ভূমি থেকে ইউরোপ জুড়ে যে শরণার্থীর ঢল নেমেছে যা নিয়ে জার্মান প্রেসিডেন্ট মর্কেল স্বয়ং উদ্বিগ্ন। সেই শরণার্থীদের দুর্দশা নিয়ে তাঁর হৃদয় হয়ে আছে ভূকম্পপ্রবণ ! নিজের বাসস্থানের অনেকটা তিনি তাদের জন্য ছেড়েছেন। নিজ গরজে তিনি নিয়েছেন তাদের জার্মান শেখানোর দায়িত্ব। সেই তাঁর লেখনীমুখেই তো এমন কবিতার জন্ম সম্ভব! এই কবিতা আমাকে জারিত করে : 'My heart is embued with the sorrow– implied in its body'। এমন কবিতা রচনার জন্য কবিকে আমি অভিনন্দন জানাই !

এরপর আসি ওনার শেষ কাব্যগ্রন্থ 'বাস্তুহারার পাহাড়তলি'র কথায়। এর বিভাব কবিতা উঠে এসেছে উদ্বাস্তু শরণার্থীদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যাপনের সংবাদ এবং সেই সঙ্গে উৎকীর্ণ হয়েছে এই মোহময়ী পৃথিবীর প্রতি তাঁর 'সজল পিছুটান'। কাব্যগ্রন্থের সূচনাতেই কবির আশাবাদী সত্তা 'প্রজাপতির ডানাকে আশ্রয় করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।' 'ধ্বংস ও প্রজাপতি' কবিতার সূচনা নতরে দাম গির্জার ঝলসে যাওয়ার অশুভ চিত্রে:

একটু আগেই প্যারিসে এসে আচমকা দেখলাম
ঝলসে গেছে সাধের নতরে দাম

এর বিপরীতে কবিতায় উঠে আসে একদল চারণ কবির আনন্দবিহ্বলতার সুরস্নিগ্ধ ছবি:

'কেন যে তবু কিশোর এক চারণ কবির দল
থেকে-থেকেই গেয়ে উঠছে আনন্দবিহ্বল :

পাপিলন দে সোয়া
এস পোয়া'

আনন্দকরোজ্জ্বল চারণদের গান শুনে কথক ভাবেন :

'সন্ধেবেলায় নতুন আশা হঠাৎ জাগে যদি
দেখতে পাবে উড়াল দিল একটি প্রজাপতি।'

(প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ফরাসি ভাষায় "পাপিলন" কথার অর্থ হল প্রজাপতি)

এই আশার সূত্র ধরে কথকের ভাবনা অন্যখাতে বইল :

'ভাবতে বসি আমিও আজ নতরে দামের মতো
ধ্বংসাবশেষ, বয়েসটাও ক্ষত ও বিক্ষত—

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

তবুও যদি শেষ কবিতা প্রলয়কালের মেঘে
লিখে উঠতে না পারি তবে কী হবে বেঁচে থেকে?

আর তখনই তাঁর ডান কনুই ঘেঁষে সত্যই এক প্রজাপতির আবির্ভাব ঘটে :

আমার ডান কনুই ঘেঁষে মৃত্যুপরোয়ানা
খারিজ করে কাঁপতে থাকে প্রজাপতির ডানা—

মাননীয় পাঠক জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছে যাওয়া একজন কবি এইরকম স্বর্গীয় কবিতা লিখতে পারে।

ভাবতে পারেন! অন্তত বাংলা কবিতার ইতিহাসে এমন উদাহরণ খুব বেশি পেয়েছেন?

তাই বলি বেঁচে থাকলে চাইতাম আরো লিখে চলুন অলোকরঞ্জন। কিন্তু তা তো হবার নয়। আজ বাংলায় ভণ্ড, ক্ষমতালোভী শয়তানি অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। এমন অন্ধবেলায়, অলোকরঞ্জনের মতো বহুদর্শী বোধিবৃক্ষের বাঙালির বড় প্রয়োজন। কিন্তু সে আশা বৃথা। তার থেকে আসুন পাঠক, তাঁর কবিতা থেকে আমরা নতুন জীবনের রসদ ভরে নিই। আগুন ভরে নিই আমাদের চেতনায়। শুদ্ধ আগুন! যা আমাদের বিবেককে জাগাবে। করে তুলবে বোধিসত্ত্ব।

সংবর্তের বারান্দায় বিশ্বনাগরিক অলোকরঞ্জন

ড: অজন্তা মিত্র (বিশ্বাস)

"আমার আলো তোমার ছায়াটিরে
রাখবে ঘিরে পুষ্প যেমন সুদীপ্ত বিশ্বাসে
কোরকে তার শান্তি রাখে সযত্ন বিন্যাসে
পাপড়িগুলি হাওয়ার ভাবে যদি বা যায় ছিঁড়ে
অক্ষত সেই শান্তি হাসে সংহত উল্লাসে।"

'মুক্তধারা'র মধ্যে অলোকরঞ্জন এভাবেই বিকশিত করতে চেয়েছেন নিজেকে, বলেন 'তোমার কান্না আমার হাতে আনন্দ মন্দিরা।' তিনিই যৌবন বাউল কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁর আবেগে, মননে, মেধায়, ভালবাসায় স্বকীয়তায় সৃজনশীল কবি অন্তরমনিত করে পরিবেশন করেছেন কবিতা। তিনি শুধু বাঙালী নন, কেবল ভারতীয় নন, এই বিশ্বনাগরিক কবি নান্দনিকতার স্বতঃস্ফূর্ততায় লিখেছেন 'যৌবন বাউল', 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', 'রক্তাক্ত ঝরোখা', 'ছৌ কাবুকির মুখোশ', 'গিলোটিনে আলপনা', 'লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে', 'জবাবদিহির টিলা', 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে', 'দুই বন্ধু, এবার চলো বিপ্রতীপে', 'ধুনুরি দিয়েছে টংকার', 'নিজস্ব এই মাতৃভাষায়', 'মরমীকরাত', 'আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয়', 'রক্ত মেঘের স্কন্দপুরাণ'। এগুলি নিয়েই এখানে আলোচনা করতে চাই।

কবি অলোকরঞ্জন ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী কবিতা থেকে 'ভিনদেশী ফুল' অনুবাদ করেছেন কবি আলোক সরকারের সঙ্গে। এজরা পাউণ্ড 'ইনটেলেকচুয়াল ইমোশনাল কমপ্লেক্স' বলেছেন যে অবচেতনকে, সেই অবচেতনের ভূমিকাতেই যেন আছে গোপনে 'যৌবনবাউলে'র মর্মার্থ। কবি বলেন, একটা স্বকপোলকল্পিত নিরাপত্তার সৌধ শিবিরে আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাইনা। আজ সারা বিশ্বের অর্নিদেশ্য নিয়তি এত বিপুল একটি সংগঠন যে তার সঙ্গে একটা একাত্মীকরণের এষণা আমাকে অধিকার করে নেয়'—(কবিতীর্থ—৬৩ পৃষ্ঠা, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ)।

কবি অলোকরঞ্জনের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে আলাপ হয়। অমায়িক সরল প্রকৃতিগুণী মানুষটি আমার মত সাধারণ এককবিতা প্রেমীকেও তাঁর যাদবপুরের বাড়ীতে স্নেহের আহ্বান জানান। বাংলাভাষায় বিখ্যাত গুণী কবির কখনও অভাব নেই একথা ঠিক তবে যিনি 'অর্ধেক সিমেষ্টার হাইডেলবার্গে ও বাকী অর্ধেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটালেন (তিনি আমার দুই কলেজ শিক্ষকের শিক্ষক) তিনি আমার গুরুর গুরু, তিনি বলেন 'বাংলাভাষা আমার বিশ্ব'—আমরা বলি কবিকণ্ঠ চিরজীবী হোক। 'রৌদ্র যখন মুদ্রিত

নীল নভে/ পঞ্চপাপড়ি সূর্য ওখানে যদি/ ঘন আশ্লেষে উদ্যত' তখন তিনি 'জড়িত গোলাপ জড়িত বকুল'-এ বলেন, 'আমি কোনোদিন কোথাও যাব না আমার বাগান ছেড়ে/ আমার বাগান আমায় ছাড়বে এ মাটি আকাশতলি.......জীবনের হাতে মৃত্যুর কাছে আমি পুষ্পাঞ্জলি, ' 'মেঘের মামুর' এ বললেন 'নিথর শূন্যে মিলিয়ে গেলেন নশ্বর ঈশ্বর' খণ্ড খণ্ড নানা ভাবনার পথগুলিতে তিনি নিজেই অভিযাত্রী, সনাতন এবং মূলকে মেনে নিতে গিয়েও দ্বিধাতুরতা, নিজের অন্তরসত্তার পুষ্প ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত, 'হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে' 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'তে বিলাসী সমাজ জীবনের আড়ালে এক অন্তঃসারশূন্য বিষন্ন অস্তিত্ব এবং দ্বন্দ্ব জটিল ও সংঘাত মুখর সামাজিক পারিপার্শ্বিক 'সারা শহর কুয়াশায়' বুকের ওপরে মাধবীকুঞ্জলতা উঠে এসেছে (কুঞ্জমাধবী)। 'এক চিলতে 'রোদ' অন্বেষণে ক্লান্ত' কবির উক্তি— 'দোহাই বড়ো বড়ো নামজাদা রৌদ্রের সামাজিক শ্যাওলায়/ তোমরা আমার পায়ের শিকড় জড়িয়ে দিওনা'। জীবনের গভীর সত্যে 'উদ্বোধিত' কবি সময়ের চেতনায় ঋদ্ধ', 'চতুর্দিকে সময়ের স্তূপ/ব্যক্ত অব্যক্তের মধ্যে ঘড়িতে অস্তাগ্নি ধরে গেল'। 'নারী' এখন অনুশীলিত মূল্যবোধ। 'হাত পা বাঁধা এখন আমার আলোয় এবং অন্ধকার' (স্থগিত)। নিজের পুরুষসত্তার গহন মূল থেকে দ্রুতগতিতে খেলা ফেলে যে চলেযায় সে 'মেয়ে তোনয় কয়েকগুচ্ছ প্রবঞ্চনা।'

'রক্তাক্ত ঝরোখা'য় ভাঙা সাঁকোর ধারে পারিজাতের
বাগান ফুটেছে/ শ্রোতারা তবু নিদ্‌পাথর।'

এক নান্দনিক বিপ্লবের সঙ্গে সংবেদনশীলতা মিশে যায়। বহুমাত্রিক চেহারার শিকড়ের সন্ধানে চিরচেনা শিল্পের কারিগরি (যেন আঙ্গিক না ভুলি) 'অযুত সূর্য মুখ/দলাদলি করে, ছায়া ছল্‌কায় নদীর জলে।' তাঁর প্রজ্ঞা, উপমা এবং মার্কসও সাংখ্য দর্শনের পৃথিবীতে জগৎভৌম, দেশপ্রেমিক যৌররূপকে খুঁজতে চেয়েছেন। এই গ্রন্থের নাম কবিতাটি চব্বিশটি স্তবক নিয়ে রচিত। শেষ স্তবকে আছে 'তোমাদের সব দিলাম ভালোবেসে/ তুমি ওদের দিয়ো।/ বাটিকে আঁকা তোমার মুখ মেশে বিষম রাত্রিত/চব্বিশটি স্তবকে যেন নানা ধরণের আবেগ মথিত হয়ে মননের এক একটি স্তম্ভ তৈরী হয়েছে। তিনি হাঁ-ঈশ্বরে' মন দেবেন কি 'না-ঈশ্বরে' মনদেবেন এ নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলা যায় না। 'আমন ধানের চন্দন থেকে নিঃ সৃত রোদ্দুরে। ...তোমাকে স্নান করাই (ঘরোয়া)

অলোকরঞ্জনের 'ছৌ কাবুকির মুখোশ' কাব্যে লোকজ উপাদানে প্রতিবাদীভাবনার প্রকাশ দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। বিশ্ববেদনার সঙ্গে আপন অন্তরের আনন্দবেদনা এবং আকুতিকে সমীকৃত করে দেওয়া হয়েছে এখানে। 'নাগপঞ্চমী' একটি লোক-উৎসব যা সর্পিলভাবনার আবর্তে প্রবৃত্তির গুহা থেকে পূর্বরাগে যোগ দিতে চাইছে। 'আমরা ডুবব মধ্যগাঙে অভিন্ন স্বভাবে (নৌকাবিলাস) সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে (আঙ্গিকের) লিখিত হলেও

'ঋতুসংহার' কবিতায় বলা হল 'শিকার নিজেই কেন প্রবল শিকারী হয়ে ওঠে'। দিলীপ কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের কথাগুলি স্মরণ করে বলা যায়— 'কলকাতা, গ্রাম বাংলা, এমিল নোলডের আঁকা টেবিলে চা খাওয়ার দৃশ্য থেকে মন্দির-গীর্জা, শিলারের স্ট্যাচু শ্রমণ ও হিপিদের কথা সবই যেন লোকজ বৃত্তকে অনেক বড় করে দেখায় এবং অনুভূতির গোড়ায় ধাক্কা দিয়ে যায়।

'গিলোটিনে আলপনা'র পর্বের কবিতাযাপন বদল হলেও তীক্ষ্ণ হয়ে যায় সূচীমুখ, অন্য কবিদের মত ভাবনার সীমাবদ্ধ তা বিশ্বাসের মৃত্যু, মনুষ্যত্বে ক্লিন্নতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নানা চিন্তায় নিজের এক-একটি প্রেক্ষিতকে তুলে ধরেছেন। 'আমাকে অপৌরুষের সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে হবে (আমি হব না তার জনক)। আমি পুণ্য আর পাপ এ দুই বন্ধনদশা থেকে/তৃতীয় বন্ধনী খুঁজি সে কি প্রেম? (মোম) অথবা। 'এখন বাড়ির পথ ঘুরে গেছে গহন কান্তারে (এখন বাড়ির পথ) কোনো স্থানিক বা কালিক ইতিহাসেই তাঁর কাব্যভাবনা সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বাত্মক চেতনা ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে তিনি লিখতে থাকেন। নিসর্গ কোথাও জীবিত হয়ে কবিচিত্তের সুতীব্র সংরাগকে ডুবিয়ে দেয়, বক্তব্যের অন্তরস্থিত আকুলতা, উপলব্ধির তীক্ষ্ণতা এবং দৃষ্টির গতিমান দীপ্ততা এখানে উপস্থিত, ভাষা কল্পনার অভিনবত্বে স্নিগ্ধ সুন্দর দুরন্ত দুর্যোগে ও রোম্যান্টিক বেদনাবোধে জায়মান 'এখন সকাল এবং রাত্রি তোমার তো স্বরচিত/কবিতার মতো, রাত এসে পড়ে/ তুমি তার চেয়ে বয়স্কতর...রাজপথে তুমি অক্ষরে অক্ষরে/ রাত দশটায় শেফালি ঝরিয়ে পুলকে জর্জরিত/ সবুজ এনেছ, দুঃখকে তুমি কেন দেখ সুনজরে (সবুজ এনেছ) সবুজাভ বনের মধ্যে কিছু যে সুস্থির নয়, 'প্লাবনের শেষে' রয়ে গেছে শুধু দানসাগরের ত্রাণ সামগ্রী।...কালো কাশবন ঘিরে আছে কালো শিউলিজঙ্গল' 'অন্য ঘরে দারুণ আশ্বিন কবিতায় ঘর বদল করলেই শরৎ/ 'আমার আঁজলায় এসে এক থোকা, শেফালি হুলুস্থুল। 'লঘু সংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে' নাম কাব্যগ্রন্থের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রেম, প্রকৃতি, ভেতরের আলোড়ন ও গতি ধ্বনিও শব্দ বিন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন। 'অদ্বিতীয়' নাম ছোট্ট কবিতায় (কবিতিকাই বলা চলে) শব্দের কি সুন্দর গলাগলি। ঘুর জাগরণে জাগরণ ঘুমে/ একটি শব্দ লিখে রাখি 'ভালবাসা'। ছেলেবেলা কানে ভাললাগা একটি দুটি শব্দ দিয়ে কবিতা 'রেলগাড়ি ঝমাঝম'—শীতের ভিতর শারদ্যোৎসব এনে লোকটি ঘুমিয়ে আছে। কোঙ্কনীভাষা পাখিবলে ছিল' আবার 'নাম' কবিতায় কঙ্ক না নীল, হলদে খঞ্জন, রাজশকুন—শেযাবধি নামহীনতার জামিন/ রেখে আমায় পাখি হঠাৎ পালিয়ে গিয়ে বাঁচে।' গবেষক অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'বিহঙ্গ-চারন' নামক অসাধারণ বইটির কথা মনে পড়ে। পাখিসম্পর্কে এরকম উৎকৃষ্টকে আলোচনা তো নেই বললেই চলে, অলোকরঞ্জনের পাখির দুটি ডানায় : একটি শুশ্রূষা ও অন্যটি শিল্পের বারবার অনেক জায়গায় পাখীর সঙ্গে বুলিফোটা, অস্থিরতা, সংযোগ সাধনকরা, দূতের মত ভূমিকা, জীবন,

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

সময়ের ও স্থানের ব্যাখ্যা—এতগুলো **Dimension** বা মাত্রা বোঝায়। ভাষায় প্রতি ভালবাসা পরিবর্তন, অতীতচারিতা, সমকাল, জীবনমুখিতা এর, সমকালের কথা বলা হয়েছে। 'খেউড় বাঁশের বাঁশি হাতে সংসার ও সন্ন্যাসের মাঝখানে কবির মন ও লেখনের মূল্যায়ন হতে পারে। পাখির গানের সুর ও বাঁশির সুরের মধ্যে দিয়ে যেন **'composite symbol'** রচিত হয়েছে।

'জবাবদিহির টিলা'য় বলা হচ্ছে 'বাহনেরা..../ দেবদেবীদের জায়গা জুড়েছে। এখন দেবায়তনে/ জাগে দক্ষিণ রায়।।' **'God'** এর চেয়ে **'Demi God'** এর প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি সৃজনশীল কবির মনে যে বিচিত্র বর্ণালির আবহ নির্মাণ করতে পারে তার ভাষাও হৃদয়গ্রাহী। 'ভাদ্রের বেলায় রাত্রি এসে পড়ে...অন্ধকূপে ঝাঁপ দেওয়া মানুষ রাত্রি এসে পড়ে... অন্ধকূপে ঝাঁপ দেওয়া মানুষ রাত্রির নাগরিকতা পেতে ইচ্ছুক (রাত্রিনগর)।

অলোকরঞ্জন কবিতার ভুবনে মৃদু কৌতুক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল—তর্পণ সতীর্থের প্রশ্নের উত্তরে 'প্রয়াতি জনকের পিণ্ডের' কথা না বলে বললেন 'বলি আমি বেড়াতে এসেছি'। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে কবিবন্ধু অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত' প্রকাশ করেন, আবার হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক বিশ্বসাহিত্য পড়ান (পশ্চিম জার্মানী)। প্রকাশ করেন **Goethe and Tagore'**। ইয়েটস্, এলিয়টের দ্বারা প্রভাবিত এই কবি ভগবান তথাগতের ধর্মকেও ভালবাসেন। কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে অনেকে তাঁর মিল ও অমিল খুঁজেছেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিজীবীদের জগতের সারিতে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি ক্রমশ আত্মতন্ময়তার বৃত্ত ভেঙেছেন। সত্যের সঙ্গে শাশ্বত আবহমানতার সঙ্গে আধুনিকতা পুরাণ **Myth** এর প্রভাবে লেখা 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে'। 'তাইরেসিয়াসে', **Myth** এবং **Tabu**র প্রসঙ্গ আছে। এখানে আশীর্বাদ ও অভিশাপের যুগপৎ উপস্থিতি-এ শেষ কথা—'পরিণামে স্পষ্ট কোনো মুক্তি নেই'। 'ব্যক্তিপরিচয় মুছে' গিয়ে ব্যষ্টির কথা আছে। 'তীর্থযাত্রী' বনে/এসেছিল যারা পথেই/শরণার্থী 'সকলে বলে গেছে' (অর্ধকুম্ভ) 'দুই বন্ধু'তে তিনি 'মেরুণ আকাশে' কবিতার আগুন দেখতে পান।

মনন ও হৃদয়ের অবিভক্ত আকাশতলে কবি কি অন্বেষণ করেন। 'চলতে থাকার চাল চিত্তি'র-এ সূর্যঘড়ির গোলদিঘিতে—মৌসুমী মেঘের পরামর্শে, যে 'সূর্যঘড়িতে/আর কোনো প্রহর সংকেত পড়ে না।' আস্তিক্যবোধ, সত্য, সুন্দর, মানবপ্রেমের প্রমিথিউস-স্বরূপ বাক বিভূতিতে 'লিরিক্যাল অধ্যাত্ম চেতনার সৌন্দর্য থেকে বেরিয়ে আসেননি। তিনি 'দুঃসাহসী' বা 'নির্দলীয়' নাম দিয়ে আখ্যা নিয়ে থাকতে চান না, 'এ ক'বছরের -চুক্তির পুণ্যাহ' শপথ করেন, 'পুণ্যাহ' শব্দটির মধ্যে সেই দিনের কথা আছে যেখানে রাজা প্রজার মধ্যে সহজ

সম্পর্কের কথা বলা হয়। সৃজনের বৈচিত্র ও প্রতিভার দীপ্তিতে শব্দসজ্জায় চিত্রাঙ্কনের কৌশল, স্বকীয় প্রজ্ঞা দৃষ্টি জার্মানীর এক লগ্ন ভালবাসার রূপালি আবেশ। রূপালির আভায় প্লাবিত অন্ধকারে—দু'দলের খেলা 'দেখতে থাকেন, বেদনার অমেয় কথন নিয়ে অন্ত্যর্থক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলেন 'এবার চলো বিপ্রতীপে'— 'লোকশিল্প' কবিতায় তাল তাল রোদ্দুরের কথা আছে। শাশ্বত হয়ে চাওয়ার পাশে সামাজিক অঙ্গীকারের কথা তিনি অন্যত্র বলেছেন, মানুষের জাগ্রত চৈতন্য রোদ্দুরের মত যেন আলোর খোলায় সমীকৃত হয়েছে। এক অগাধ স্বচ্ছমুক্তির ঐকতান য়েন তাঁর কবিতার চরণে চরণে ছড়িয়ে আছে। 'সীমাশুল্ক' কবিতায় 'নিজেকে তাই দায়ী করেছি, অষ্ট্রিয়া আর সুইজারল্যাণ্ড/সীমারেখায় দাঁড়ি করিয়ে লক্ষ করে আমার গতিবিধি'। প্রণতি ভাবনার সঙ্গে আবেগ ও যুক্তির যুগ্ম মিশ্রণে তিনি কোথাও কোথাও বিপরীত প্রতিসাম্য তৈরী করেছেন। নির্বিকার, নির্বিচার, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শ্বাসরোধকারী নির্জনতায় বিপ্রতীপে চলার পটভূমি লক্ষ্য করা যায়। ভাবধর্মের সঙ্গে শৈলীর প্রতি যত্নবান কবি, মাটি-ঘেঁষা বলা যাবে কিনা তা তর্ক সাপেক্ষ, তবু 'সংক্রান্তির দিনে ভাঁটফুল আর আলেয়া খই ডালায় ভরে/এগিয়ে গেছে মেয়েরা' 'পাছুড়ি কাদা', 'শিশিরের নিভৃত শিকড়ে, শিশুগাছ, পালকি, দুর্গাপ্রতিমার চাঁদ, কাটোয়া ডাঁটার সবুজাভ, হরিচন্দনের মাটি 'অনবদ্য এই নশ্বরতার মধ্যে পাওয়া যায় জার্মানী থেকেও বাংলা তথা ভারতের গ্রামের পথে মাছরাঙা পানকৌড়ি, মেঘকুয়াশা, শ্বেতচন্দন, রাজস্থানের গোধূলি পেরিয়ে ময়ূরের পেখমের মত সুন্দর এক রামধনু মনের কথা। জীবনকে চিরায়িত করার বিষয়ে শিল্প আজ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে যেন একশো আট নদীর বাঁকের পিছুটান তাঁকে ধরে আছে। আর বঙ্গসংস্কৃতি সভ্যতার অরুণ বরণ ভোরের পাহাড়তলিতে 'ধীমন্ত ভোরবেলার রামকেলি রাগের সুর শুনতে পাই, জার্মানী ভারতের স্বেদাক্ত শ্রমিকেরা/কোন সাঁকো দিয়ে যাবে তা ঠিক করেন। সূর্যমুখী, ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ্—সব মিশিয়ে এক আশ্চর্য, composition তৈরী হয়েছে। 'ধুনুরি দিয়েছে টঙ্কার'-এর পরে অতসীরঙা মেঘের দেশ থেকে এলেন 'লাল জবা গুঁজে পাশের অরণ্যেই আয়না দিঘির ধারে' (দাবানল) 'লাল জাবার রক্তিমতা আর দাবানল সময়কে উন্মোচিত করে, যিনি বার্লিনের দুদিক থেকে শাদা কালো খঞ্জনের প্রসঙ্গ এনেছিলেন, মায়াবী লীলায়িত অভিব্যক্তি আর সুরেলা সংবেদনের অনুরাগকে যিনি শাশ্বত অভিমুখের দিকে আনেন তিনিই অলোকরঞ্জন, যাঁর রঞ্জনরশ্মির মত দৃষ্টি তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নেয় 'এখন মতান্তর বড়ই জরুরি তা নাহলে/ আর কোনোদিনই আমরা/ পরস্পরের মধ্যে নিজেদের খুঁজে পাব না (সংবের্তর বারান্দা)। 'কলকাতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অনুভূত হয় আসলে কলকাতা আমাদের হাওলা জামিন।..... কাউকেই কর দিতে হবে না, কিন্তু বড়ো কঠিন শর্তাধীনে/অর্জিত এই জমি।'

'মরমী করাত' এ নাম কবিতায় কবির উক্তি 'বিশ্বাস, তুমি' ঘুমিয়ে আছে। না জেগে' ঘর-বিবাগী নদীর মত সংরাগী এক হৃদয় তিনি যাচনা করেও পান না, শরণার্থীর মত শুরু

জল চিরে নিয়ে করাতে। ঘর বিবাগীর প্রশ্ন। সেই কি তবে আমার নতুন বাড়ি,' শরণ অর্থাৎ আশ্রয় চাই, শরণার্থী শান্তিপ্রিয় নিরীহ সুন্দরের ব্যঞ্জনায় কবিকণ্ঠ মিলে যায়। 'দৃপ্ত বিশ্বনাগরিকতা' তাঁকে ছুয়ে যায়।' তিনি লিখলেন নিজেদের দিকে দেখার কথা, 'আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয়' তাঁর প্রতিবাদী সত্তা ডিনামাইট' নিয়ে আগাছা (জীবাশ্ম কবিতা) সরাতে চায়। 'নিরাপদ ব্যবধানে' নয়, ভালবেসেই ঘটাতে হবে বিস্ফোরণের কাজ। এল্দেরাদোর আভাস থেকেও যায়, ব্যক্তি থেকে নৈর্ধ্যক্তিক হয়ে যেন আত্মমুকুরে পাথরের অবরুদ্ধ চিৎকার শুনতে ও দেখতে পান, নেলসন ম্যাণ্ডেলার সংগ্রামকে কবি শ্রদ্ধা করেছেন। তাঁর ভারতের সঙ্গে সখ্যতাকে মান্যতা দিয়েছেন। চলেছে বলিষ্ঠ কণ্ঠের আর্ত প্রতিবাদ, গ্রিক ট্র্যাজেডির মত বিষণ্ণ মেদুরতার ব্যঞ্জনা, লেখা হয়। 'রক্ত মেঘের স্কন্দপুরাণ।'

অলকরঞ্জনের আত্মিক ঐশ্বর্যে আত্তীকরণ ঘটে যায় বহির্বিশ্বের ঘটনাগুলি। গহন নির্জন পথে সময়ের ধারক ও বাহক তিনি, 'রন্ধ্রে রন্ধ্রে এসো গুর্জরী টোড়ি'—নতুন প্রভাতের আহ্বান, কারণ এই রাগটি সকালের আলোর মত সুন্দর ও সকালেই পরিবেশিত হয়। 'অনপনেয় আত্মপরিচ' দিয়ে জীবন সত্য ও পিলসুজাকে বাঁশি করে বাজানোর শখ, এখন সকালবেলার সুর আর বাঁশির সুরের মেলবন্ধন, তাঁর আত্মিক সম্পর্ক স্বদেশ তথা বিশ্বের সঙ্গে। 'যাবার পথ ছুটিয়ে যত দেশ/ মজা করেছি ফেরার পথে দেখি/ সে সব দেশ বিভক্ত হয়েছে,' এ যেন আরোহনে যেস্বর গুলি লাগে অবরোহনে তা নেই। আবেগ চিন্তনে তাঁর বিশ্বাস ও অবিশ্বাস সমন্বিত হয়। আরোহণ অবরোহণ মিলিয়েই তো একটি রাগের চলন বোঝায়, তাই বোধ ও বিরোধের কেন্দ্র সত্তার মধ্যে এক অখণ্ডতা বিরাজ করে, যা একটি জীবনের রাজ সংরাগকেই ব্যক্ত করে, অনুশীলিত সারল্যের বাতাবরণ প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরোধী, কবি বলেন 'মৌনব্রতী নই, তবু একটি অব্যক্ত মেঘ রেখে যাব'।

উল্লেখপঞ্জী :

১। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : কবিতা সংগ্রহ (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড)
২। তরুণ মুখোপাধ্যায় : অলোকরঞ্জন (সৃজনে সংরাগে)
৩। ঋতম্ মুখোপাধ্যায় : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (এক মেধাবী বাউল)
৪। হিন্দোল ভট্টাচার্য : শতকসন্ধির অলোকরঞ্জন
৫। উৎপল ভট্টাচার্য : (সম্পাদিত পত্রিকা) কবিতীর্থ গ্রীষ্ম বর্ষা (১৪২৮) সংখ্যা
৬। গৌতম মণ্ডল : (সম্পাদিত পত্রিকা) আদম (ফেব্রুয়ারী ২০২১)

বাংলা কবিতার অন্যতম কারিগর ও শিক্ষক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অঞ্জনা দেব রায়

"প্রকৃত অর্থে ভাষাটাই আমার দেশ, আমি ভাষার শ্রমিক। আমি আমার নিজের ভাষা তৈরি করে নিতে চাই। আমি আমার অবস্থানকে দ্বৈরথ অবস্থান হিসাবে দেখি না। আমি দেখি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে। আমার ভাষাই হচ্ছে আমার আবাসন। প্রবাসে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি এই আবাসন অটুট রাখার এবং এই আবাসনের উৎস থেকেই উৎসারিত হয় আমার কবিতা। এই কথাগুলো যিনি বলেছেন তিনি হলেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি কবি ও চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁর রচনার প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্যে ও সংবেদনশীলতায় তিনি বাংলাসাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছন্দনৈপুণ্য এবং ভাষার কারুকার্য যেমন তাঁর কাব্য অবয়বকে একটি স্বকীয়তা দিয়েছে , তেমনই বৈদগ্ধ্য , বিশ্বমনস্কতা কাব্য জগতকে দিয়েছে বিশালতা এবং নান্দনিক সৌন্দর্য।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মা নীহারিকা দাশগুপ্তের একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা গিয়েছে মাত্র ছয় বছর বয়সে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত হঠাৎ করে মুখে মুখে মাকে দুটি লাইন শোনায়। লাইন দুটি হলঃ 'হরিণগুলো চরে বেড়ায় বনে বনে /তারা কথা বলে মনে মনে'। এইখান থেকেই বোঝা যায় শিশু বয়েস থেকেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিত্ব প্রতিভার উন্মেষ। আসলে কবি হয়েই জন্মগ্রহন করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় আছে বহুমুখী স্রোতধারা। তার মধ্যে প্রধান একটি দিক হল তিনি অনন্য এক মধুরকে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন তাঁর অনেক কবিতায়। তাঁর একটি কবিতার নাম 'শিশুমহল'। সে-সময়ে রেডিওতে প্রতি রবিবার সকালে 'শিশুমহল' নামক একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হত বাচ্চাদের জন্য। রেডিওর সেই নামটিকে লেখার শিরোনামে নিয়ে এসেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অপূর্ব এই স্নেহের কবিতায়। কবিতাটি তাঁর ভাইকে নিয়ে লিখেছিলেন। কবিতাটি হল :

ও শিশুমহিলা, আমি এ-পার্কে প্রতিদিনই
দেখেছি আমার ভাই পিন্টুর সঙ্গে; ক্রীড়নক
আমারও হৃদয় যেন তোমার দু'খানি হাতে, ঋণী
তোমার দিঠির কাছে। হালকা গোলাপী হলদে ফ্রক
লাল নীল রিবন আর সেলুলয়েডের করুবক

ব্যবহার কর তুমি। মাঝেমাঝে মিন্টু-রুবি-মিনি
খেলায় যোগ দেয়, তুমি বাধা দাও না। হাওয়ায় অলক
সূর্যকেও প্রভাবিত অপ্রতিভ করে, বিজয়িনী !
তোমার প্রহরী এক পুরুষ দেখেছি, প্রৌঢ় তিনি।
বাবা কিংবা মেজোকাকা — কীরকম সে অভিভাবক।
ও শিশু মহিলা, তুমি কবে হবে পিন্টুর গৃহিণী ?

আবার আর একটি কবিতার নাম 'তীর্থযাত্রী'। এই কবিতাটি মা-কে নিয়ে লিখেছেন। কবিতাটি হল :

মা আমাকে নিয়ে একদিন, হাত ধরে
গিরিবর্ত্মের মতো এই বাঁক পার করে দিয়েছিল
ক্ষুধার্ত পথ, পথের দুরূহ প্রান্ত;
কাঁকন — খোয়ানো কালো এই গলি
দস্যু অধ্যুষিত
ফাটল —স্ফারিত
প্রকান্ড ময়দান
হাত ধরে পার করেছিল একদিন।
মাকে আমি আজ হাত ধরে ধরে এ-পথ করাব পার
মা আজ আমার শিশু
সতর্ক হাতে ঢাকি দু-একটি রূপালি চুলের গুছি
আপাতত এই ক্ষুধিত পথের ক্ষুরধার চক্রান্ত
কামক্রোধমোহমোহ্যন্তব্যবসায়ী
পার হয়ে যাই, মা কিছু জানেনা, মা আজ আমার শিশু।।

প্রেমের কবিতা লেখায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এক অসাধারণ মাধুর্যের সঞ্চার করে গেছেন তাঁর সারাজীবনের কাব্যচর্চায়। অনেক সময় সেসব প্রেম প্রায় নিরুচ্চারিত। 'ছৌ —কাবুকির মুখোশ' গ্রন্থে আরও একটি অপূর্ব কবিতা পাই। এই বইটির উৎসর্গের পৃষ্ঠায় লেখা আছে-'ট্রুডবার্টা হেসলিংগার'। এই ট্রুডবার্টা-ই পরে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের : ঘরণী হয়েছিলেন। কবিতাটি হল:

কদম্ব দিল আরোগ্য ভোরবেলা
আমি তো রুগ্ন হবার আশায় নিজেকে জ্বেলেছিলাম ;

রেণুতে জড়ানো সবুজ রৌদ্র আমাকে দিল আরাম
আর আমি ধরা আরোগ্য নিয়ে তোমার কুমারীনাম
কেড়ে নিয়ে মুছে দিয়াছি তোমার নিজের সঙ্গে খেলা।

এইভাবে দেখা যায় আত্মীয় পরিজনরা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় এক- এক করে দেখা দিয়েছে। আবার নিজের একান্ত পরিজনদের থেকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের হৃদয়ে স্নেহ-সীমান্ত ব্যপ্ত হয়ে পড়েছিল সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে আপন পরিবারের অন্তর্গত করে নিয়ে। আত্মীয়তাবোধ থেকেই বিশ্বের যে সব যুদ্ধ হয়েছে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর কবিতার মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছেন এবং তিনি 'যুদ্ধের ছায়ায়' নামক একটি বইও প্রকাশ করেছেন।

কবি শঙ্খ ঘোষকে সাথে নিয়ে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদনা করেছেন অনুবাদের এক মহাগ্রন্থ যার নাম 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত' — সেখানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের কবিতার বাংলা অনুবাদ স্থান পেয়েছে। বন্ধু আলোক সরকারের সাথে ' ভিনদেশী ফুল' নামে একটি অনুবাদের বই তৈরি করেছেন। মহাকবি গ্যেয়েটের লেখা অনুবাদ করেছেন যার নাম 'প্রাচীপ্রতিচীর মিলনবেলার পুঁথি'। আমাদের দেশের সন্ত কবি সুরদাস-কেও নতুন করে তুলে ধরেছেন তাঁর 'সুরদাস সঞ্চয়িতা' নামক বইয়ে। এছাড়া সমস্ত জীবন ধরেই অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বাংলার অজস্র লিটিল ম্যাগাজিনে অকৃপণভাবে তাঁর কবিতা ও গদ্য বিলিয়ে দিয়ে গেছেন।

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের প্রথম কবিতার বই 'যৌবন বাউল' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯-এ। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই তাঁর কবিতার পঙক্তি কবিতা রসিকদের মুখে মুখে ঘুরত। হয়তো একারণেই অলোকরঞ্জনকে 'পঞ্চাশের কবি' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। পঞ্চাশে বাংলা কবিতার প্রধান দুটি মুখপত্র — 'শতভিসা' এবং 'কৃত্তিবাস' উভয় পত্রিকাতেই তিনি লিখেছেন। তাঁর বয়স যখন যোল তখনই (১৯৪৯) তাঁর কবিতা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাল্যবয়সে শান্তিনিকেতনে পড়াকালীন সহপাঠী অমর্ত্য সেনের সঙ্গে 'স্ফুলিঙ্গ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম কবিতার বইটির পর আরও অন্তত পঁয়ত্রিশটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে, অনুবাদ কবিতা বই বেরিয়েছে অনেক। আর পর্বে পর্বে তাঁর কবিতার ধাঁচ বদলেছে, যেটা বড়ো কবিদের ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল কবিতা- যাত্রায় একান্ত স্বাভাবিক। কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি বহু বাংলা ও সাঁওতালি কবিতা ও নাটক ইংরাজি ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কালিদাসের শকুন্তলার' অপূর্ব অনুবাদ জার্মান ভাষায়। আবার জার্মান ও ফরাসি সাহিত্য অনুবাদ করেছেন বাংলায়। তাঁর বেশ কয়েকটি

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

প্রবন্ধের বই-ও আছে। তাঁর গদ্যরচনার বিশেষ ভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে আলাদা স্থান করে নিয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্মানি পর্যন্ত তাঁর অধ্যাপনার জগৎ বিস্তৃত। ১৯৫৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে অধ্যাপনায় যোগ দেন। তাঁর ডক্টরেটের বিষয় ছিল 'ভারতীয় লিরিক উৎস ও ক্রমবিবর্তন'। এরপর আলেকজান্ডার ফন হুমবোল্ট রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়ে তিনি পশ্চিম জার্মানির -ডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব বিষয়ে ১৯৭১ থেকে অধ্যাপনা করেন। ভারতীয় ও জার্মান সংস্কৃতিকে কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রয়াসের জন্য জার্মান সরকার তাঁকে গ্যেটে পুরস্কার দেয়।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বহু পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর মধ্যে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধা বসু সন্মান (১৯৮৩), আনন্দ পুরস্কার (১৯৮৫), প্রবাসী ভারতীয় সন্মান(১৯৮৫),রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৮৭), জার্মানির শ্রেষ্ঠ গ্যেয়েটে পুরস্কার (১৯৮৫), কাব্যগ্রন্থ 'মরমী করাতের' জন্য ১৯৯২ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল—'যৌবনবাউল'(১৯৫৯), 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', 'রক্তাক্ত ঝরোখা', 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ'(১৯৭৩), 'গিলোটিনে আলপনা'(১৯৭৭), 'সে কি খুঁজে পেল ঈশ্বরকণা'(২০১২), 'নিরীশ্বর পাখীদের উপাসনালয়ে'(২০১৩), 'এখন নভোনীল আমার তহবিল'(২০১৪) , 'আলো আরো আলো', 'পাহাড়তলীর বাস্তহারা', 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে'। প্রবন্ধগ্রন্থ হল —'শিল্পিত সমাজ' (১৯৬৯), 'স্থির বিষয়ের দিকে' (১৯৭৬)। অনুবাদ ও সংকলন গ্রন্থসমূহ হল — 'প্রেমে পরবাসে' (১৯৮৩), '-নের কবিতা', 'অঙ্গীকারের কবিতা'(১৯৭৭), 'প্রাচী-প্রতীচীর মিলনমেলার পুঁথি', 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত'।

তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে —' শরণার্থীর ঋতু ও শিল্প ভাবনা', 'ভ্রমনে নয় ভুবনে', 'ছায়াপথেরা সান্দ্র সমলাপিকা'। এছাড়া আর কয়েকটি গ্রন্থ যেমন — 'জীবনানন্দ', 'নওল কিশোর এসেছে বুকের তলে', 'ছড়া খুঁজতে তেপান্তরে', 'তুষার জুড়ে ত্রিশূল চিহ্ন'। তাঁর সেরা কবিতাগুলি — এখন শান্তি ও যুদ্ধ, পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে, মৌলবাদী নই , চৌরঙ্গীর ফুটপাথে, বধুবরণ , ছেলেটি, বুধুয়ার পাখি।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস অটুট রেখেছিলেন। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যে প্রতিটি মানুষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সেই বার্তা তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে জানিয়েছেন। তিনি আর বলেছেন 'মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তাকে যদি কেউ স্বীকার

করতে না চায় তাহলে আমরা রাগ করতেও জানি'। ঐতিহ্যের প্রবহমানতায় বিশ্বাসী এই কবির এক সম্পূর্ণ পৃথক বাচনভঙ্গি, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব, দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা কবিতাকে। নিত্য নতুন শব্দের সন্ধান, অপূর্ব শব্দ বিন্যাস কবিতামনস্ক পাঠকদের তাঁর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করে। তাঁর কবিতার আলো পথ দেখায় বাংলার শাশ্বত নীতির সঙ্গে সহবস্থানের। তাঁর কবিতা আমাদের নিয়ে যায় অনন্তকালীন সেই সত্ত্বার কাছে, এক চিরকালীন অভিযানের সঙ্গী করে। বাংলা কবিতাজগৎ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের প্রথম যৌবন থেকে সাতাশি বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ — মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর লেখনীকে সন্মানের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

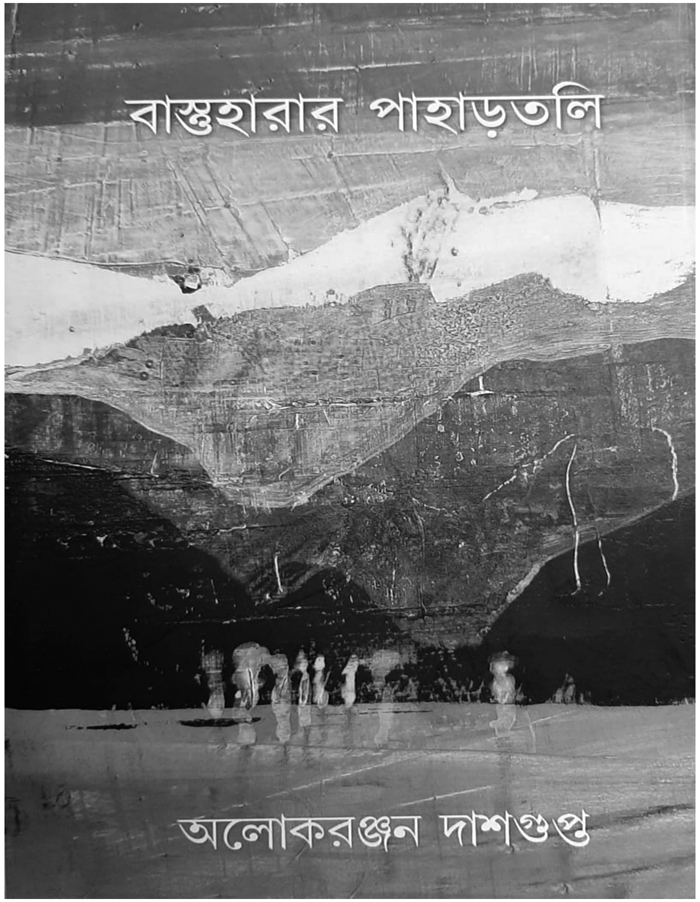

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় চিত্রকল্প : বৈশিষ্ট্য ও বৈভব

রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

(এক)

'চিত্রকল্প' অভিধাটি বাংলায় 'Image'-এর বিকল্প হিসেবে গৃহীত। অধ্যাপক অমলেন্দু বসু অবশ্য ব্যঞ্জনাসঞ্চারী 'বাক্‌প্রতিমা' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। আর অলোকরঞ্জন নিজে? রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণিঃ' থেকে আহৃত "'চিত্রজল্প' [১] কথাটি 'চিত্রকল্পে'-র একটি রূপভেদ বা নামভেদ হিসেবে পুনরায় প্রবর্তিত হতে পারে কিনা তার সম্ভাব্যতা বিচারের ভার পাঠকের উপরেই ন্যস্ত করেছেন। "চিত্রকল্প' শব্দটির ব্যাপক তাৎপর্য যেখানে কবিতা-পাঠকের মনে বিপন্নতা রচনা করে, সেইরকম কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অর্থের স্পষ্টতার জন্য 'চিত্রজল্প' শব্দটি অংশত কাজ চালাতে পারে কিনা, সেটাও নিশ্চয়ই পাঠকই নিরূপণ করবেন।"[২]

ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে 'Image' শব্দটির ঐতিহ্য এজরা পাউণ্ড-প্রবর্তিত 'Imagism' আন্দোলন-সঞ্জাত নয়, আরো অনেকদিনের। রোমান্টিক বা প্রিরাফেলাইটদের কবিতাতেই শুধু নয়, চসার, স্পেন্সার, শেক্সপীয়রের রচনা, এমনকী অজ্ঞাত প্রাচীন কবিদের লেখা ক্যারল, ব্যালাড, ছড়াতেও ইমেজের চিত্রপ্রদর্শনী। কীট্‌সের কবিতায় বর্ণস্পর্শময় অনুভূতিবেদ্য ইমেজের নৈবেদ্য, শেলীর কবিতায় আকাশ আর সমুদ্রের ছবি, ডানের কবিতায় বিজ্ঞান ও ধর্মের থেকে আহরণ করা ইমেজের সমাহার।

চিত্র থেকে চিত্রকল্পকে বিভক্ত করলেন ইমেজিজম আন্দোলনের ধৌম্য পুরোহিত এজরা পাউণ্ড (১৮৮৫-১৯৭২)। তাঁর এই কৃতিত্ব বেদবিভক্তা সেই কালো দ্বৈপায়নের মতো সৌর সুকৃতি না হলেও বিশ্বকবিতার ইতিহাসে এক চাঁদনি রাত তো বটেই। গত শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়াতেই এজরা পাউণ্ড চিত্রকল্পকে সংজ্ঞায়িত করলেন এইভাবে, An image is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time. তিনি আরও বললেন, It is the presention of such a 'complex' instantaneously which gives the sense of sudden liberation, that sense of freedom from time limits and space limits; that sense of sudden growth, which we experience in the presence of the greatest works of art. বুদ্ধি ও আবেগের এই জোটকে (complex) সংকেতময় করে মন্থর অতিকথন থেকে মহাভিনিষ্ক্রমণের প্রয়াস ইমেজিজমে।

সময় ও পরিসরের খণ্ডধারণা থেকে চিত্রকল্পকে মুক্তি-দিতে-চাওয়া, প্রাচীন গ্রীক লিরিক ও জাপানি হাইকু কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং রোমান্টিক ও ভিক্টোরিয়ান কবিতার প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত এই হ্রস্বজীবী অথচ তাৎপর্যপূর্ণ 'ইমেজিজম' আন্দোলন এক দশক যেতে না যেতেই কবিতায় আধুনিকতার বৃহত্তর আন্দোলনের স্রোতে মিশে যায়। কিন্তু ততদিনে কবিতায় চিত্র এবং চিত্রকল্পকে সে পৃথগ্ভূত করে ফেলেছে।

চিত্র আর চিত্রকল্পকে আলাদা করে দেখাতে আলোকরঞ্জন[৩] রবীন্দ্রনাথ থেকে পরপর দুটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন, প্রথমটি চিত্র, দ্বিতীয়টি চিত্রকল্প :

১। রাশি রাশি ভারা ভারা/ধান কাটা হল সারা

২। আমার ছুটি চারদিকে ধু ধু করছে/
ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো

শেষ দশকের রবীন্দ্রনাথ চিত্রকল্পের সচেতন ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত :

১। সেদিনের কথাগুলি/ দুর্লক্ষণ বাদুড়ের মত আছে ঝুলি (বীথিকা)

২। একটি রক্তিম মরীচিকা (সানাই)

৩। মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে (শেষ লেখা)

৪। এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি (নবজাতক)

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের একেবারে গোড়ার দিকের কবিতাতেও উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্পের সন্ধান পেয়েছেন আলোকরঞ্জন : 'জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে/ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা/ একেবারে উন্মাদের পারা।।' (সন্ধ্যাসংগীত)

মিতকথনের সৌজন্যে একটি সুসংহত ছবির মাধ্যমে কবিতাকে তুলে ধরাই ছিল ইমেজিজম আন্দোলনের লক্ষ্য। একটি শব্দবাহুল্যও যেখানে অবাঞ্ছিত। ফরাসি প্রতীকবাদ বা সিম্বলিজমের (Symbolism) উত্তরসুরি হলেও প্রতীকবাদ যেখানে সংগীতের ঘনিষ্ঠ, চিত্রকল্পবাদ (Imagism) সেখানে ভাস্কর্যের আত্মীয়।

বাংলা কবিতায় জীবনানন্দকে চিত্রকল্পের সম্রাট মনে করেন আলোকরঞ্জন :

১। অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।
—'অবসরের গান', ধূসর পাণ্ডুলিপি

২। সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে জাদুবলে।
—'লঘু মুহূর্ত', সাতটি তারার তিমির

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

I. A. Richards[৪] কে উদ্ধৃত করে অলোকরঞ্জন আমাদের জানাচ্ছেন, অভিজ্ঞতার সচেতন স্বীকরণ, সংকেতময়তা, অতীত অভিজ্ঞতার পরস্পরবিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিজীবনের পুরাঘটিত অনেক অবান্তর ঘটনা-ছাঁটাই : গ্রাহকরূপে এগুলিই হচ্ছে কবির পক্ষে প্রাথমিক প্রয়োজন।

তিনি মনে করেন, চিত্রকল্পের দায়িত্ব বা করণীয় যেটুকুই, যা উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক করে উঠতে পারছে না। 'এবং সমগ্র কবিতাটি সেই ইমেজকে গচ্ছিত রেখে অমোঘ, অভিঘাতে অব্যর্থ সার্থক হয়ে উঠবে।' জানাচ্ছেন অলোকরঞ্জন।[৫]

(দুই)

সংক্ষিপ্ত এই গৌরচন্দ্রিকার শেষে অলোকরঞ্জনের নিজের কবিতায় চিত্রকল্পের স্তরান্বিত প্রয়োগের আলোচনায় আসা যাক।

কবিতা ব্যক্তিমানুষের বিশ্বকাজ, সসীম ব্যক্তির অসীমতার ধারণা। যুগসন্ধির এই সময়ে আমরা পুরো আকার না-পাওয়া অথচ বাস্তব, এমন অনেক জিনিসকে শুধু এক পলকে দেখে নিতে পারি, কখনো কখনো তাকে প্রকাশ করতে পারি চিত্রকল্পে, চিত্রকলায়, তার বেশি নয়। প্রসঙ্গত, একজন চিত্রকর যেখানে কবির চেয়ে অনায়াস নিপুণতায় অভিজ্ঞতাকে এঁকে তুলতে সক্ষম, কবি তাঁর বাক্প্রতিমায় এমন কিছু ভরে দিতে পারেন, যা চিত্রকরের এলাকার অতিশায়ী সংঘটন।

প্রতি মুহূর্তে মানুষ যুযুধান জীবন-মৃত্যুর উন্মথিত আঘাত-প্রত্যাঘাতে জর্জরিত হতে থাকে। একজন মহৎ কবি এই সংগ্রামের গুরুভার নিজে বহন করে তাকে পালটে দেন কবিতায়, চিত্রকল্পে, মানবিক উচ্চারণে। যেমন করেছেন গ্যোয়েটে, কীটস, হুইটম্যান, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও আরও অনেক মহৎ কবি। নইলে আর মানুষের অবস্থার উন্মত্ততা আর নীরবতার ভেতর থেকে কোন্ বিয়োগফল তাঁর কবিতায় তিনি ধরে রাখবেন?

উত্তররৈবিক বাংলা কবিতায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের প্রথম কবিতার বই 'যৌবনবাউল' (১৯৫৯) এক স্বচিহ্নিত মাইলফলক। প্রথম কবিতার বইতেই ঐতিহ্যের প্রাণরসে সজীব, অথচ শব্দ ব্যবহার জীবনদর্শন, উপমা নির্বাচন এবং চিত্রকল্পের উদ্ভাসনে অভিনব এক কবির দেখা পাওয়া বিশ্বকবিতার ইতিহাসেই বিরল।

'যৌবনবাউল' বইয়ের প্রথম কবিতা 'বুধুয়ার পাখি'তেই পাচ্ছি একের পর এক অসাধারণ চিত্রকল্পের সুসংহত বিন্যাস। 'বুধুয়া' নামের এক প্রকৃতিলগ্ন প্রান্তিক কিশোরের দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতাটি সূচিত। এর শেষ স্তবকে পৌঁছে দেখি :

এইভাবে প্রতিদিন বুধুয়ার ডাকে
কানায়-কানায় আলো পথের কলসে ভরা থাকে,

ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি আসে, কেউ তার দিদি, কেউ মাসি,
রুপোলি ডানায় যারা নিয়ে যায় বুধুয়ার হাসি।।

পুরো স্তবকটাই যেন অমোঘ চিত্রকল্পের সৌজন্যে রূপকথায় উত্তীর্ণ, জাদুবাস্তবতার স্পর্শময়। চিত্রকল্পটির গায়ে এখনো যেন সকালবেলার সদ্যপাতী শিশির লেগে আছে।

'দেবযান' কবিতায় আমরা দেখতে পাই 'ভীমের মতন বীর, ভিতু এক জড়োসড়ো বাঘ'-এর আপাত বৈপরীত্যময় চিত্রকল্প। এ বইয়েরই সুখ্যাত 'আমার ঠাকুমা' কবিতা, যা ১৯৫৪ সালে সেনেট হলের ঐতিহাসিক কবি সম্মেলনে পঠিত হয়ে একুশ বছর বয়সী তরুণ কবিকে সকলেরই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছিল, তার শেষ স্তবকের অন্তিম বাক্প্রতিমাটি লক্ষ করুন —

'সাঁওতাল পরগণার গ্রাম মন্ত্রমুগ্ধ, রাত্রির সংকেতে
ভয় নেই, ঠাকুমার হাত কাঁপে, হাতে কাঁপে কুপী,
বাড়ির বারান্দা কাঁপে সে আলোয়, বাঁশবনের গায়ে
জড়োসড়ো পাতা কাঁপে, কাঁপে বনভূমি। তাকে ফেলে
কুপীর করুণ আলো অগ্রসর। হয়তো-বা—ভূমা
যে এখনো দূরগম্য, তাকে খুঁজে নেবে।
নিরুপায় প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যেন বড়ো একা আমার ঠাকুমা।'

মূলত দৃষ্টিগ্রাহ্য বাক্প্রতিমার পাশাপাশি 'জড়োসড়ো পাতা কাঁপে, কাঁপে বনভূমি'-র মতো কোনো কোনো অংশ **Kinaesthetic** বা চলিষ্ণুতাময় বাক্প্রতিমার সঞ্চার ঘটেছে। সাঁওতাল পরগণার রিখিয়া গ্রামের নৈশ ছবিতে আছে 'যৌবনবাউল' এর উৎসভূমিরও দিঙনির্দেশ। প্রসঙ্গত অলোকরঞ্জনের ঠাকুর্দা দিনাজপুর হাই-স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দক্ষিণারঞ্জন দাশগুপ্ত সহধর্মিণী তথা অলোকরঞ্জনের ঠাকুমা নির্মলাসুন্দরীকে নিয়ে দেওঘরের কাছে এই রিখিয়ার গ্রামে নতুন করে ভিটেপত্তন করে বসবাস শুরু করেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রধান এই ঠাকুর্দার কবোষ্ণ আশ্রয়েই তাঁর বড়ো নাতি অলোকরঞ্জনের কৈশোরের অনেকগুলো দিন কাটে। তাঁর জীবনদর্শন এবং কবিপ্রতিভার উন্মেষে রাখিয়ার উদ্‌যাপিত এই নিসর্গ-লোকজীবন-লগ্ন দিনগুলির গ্রহণযোগ্য ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না।

এই চিত্রকল্প রিখিয়ানিখিলের প্রশান্ত নিসর্গকে ফুটিয়ে তুলে পাঠকমনে অনির্বচনীয় প্রসন্নতার উদ্ভাস ঘটায়। আবার, নতুন কবি অভিনব চিত্রকল্প দিয়ে ফালা-ফালা করে দেন পোকায়-কাটা পুরনো রচনারীতি। 'যৌবনবাউল'-এর 'মায়ের জন্মদিনে' কবিতায় যেমন শান্ত রসের মাঝখানে ভয়ানক রসের প্রায়-জীবনানন্দীয় দীপ্র উৎসারণ :

অথচ তখনো দেখি মানুষের স্তব্ধ শাদা হাড়
প্রতিবেশী পরিখার আরো এক স্তম্ভিত পাহাড়

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

গড়ে তোলে, ভরে তোলে শ্বাপদের হোমের সমিধ—
চিতার তৃষ্ণায় জ্বলে শতাব্দীর প্রেমিক শহীদ!

অথবা 'আকাশের যকৃতের এক ভরাট আপেল' ('বটের বদলে বকুল গাছের জবানবন্দি')! একে চিত্রকল্প বলব, না অলোকরঞ্জন-উদ্ভাবিত 'চিত্রজল্প'?

আবার 'যেখানে অর্কিডগুচ্ছ মেঘের বালার্কমিনারেট ছুঁয়ে আছে' নতুন, সংহত চিত্রকল্পের সৌজন্যেই বহু ব্যবহারে জীর্ণ ভাষার মলিনতা দূর করে।

'যৌবনবাউল'-এর মৌল চিত্রকল্পটি অবশ্য ধ্যানী, শান্ত, ন্যাগ্রোধপরিমণ্ডলা এক বটগাছ। 'যৌবনবাউল'-এর পথে পথে পাখি, ফুল আর গাছেদের মেলা। তবু পাখিদের মধ্যে যেমন চন্দনা, তেমনি বৃক্ষদের মধ্যে বট এক বিশেষ স্থান নিয়ে আছে। পূর্বোল্লিখিত 'মায়ের জন্মদিনে' কবিতাতেই আমরা দেখব, 'তুমি সে ঝর্ণারই বৃক্ষ, আমি যার শীর্ণ জলঝুরি'। চিত্রকল্পটি বিশদ, জটিল এবং ওতপ্রোত। 'ঝুরি'-র উল্লেখে সেই বটবৃক্ষই উঠে আসে মাতৃনির্ভর কবির মায়ের প্রতিমা হিসেবে। আবার সজল একটি ঝরনা বুঝি সেই বটতরুর সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যায়, ঝুরি হয় 'জলঝুরি', আর 'শীর্ণ' বিশেষণটি একদিকে যেমন কবির বিনয়কে প্রকাশ করে, তেমনি তরুণ অলোকরঞ্জনের তদানীন্তন শারীরিক শীর্ণতার চিত্রকল্পে আক্ষরিক মিলে যায়।

'সাড়া' কবিতায় কবির ভালোবাসার আততি 'নিরঞ্জন মেঘের থেকে নিরভিমান আলোর ঝুরি' হয়েই দয়িতার শ্রুতিমূলে নেমে আসে যখন, তখন একদিকে যেমন সেই মৌল চিত্রকল্পটি ফিরে আসে, অন্যদিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্পটি শ্রুতিনন্দন বাক্প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়। দুই অনুভূতির সংশ্লেষণ ঘটে যায়।

এই বইয়েরই 'পিতৃপুরুষ' কবিতায় শান্তিনিকেতনে তাঁর স্কুলজীবনের দুই বনস্পতির কথা। প্রথমজন বিধুশেখর শাস্ত্রী, দ্বিতীয়জন ক্ষিতিমোহন সেন, যিনি তাঁর সহপাঠী অমত্য সেনের দাদুও। কবীর রোড দিয়ে যেতে যেতে কেমন দেখেন কবি বয়সবিবর্ণ, রুগণ ক্ষিতিমোহনকে? একটি চিত্রকল্পের সাহায্যেই তা ফুটে ওঠে অমোঘভাবে, 'তবু সেই মুখ/ পুরনো বটের সদ্য পাতার মতন ফুটে ওঠে'।

আত্মপ্রতিবাদের ঐক্য অলোকরঞ্জনের কবিতার মৌল চরিত্র। 'যৌবনবাউল'-এর প্রশান্তির আড়ালে জন্ম নিচ্ছিল যে সপ্রশ্ন সংক্ষোভ, সেটিও বটের ছায়ার আশ্রয়েই :

'পুরনো বটের ছায়া ভালো, কিন্তু কতদূর ভালো? ('আত্মা')

একশো আটটি কবিতা নিয়ে গ্রথিত 'যৌবনবাউল'-এর পথে পথেই চিত্রকল্পের ভূরিভোজ। কিন্তু কোথাও তোথামতে হবে। তাই 'তুলসীতলা' নামের এই আশ্চর্য কবিতা দিয়েই এই প্রসঙ্গে আলোচনায় ইতি টানি। পাঠক মহোদয় লক্ষ করবেন সম্পূর্ণই উদ্ধারযোগ্য এই ছোট্ট কবিতাটির পুরোটাই এক চিত্রকল্পে উত্তীর্ণ :

কী করে যে অতটুকু ঘরের মধ্যে আছ!
বাইরে কত সমারোহ শালিতমালের, কত
সমারোহ নানারকম ফুলের; কত পাখির
হাট বসেছে বাইরে, কিন্তু সামান্য ফুলগাছ
ফুল বলে যা চেনাই যায় না অথবা গাছ বলে;
তার ভেতরে অসামান্য শক্তিশালী রাখাল
তোমার বাঁশি, তোমার বুকের আড়াল-রাধা, তোমার
যশোদা আর সুদাম নিয়ে কেমন করে আছ?

(তিন)

চিত্রকল্প প্রথাবদ্ধ সুচয়িত সীবনকর্ম নয়; বরং লজিকবিহীন, কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে উদ্দীপক স্বপ্নে-পাওয়া বাদল হাওয়া। কবির ভাষা, ইমেজারি আসলে স্বপ্ন, মিথ, আদিম মানবের দৃষ্টিস্মৃতিময়।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার নবনির্মিতির এক বৈশিষ্ট্য হল নতুন নতুন ধরনের চিত্রকল্প নির্মাণ[৬]। সংহত চিত্রকল্প একদিকে যেমন ছবির সাহায্যে কবিতার অভিব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করে; অন্য দিকে চিত্রকল্পের নিজস্ব রহস্যময়তার গুণেই অনেক সময় থাকে ছবি ভাঙার প্রক্রিয়াও। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ-দুয়ের মিশ্রণেই চিত্রকল্পের সৌন্দর্য। জীবনানন্দের সুবিখ্যাত ‘উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা’র[৭] কথা যদি ধরি, উটের গ্রীবাটির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়াই পাঠকের মানসচক্ষে সেই নিস্তব্ধতার অবলোকন ঘটে যায়। অনুভূতি ও চিন্তার এক দ্বৈত স্তরের দাবি সেখানে পাঠকের কাছে।

সুমিতা চক্রবর্তী [৮] যেমন বলেন, জীবনানন্দের কাব্যবাণী পাঠকের মনন ও মেধাকে স্পর্শ করে, কিন্তু সেখানেই থামে না। পাঠকের হৃদয়াবেগ-সংবেদী হয় কিন্তু সেখানেও থামে না। সে কবিতা মানুষের অস্পষ্ট বোধ-জগতের অভিমুখী হতে চায়। যুক্তি-অনুসারী ভাষায় সবসময়ে সে কাজ সম্পন্ন হয় না। অপ্রত্যাশিত চিত্রকল্পের ভাষায়, অভাবিতপূর্ব রূপ-রচনার সাহায্যে—যা একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও রহস্যময়—নিজের কথাগুলি তিনি বলেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় প্রত্যক্ষ, পরিচিত ইমেজারি যেমন আছে, তেমনি আছে অপ্রত্যক্ষ, রহস্যগ্রন্থিল বাক্‌প্রতিমা। ‘নিষিদ্ধ-কোজাগরী’ (১৯৬৭)-র ‘রাত্রির রাজপথ’ কবিতাটিতে যেমন একটি প্রত্যক্ষ, সুপরিচিত ছবির মাধ্যমেই বাংলায় এক বিশেষ দশকের সমাজবদল আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ফুটে উঠেছে।[৯] কবিতার শুরুতে পাচ্ছি, ‘ট্রামলাইনের রাস্তা সারায় রাঙা লণ্ঠন জ্বেলে/দুটি ঈশ্বর ছেলে/ একটি অধিক ঈশ্বর, তাই-হঠাৎ তার হাতুড়ি/ রাতের যক্ষপুরী/ প্রসঙ্গক্রমে ভাঙতে চেয়েছে’....কলকাতার পরিচিত দৃশ্য ট্রামলাইনের

রাস্তা সারাই। ‘রাঙা লণ্ঠন’, ‘হাতুড়ি’ সম্পূর্ণত রাজনৈতিক এ কবিতাটি বামপন্থী মতাদর্শের অমোঘ প্রতীক। ‘অপেক্ষাকৃত অর্ধেক দীক্ষিত’ ছেলেটি এই ‘অধিক ঈশ্বর’ ছেলেটিকে কৌশলে বাধা দেয়। অথচ ‘যদি শেষে ট্রাম চলে/ দ্বিতীয়োক্তটি প্রথমে উঠবে’। যদি সমাজবদল সত্যি সম্ভব হয় ‘অর্ধেক দীক্ষিত দ্বিতীয়োক্তটিই লাল পতাকা উড়িয়ে পুরোভাগে যাবে, পূর্ণ বিপ্লবে যে বাধা দিয়েছিল একদিন। তারপর শেষ চরণে দেখি, ‘বাকি ঐ ঈশ্বর’, চিরকালের আদর্শবাদী সত্যসন্ধ সেই ‘অধিক ঈশ্বর’ প্রথম তরুণটি। ক্রান্তদর্শী কবিবীক্ষা আমাদের কাঁপিয়ে দেয়।

বিপরীতে, ‘বৈদেহী’ নামের এই বইয়েরই সেই তীব্র শরীরী প্রেমের কবিতাটিতে দেখব প্রত্যক্ষ চিত্রকল্পের এক ভিন্ন ধরণ :

‘তুমি আমায় এখনো কি নম্র কিশোর ভাব?
এই বলে যেই অস্নাত মুখ বিকীর্ণ আঙ্গুলে
স্নান করালাম, যে কি তৃপ্তি, অন্ধকারে হল
সুবিনীত গৃহদাহ সিতকঞ্জনাভ।
প্রসঙ্গত, ‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’ বইতেই অলোকরঞ্জন সবচেয়ে শরীরী।

দয়িতার মুখ বিকীর্ণ বা তৃষ্ণার্ত আঙুলে স্নান করানোর বাকপ্রতিমাটি অলোকরঞ্জনের এক প্রিয় চিত্রকল্প, যা ফিরে এসেছে ‘দুধে আলতায় কুয়াশায় আঁকা ছবি’ (২০০৮) বইয়ের ‘স্নান’ কবিতাতেও :

একভিড় কামরায় সর্বসমক্ষেই
আমার অবকীর্ণ আঙুলের ঝর্ণায়
তোমার মুখ যখন আমি গাহন করিয়ে দিচ্ছিলাম
আর আমার তৃষ্ণার্ত আঙুলগুলোকেও
স্নান করিয়ে দিচ্ছিল তোমার মুখ....

গ্রিক দার্শনিক হিরাক্লিটাসের ভ্রূভর্ৎসনা মেনে একনদীতে দুবার স্নান করতে না-চাওয়া অলোকরঞ্জনের কবিতায় এক প্রিয় বাকপ্রতিমার বিরল পৌনঃপুনিক প্রয়োগ এখানে প্রণিধানযোগ্য মনে হয়। প্রায় চল্লিশ বছরের ব্যবধানে ব্যবহৃত এই দ্বিতীয় প্রয়োগে অবশ্য আঙুলগুলি ঝরনার প্রতিমা পেয়েছে, প্রথম প্রয়োগে যে-ঝরনা প্রত্যক্ষগোচর ছিল না।

‘নিষিদ্ধ কোজাগরী’-র ‘আসন্ন’ কবিতায় পেয়ে যাই এক শ্রুতিনন্দন ইমেজারি, যা ততটা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষগোচর :

... শ্রবণের গর্ভে তিলে তিলে
অবৈধ শিশুর মতো সে-সুরের স্বরলিপি বাড়ে,....

‘রক্তাক্ত ঝরোখা’ (১৯৬৯) বইয়ের ‘নির্বাসন’ কবিতাটি একাধিক চিত্রকল্পের সৌজন্যেই

আশ্চর্য রকমের দূরগামী ব্যঞ্জনাসঞ্চারী। প্রথম স্তবকেই পাচ্ছি :

আমি যত গ্রাম দেখি
মনে হয়
মায়ের শৈশব।
ব্যতিক্রমী দৃষ্টিনন্দন চিত্রকল্প, কিন্তু ধরাছোঁয়ার ভেতরেই।

কবিতাটি যত এগোতে থাকে, ফুটে ওঠে রহস্যগ্রন্থিল পরোক্ষতা, যা পাঠকের অনুভূতি, চিন্তা এবং যৌথ স্মৃতির দাবিদার। শেষ স্তবকে :

ঝর্নার পরেই নদী, নদীর শিয়রে
বাঁশের সাঁকোর অভিমান
যেই দেখি, মনে হয়
নোয়াখালি, শীর্ণ সেতু, আর সে নাছোড় ভগবান।

অলোকরঞ্জনের যে-কোনো নির্বাচিত কবিতা সংকলনে স্থান পাবার যোগ্য কবিতাটি সংহত বাক্‌প্রতিমা নিয়ে এখানে পরমোৎকর্ষের শিখর স্পর্শ করে। এক ঝটকায় আমাদের মনে আসে নোয়াখালির দাঙ্গা, কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত, নিরস্ত্র গান্ধীর সংগ্রাম ও সিদ্ধি। মানুষ গান্ধী যেমন এখানে নাছোড় ভগবানের প্রতিমায় উর্ধ্বায়িত, কবিতা যে কতদূর তুঙ্গস্পর্শী হতে পারে, তারও প্রমাণ এই কবিতাটি।

'চিত্রধর্মী নিরাসক্তি অলোকরঞ্জনের অনেক কবিতারই প্রাণরস।' বলেছেন কবিবন্ধু আলোক সরকার।[১০]

এরই দৌলতে 'পাখিটির মাতৃভাষা' হয়ে ওঠে 'চেয়ে থাকা'। 'তমাল ডালে পল্লবিত' হতে থাকে 'মেরুন রঙের রোদ্দুর' (রক্তাক্ত ঝরোখা : ১৭)। এবার আমরা দেখে নেব 'রক্তাক্ত ঝরোখা' বই থেকেই চিত্রস্বভাবী এক নিথর উপস্থাপনা:

ধানখেতে এসেছিল বেড়াতে দু-জন,
ধানখেতে শিশু রেখে পালাচ্ছে দু-জন;

'এবার স্টেশনে চলো' বলল একজন,
'এবার স্টেশনে চলো' বলল একজন।

'সাঁকো বেয়ে নীচে এসো' এ ওকে বলল,
'সাঁকো বেয়ে নীচে এসো' এ ওকে বলল।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

আর নেমে এসে দ্যাখে সুন্দর কাঁথায়
রক্তমাখা শিশু নিয়ে ধানী নৌকো যায়। 'রক্তাক্ত ঝরোখা : ৯'

আমরা নির্বাক হয়ে দেখতে থাকি, পরিত্যক্ত শিশুটির যাত্রাও কেমন রূপময়, সৌন্দর্যে রঙিন, সুন্দর কাঁথা তো তারই আবরণ। আর ওই ধানী নৌকো? জীবনের সম্ভাবনা এবং জীবনবিরোধী হাহাকারকে সম্মিলিত করেছে। চব্বিশটি অংশ নিয়ে রচিত 'রক্তাক্ত ঝরোখা'-র শেষতম তথা ২৪ সংখ্যক কবিতায় যেমন 'বাটিকে আঁকা আকাশে দিনশেষে/তুমি আমার প্রিয়' এই উচ্চারণের সঙ্গে এসে মেশে 'বাটিকে আঁকা তোমার মুখে মেশে/ বিষম রাত্রিও।'

(চার)

Marjorie Boulton জানিয়েছেন, 'The images effect us long before we have grasped the intellectual meaning'[১১] কবিতার বৌদ্ধিক অর্থ গ্রহণের আগেই তার চিত্রকল্প আমাদের মনকে অধিগ্রহণ করে নেয়। 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ' (১৯৭৩) বইয়ের বিভাব কবিতায় যেমন, 'তুমি এসো বার্লিনের দুই দিক থেকে/অবিভক্ত শাদা-কালো খঞ্জন আমার/ছৌ-কাবুকির ছদ্মবেশে/চূর্ণ করে দাও যত অলীক সীমান্ত'। ১৯৭৩-এ বসে দুই জার্মানির ভেতরে প্রাচীর-বিভক্ত বার্লিনের সীমারেখাকে অলীক বলে চূর্ণ করে দেবার আহ্বান ক্রান্তদর্শী, অসমসাহসিক। দেশজ ছৌ-এর সঙ্গে জাপানি মুখোশনৃত্য কাবুকির সম্মিলনে চিত্রকল্পটি সম্পূর্ণ। এ বইয়েরই 'সূচ্যগ্র মেদিনী' কবিতায় পাচ্ছি এক অসামান্য চিত্রকল্প। কবিতাটি শেষ হচ্ছে এইভাবে, '...আমার অত্যন্ত ছোটোবেলায়/চিদ্‌ঘন একটি শুভ্র বাসমতী চালের চিবুকপ্রমাণ শরীরে/আমাদের এক ঘনিষ্ঠ অনাত্মীয় কারিগরের হাতে ক্ষোদিত/আমি।'

লক্ষণীয়, 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ' (১৯৭৩) বই থেকেই চিত্রকল্পে এসেছে আন্তর্জাতিক ছোঁয়া। ১৯৫৭ সাল থেকে যাদবপুরে অধ্যাপনারত কবি যোগ দিয়েছেন ইতিমধ্যে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৭১)। তাঁর সময় এখন থেকেই কলকাতা ও জার্মানির ভেতরে দ্বিধাবিভক্ত। 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ' উৎসর্গীকৃত হয়েছে ট্রুডবার্টা হেসলিঙারকে, যিনি অচিরেই ১০ মার্চ, ১৯৭৩ হয়ে উঠবেন শ্রীমতী ট্রুডবার্টা দাশগুপ্ত (১৯৩৮-২০০৫)।

বিভাব কবিতাতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তদানীন্তন দ্বিধাবিভক্ত জার্মানির প্রাচীর দিয়ে ভাগ করা বার্লিন শহরের রূপকল্প আমরা একটু আগেই দেখে নিয়েছি। হাইডেলবার্গের সূর্যাস্ত, স্ট্রাসবুর্গের অপরূপ ক্যাথিড্রালের তিনশো ছত্রিশটা সিঁড়ি ('যযাতি এবং তিনশো ছত্রিশ সিঁড়ি), বাভারিয়ার জঙ্গল ('কালো বেরি'), ফ্র্যাংকফুর্ট বা ফ্লোরেন্সের ছবি,

'হ্যোল্ডারলিনের পাশপোর্ট' বা শিলারের মূর্তির 'কাঁধের উপর হেলে পড়া বার্চের শিকড়বাকড় সরাতে' থাকা আমাদের কবির চিত্রকল্প 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ'-এ স্বভাবসম্মিত সৌজন্যেই শোভমান। পাশাপাশি এসেছে দেশজ ছবি, স্বর্ণসীতা, কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম, দেশজ খালুই, খুল্লনা, তুষতুষুলি, লাগড়া, সুন্দরবন। আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া সত্ত্বেও দেশজ পুরাণ ও লোকসমাজকে আরো বেশি আবজে ধরার গরজেই।

আমরা অবগত অছি, সাহিত্যতত্ত্বে চিত্রকল্পকে (imagery) সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(১) দৃষ্টিগ্রাহ্য বাকপ্রতিমা (Visual imagery)

(২) শ্রুতিনন্দন বাকপ্রতিমা (Auditory imagery)

(৩) ঘ্রাণনির্ভর বাকপ্রতিমা (olfactory imagery)

(৪) স্বাদগ্রাহ্য বাকপ্রতিমা (Gustatory imagery)

(৫) স্পর্শযোগ্য বাকপ্রতিমা (Tactile imagery)

(৬) জৈবিক চিত্রকল্প (Organic imagery),

যাতে কবির শারীরিক অভিজ্ঞতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রেম হতাশা ফুটে বেরোয়।

(৭) চলিষ্ণু বাক্‌প্রতিমা (Kinaesthetic imagery), যাতে প্রাকৃতিক অথবা শারীরিক (হৃৎস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস ইত্যাদি) আন্দোলন বা সচলতার দ্যোতনা।

এতাবৎ আমরা অলোকরঞ্জনের কাব্যপ্রবাহে মূলত প্রথম ধরনের, মানে দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্পকেই অনুধাবন করবার প্রয়াস পেয়েছি। শুধু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত 'আমার ঠাকুমা' কবিতার শেষাংশে 'জড়োসড়ো পাতা কাঁপে, কাঁপে বনভূমি' অংশে চলিষ্ণু বাক্‌প্রতিমার সন্ধান করেছি। একই অংশে উদ্ধৃত 'সাড়া' কবিতায় 'নিরঞ্জন মেঘের থেকে আলোর ঝুরি' দয়িতার শ্রুতিমূলে নেমে আসার চিত্রকল্পে দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্পটি Synaesthesia বা সংশ্লেষের মাধ্যমে শ্রুতিনন্দন বাক্‌প্রতিমার বিবর্তিত হতে দেখেছি। আর তৃতীয় অংশে বিকীর্ণ (বা অবকীর্ণ) আঙুলের ঝরনায় দয়িতার মুখ স্নান করানোয় চিত্রকল্পে ('বৈদেহী', নিষিদ্ধ কোজাগরী; 'স্নান', দুধে আলতায় কুয়াশায় আঁকা ছবি) দৃষ্টিগ্রাহ্য বাক্‌প্রতিমার সঙ্গে স্পর্শময় (Tactile) বাক্‌প্রতিমাও মিশে গেছে; অন্য দিকে একই অংশে উদ্ধৃত 'শ্রবণের গর্ভে তিলে তিলে/ অবৈধ শিশুর মতো সে সুরের স্বরলিপি বাড়ে'...('আসন্ন', নিষিদ্ধ কোজাগরী) চরণযুগলে প্রত্যক্ষ করেছি অভূতপূর্ব এক শ্রুতিনন্দন চিত্রকল্প।

মনে রাখতে হবে, অলোকরঞ্জন সংগীত এবং চিত্রকলা সম্পর্কে গবেষকের মতো উৎসাহী। তাঁর মা নীহারিকা দাশগুপ্ত ছিলেন সংগীতগুণী, সংগীতশিক্ষিকা এবং কাজি নজরুল

ইসলাম ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সাক্ষাৎ শিষ্যা। দ্বিতীয়োক্ত জনের কাছে অলোকরঞ্জনও তাঁর চেতনাপ্রত্যুষে শান্তিনিকেতনের স্কুলবেলায় গান শিখেছেন, 'যৌবনবাউল' উৎসর্গীকৃত হয়েছে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে। কবি নিজেও সুধাকণ্ঠ, গাইতেন রবীন্দ্রসংগীত তো বটেই (বস্তুত আড়াই হাজার রবীন্দ্রসংগীতই তাঁর জানা!), নজরুলগীতি সহ নানা ধরনের গান, যার মধ্যে বাউল-সহ লোকগানও আছে। অলোরঞ্জনের কবিতার চিত্রকল্পে, বিশেষত দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শ্রুতিগ্রাহ্য বাক্‌প্রতিমার আলোচনায় এ তথ্যটি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আশা করি।

এখন আমরা তাঁর কাব্যপ্রবাহে নানা বিচিত্র রকমের বাক্‌প্রতিমার অনুসন্ধান করি—

(১) দৃষ্টিগ্রাহ্য বাক্‌প্রতিমা (Visual imagery)

(ক) দোতলা বাসের একদেশদর্শী উন্মত্ত কুঞ্জর/
গীতাভাষ্যকার লোকমান্য-তিলকের-ধরনে-আকাশ-থেকে
—মাঙ্গলিক - শুভেচ্ছায় -ঝুলতে-থাকা/
একরাশ ডালপালার গূঢ় জল্পনায়/
একমুহূর্ত থমকে গিয়েই আবার গরগর-করতে-করতে এগিয়ে গেল
('বিষাক্ত শিশির', গিলোটিনে আলপন, ১৯৭৭)

(খ) ....তার মুখের লোধ্র
স্বহস্তে এঁকে নিয়েছে রৌদ্র
('শিল্পী ও সঙ্গিনী', তদেব)

(গ) আমার নিশান তুলতে গিয়ে তোমার স্তনযুগ
মুক্ত হল, প্রতিপদের প্রথম চাঁদের কাছে
('ব্যক্তিগত নিশান আমার', লঘু সংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে, ১৯৭৮

(ঘ) খেপলা জালে সুজ্জি ধরে আনে ('জেলেনী', তদেব)

(ঙ) বনে যেতে-যেতে অর্জুন গাছটায়
লূতাতন্তুতে সূর্যাস্তের আঁকা টেম্পেরাখানি
(বিভাব কবিতা, অস্তসূর্য এঁকে দিল টেম্পেরা, ১৯৯৭)

(চ) ফিরে এসে দেখি লুপ্ত আমার ভিটা
এবং আমার ছোট্ট লাইব্রেরিটা
যেইখানে ছিল দ্বিজ মাধবের পুঁথি
যেসব পড়োশি দিয়েছে প্রতিশ্রুতি
ধরে রাখবার সকলেই শুনশান

শুধু আছে এক কামিনী ফুলের ঝাড়

('ভিসা ও ভবিষ্যৎ', ঝাউশিরীষের শীর্ষ সম্মেলনে, ২০১৯)

(২) শ্রুতিনন্দন বাকপ্রতিমা (Auditory imagery)

(ক) সে-কান্না তবু গান হয়ে ওঠে, ('গোধূলির শান্তিনিকেতন', যৌবনবাউল, ১৯৫৯)

(খ) গিলোটিনের ভিতরে তার সেতারস্নায়ু উঠল বেজে

('গিলোটিনে আলপনা', গিলোটিনে আলপনা, ১৯৭৭)

(গ) থেকে থেকেই সুরদাসের ভজন থেকে দু-তিনটি চরণ
ছুপিয়ে নিচ্ছেন তাঁর নিজস্ব বৈরাগ্যে

('অভাজন : উৎসতলায়', লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে, ১৯৭৮)

(ঘ) কেন যে তবু কিশোর এক চারণ কবির দল
থেকে থেকেই গেয়ে উঠছে আনন্দ-বিহ্বল :

('ধ্বংস ও প্রজাপতি', বাস্তুহারার পাহাড়তলি, ২০২০)

(৩) ঘ্রাণনির্ভর বাক্‌প্রতিমা (olfactory imagery)

(ক) আস্ফালিত চন্দনের ধূপ

('পুড়ুক আমার কুশপুতুল', গিলোটিনে আলপনা, ১৯৭৭)

(খ) শেফালি ফুল মেখেছে আজ উগ্র পারফ্যুম

('লগ্ন বদল', ওষ্ঠে ভাসে প্রহত চুম্বন, ২০০৬)

(৪) স্বাদগ্রাহ্য বাক্‌প্রতিমা (Gustatory imagery)

(ক) গাছটার গায়ে একটি ডাল
হুবহু হাতল যেন—
এইবারে গাছটিকে তুলে ধরো কাচের গ্লাসের মতো
মেলে ধরো রুগ্‌ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে
এবং তাঁদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেবার কল্পে
বৃক্ষের নির্যাস তুমি পান করো

('বৃক্ষ এক উপলক্ষ্য', গিলোটিনে আলপনা, ১৯৭৭)

(খ) ধূমাবতীর যৌথ স্তন্যপান

(বইয়ের মেলায় : সাতাত্তরে, তদেব)

(গ) আলোর আতার ক্ষীর

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

('মায়াবী জল্লাদ' লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে, ১৯৭৮)

(ঘ) যেন দেবদারুর দূতীরা ঢেলে দেয়
আমার মুখে অমৃত আঃ

(বিভাব কবিতা, জবাবদিহির টিলা, ১৯৮১)

(৫) স্পর্শযোগ্য বাক্‌প্রতিমা (Tactile imagery)

(ক) ভস্মভুরু তুলে অশ্ব ঘষটায় আমাকে

('অগ্নিমন্থ', গিলোটিনে আলপনা, ১৯৭৭)

(খ) 'পুরুষ মোমের মতো জ্বলে'

('মোম', গিলোটিনে আলপনা)

(গ) 'একটা উদ্বাস্তু ঘুঘু অকৃত্রিম মমতায় আমার গায়ে
পালকমর্দন করে চলে গেল'

('প্রতিহত নমস্কারগুলি', মরমী করাত, ১৯৯০)

(ঘ) 'শিশির দলে যেওনা ঘাসে ঘাসে...'

('ঈশ্বরের ধিকর', শুনে এলাম সত্যপীরের হাটে, ২০০১)

(ঙ) ইন্দ্রধনুর সাঁকোয় কাঁটা বিছিয়ে বলো
আমারই দায় তার উপরে সাঁতার কাটা

('রাজ্ঞী আমার', দুধে আলতায় কুয়াশায় আঁকা ছবি, ২০০৬)

(চ) পার্কস্ট্রিট পার হওয়ার মুখে
কোত্থেকে এক তুন্দ্রাহরিণ
আমার বুকেই খুবলে দিল
তীক্ষ্ণ শিংয়ের মেগাবাইট

('শরনার্থী', তোমরা কী চাও, শিউলি না টিউলিপ, ২০১৭)

(ছ) আমার ডান কনুই ঘেঁসে মৃত্যুপরোয়ানা
খারিজ করে কাঁপতে থাকে প্রজাপতির ডানা

('ধ্বংস ও প্রজাপতি', বাস্তুহারার পাহাড়তলি, ২০২০)

(৬) জৈবিক চিত্রকল্প (Organic imagery) এতে নিতান্ত শারীরিক অভিজ্ঞতা এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষোভ, বেদনা, প্রেম ইত্যাদি ফুটে বেরোয়।

(ক) একবুক অমঙ্গল হয়েছিল, কাকদ্বীপ থেকে খুব কাছে

('রক্তাক্ত ঝরোখা ঃ ২৩', রক্তাক্ত ঝরোখা, ১৯৬৯)

(খ) নিজেকে না ফেড়ে বলো বাজিয়েছে সংগীত কবে কে?

('মরমী করাত', মরমী করাত, ১৯৯০)

(গ) পথের মধ্যে খর্জুরবীথি থেকে
খেয়ে দেয়ে আর ঈষৎ জিরিয়ে নিয়ে

('আনসারি আবদাল্লা', শুনে এলাম সত্যপীরের হাটে ২০০১)

(ঘ) মুর্শিদ আমার খোলে বাজালেন আজব গুবগুবি

('গুবগুবি', শুনে এলাম সত্যপীরের হাটে, ২০০১)

(বস্তুত 'খোল' এখানে কবির শরীরের প্রতীক।)

(ঙ) ওষ্ঠে ভাসে প্রহত চুম্বন

(গ্রন্থনাম, ২০০৬)

(চ) সে-সময় তার কোনো স্নায়ুর অস্বস্তি হয় কিনা
আমি বুঝতে পারি না

('মৃত্যুসংবাদদাতা', ঝাউ শিরীষের শীর্ষসম্মেলনে ২০১৯)

(ছ) কবিতা লেখার গরজে নিজেকে করি ক্ষতবিক্ষত

('কবিতা লেখার গরজে, দোলায় আছে ছ'পন কড়ি, ২০১৬)

(৭) চলিষ্ণুতার বাক্‌প্রতিমা (Kinaesthetic imagery)—এই ধরনের চিত্রকল্পে কোনো বস্তু বা চরিত্রের নড়াচড়া, চলাফেরা বা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া প্রকাশমান। হৃৎস্পন্দন বা শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো শরীরবৃত্তীয় গতিবিধিও এর অঙ্গ।

(ক) সারারাত বাড়িটা চলবে

('গৃহসঞ্চার', গিলোটিনে আলপনা, ১৯৭৭)

(খ) কম্বুগ্রীবায় নদীটি যায় উপর দিকে বয়ে

('এক একটা দিন', দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে, ১৯৮৩)

(গ) দুরুদুরু দৃপ্ত ঘুরে আসি

(বিভাব কবিতা, ধুলোমাখা ঈথারে জামা, ১৯৯৯)

(ঘ) যুদ্ধ এসে গুঁড়িয়ে দিল পীরের হাটবাজার

('আমার সূফী হওয়া হয় না', শুনে এলাম সত্যপীরের হাটে, ২০১১)

(ঙ) ভাষা যে রকম ঝাপটানি তুলে দূর

দিগন্তটাকে দিয়ে যায় হাতছানি
ভবিষ্যতের কবিতাও সেই মতো
গৃহকোণ থেকে মুক্তির সন্ধানী

('সমাধিলেখ', বাস্তুহারার পাহাড়তলি, ২০২০)

এ পর্যন্ত আমরা অলোকরঞ্জনের বিভিন্ন পর্যায়ের কবিতায় সাতটি বিভিন্ন রকমের চিত্রকল্পের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি। অবশ্য দুই (বা তার বেশি) ধরনের চিত্রকল্পের সংশ্লেষে একটি শ্লিষ্ট চিত্রকল্পের (Tied imagery) নজিরও তাঁর কবিতায় বড়ো কম নয়। দৃষ্টি ও শ্রুতিধর্মী দু-ধরনের চিত্রকল্প মিলেমিশে একটি শ্লিষ্ট চিত্রকল্প গড়ে ওঠার মাত্র দু-খানি উদাহরণ আমরা কবির 'লঘু সংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে' (১৯৭৮) বই থেকে দেখে নিই?

১। বাজল দোতারাতে
পরিচ্ছন্ন রৌদ্র যেন ক্রিকেট খেলার মাঠে

২। তিলক কামোদ জামদানি শাড়িতে
জলজিয়ন্ত রুণা লায়লার গান

প্রথমটিতে যদি শ্রুতি মিশছে দৃষ্টিতে, দ্বিতীয়টিতে দৃষ্টি মিলে যাচ্ছে শ্রুতিতে।' 'যৌবন বাউল' থেকে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ আশ্চর্য শ্লিষ্ট চিত্রকল্প দেখে নিয়ে চিত্রকল্পের বিচিত্র ধরণ নিয়ে আলোচনায় ক্ষান্ত হই?

ব্যথার কলি গানের ফুলে ফুঠে উঠুক ('নির্জন দিনপঞ্জী')

'যৌবনবাউল'-এর বিখ্যাত 'নির্জন দিনপঞ্জী' কবিতার এই শেষ চরণে আমরা দেখব শ্লিষ্ট চিত্রকল্পের এক এ্যহস্পর্শ। 'ব্যথার' জৈব চিত্রকল্প 'কলি'র দৃষ্টিগ্রাহ্য ছবিতে মিশছে, যা আবার দৃষ্টিগ্রাহ্য ছবিতে মিশছে, যা আবার দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবেই ফুটে উঠেছে 'গানের ফুলে'র শ্রুতিনন্দন দ্যোতনায়, দৃষ্টিগ্রাহ্যতাতেও। এইভাবে জৈব, দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং শ্রুতিনন্দন চিত্রকল্পের বিরল ত্রিবেণীসঙ্গম পাঠককে অভিস্নাত করে।

অলোকরঞ্জনের দীর্ঘ কাব্যপ্রবাহে অবগাহন করলে যে কোনো সংবেদী পাঠকই গুচ্ছ গুচ্ছ বিভিন্ন ধরনের চিত্রকল্প খুঁজে নিজে পারবেন। ক্রমশ যৌবনবাউলের গ্রামীণ ভাষার সরল লাবণ্য যেমন মিশেছে নাগরিক ভাষার কৌণিক দীপ্তিতে, তেমনি আমরা দেখতে পাব, তাঁর কবিতার চিত্রকল্পমালাও ক্রমশ বিশদ ও জটিল হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত উদাহরণমালার কালানুক্রমে আমরা তার কিছু আভাস দেখেছি। পরবর্তী কাব্যপ্রবাহ থেকেও বিচ্ছিন্ন কিছু নজির দেখে নিই?

(পাঁচ)

কবি চিত্রকল্পকে চয়ন করেন না। চিত্রকল্পও কবিকে পছন্দ করে নেয়। স্বয়ংবরার বরমাল্যদানের মতো। মনস্তাত্ত্বিক এর উৎস খুঁজবেন মনের উপচেতন উপত্যকায়, রোম্যান্টিক : অতীন্দ্রিয় প্রেরণায়। দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজতে টেনে আনা যায় জ্ঞানবৃদ্ধ জর্জ বার্নার্ড শ-কে, যিনি তাঁর সুখ্যাত 'Saint Joan' নাটকে এ বিতর্কের এক ইতিবাচক সুরাহা পেশ করেছেন।[১১] জোয়ান অব আর্কের বিচার-প্রহসনে যখন চার্চের ইনকুইজিটর বা বিচারকেরা তরুণী জোয়ানকে বলে যে, তিনি যে-সব প্রত্যাদেশ শোনেন সেগুলো আসে তাঁর কল্পনা (imagination) থেকেই। সঙ্গে সঙ্গে জোয়ান বলেন : অবশ্যই; এভাবেই তো ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ আমাদের কাছে আসে ('Of Couse; that is how the messages of God come to us')।

'গিলোটিনে আলপনা' (১৯৭৭) কবির সেই পর্বাঙ্গের কবিতায় বই, যখন ইমার্জেন্সির চোখরাঙানি আর নকশাল আন্দোলনের ঝাপটানি কবিকে এই মর্মে নির্দেশ দিল, 'কবিতাকে শাশ্বতে ন্যস্ত রেখেও যুগাবর্তের শামিল হতে হবে।' এ বইয়ে স্বভাবতই চিত্রকল্পের গায়ে রক্ত লেগে আছে। একটি মাত্র কবিতার প্রসঙ্গই আমরা ছুঁয়ে যাব এখানে। কবিতাটির নাম 'তিলতর্পণ'। এ কবিতায় দেখি 'শিউলিশাদা' চুল এক বৃদ্ধ অধ্যাপককে, যিনি তাঁর 'হারিয়ে-যাওয়া' প্রিয় ছাত্র অরিন্দমের প্রতীক্ষায় থাকেন। 'তাঁর শরীর নুয়ে গিয়েছে ব্যবহারবিহীন ধনুক তির নেই ছিলা জুড়ে দ্বাপরযুগের কান্না, একা তিনি অপেক্ষায়' চিত্রকল্পটিতে পুরাণ যুক্ত হয়, উঠে আসেন মৌষল পর্বের অসহায় অর্জুন, যিনি দস্যুদের হাত থেকে যাদবরমণীদের রক্ষা করতে তাঁর অজেয় গাণ্ডীব ওঠাতে চান, পারেন না।

'লঘু সংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে' (১৯৭৮) বইয়ের কিছু চিত্রকল্প আমরা খানিক আগেই দেখে নিয়েছি। 'সূচনায় 'আনন্দ' কবিতায় দেখব চিত্রকল্প আরও কৃপণ ও মেধাবী হয়ে উঠছে, 'মহিষের কলামাত্রিক দু-শিঙের/মধ্যবৃত্তে যেটুকু চন্দ্র ধরে/তার বেশি আমি কাজে না লাগিয়ে দেখি/আনন্দ বলে কাকে।' এ যেন তাঁর (এবং রবীন্দ্রনাথেরও) প্রিয় গ্যোয়েটে- সদুক্তি, 'You must do without, do without'-এর অভিজ্ঞান। অতিপ্রাচুর্য থেকে নিজেকে সচেতনভাবে বঞ্চিত করেই হৃদয়ের দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, মননকে জাগ্রত রাখা যায়। বুধুয়ার কানায় কানায় ভরা আলোর পথ বহুদিন পেরিয়ে এসেছেন যৌবনবাউল। তাঁর চিত্রকল্পগুলিও ক্রমশ স্মিত, তীক্ষ্ণ। সেখানে 'যকৃৎ উন্মুক্ত করে পড়ে আছে' এক ডবল ডেকার, কলকাতার পথে আশি-নব্বইয়ের দশক অবদি চালু দোতলা বাস। আর 'শেফালির নীচে বারুদ লুকিয়ে আছে'-র মতো চিত্রকল্প উঠে আসে সমীপকালের ফেনিল আবর্তে শামিল হবার তাগিদেই।

'এবার চলো বিপ্রতীপে' (১৯৮৪), বইয়ের প্রথম কবিতা 'চলতে থাকার চালাচিত্তির'-এর শুরুতেই দেখব কবির যাত্রা 'ভোরের দিকে চারণা কোনাকুনি শুরু হয়'। Kinaesthetic

বা চলিষ্ণু চিত্রকল্পটি দিয়েই বিপ্রতীপ চারা শুরু হয় কবির। আক্রমণকারীদের মুখে শুভ্র সপ্রতিভতার খই ফুটতে দেখেও কবি তাঁর বিরুদ্ধে সব বক্তব্য ভুলে গিয়ে যখন তাকিয়ে থাকেন তাদের বাকরীতির নিসর্গের দিকে, তখন শ্রুতিধর্মী চিত্রকল্প দৃষ্টিধর্মী চিত্রকল্পে মিশে গিয়ে রচনা করে শ্লিষ্ট চিত্রকল্পের (Tied imagery)

> তোমাদের বাক্‌রীতির নিসর্গের দিকে
> স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।
> ('আমার চলা বিপ্রতীপে')

আবার বিজন ভট্টাচার্যের নাটক থেকে উঠে এসে অজস্র মজুর যখন তুলে আনছে তাল-তাল রোদ্দুর', তখন দৃষ্টিধর্মী রোদ্দুরের বাক্‌প্রতিমা স্পর্শযোগ্য ত্রিমাত্রিক আকার পায় ('লোকশিল্প')। একই প্রণোদনায় উঠে আসে, 'সূর্যকে বহন করে চলে গেল ট্রলি'-র ('মোকামা জংশনে', এবার চলো বিপ্রতীপে) মতো চিত্রকল্প।

'জন্মেছিনু সূক্ষ্মতারে বাঁধা মন নিয়া' তাঁর জীবনদেবতা—রবীন্দ্রনাথের এই চরণ বড়ো প্রিয় অলোকরঞ্জনের। সূক্ষ্ম তারে বাঁধা এই মন প্রথমে সংগ্রহ করে চারদিক থেকে, তারপর কবির কাজ, 'স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা/বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা।' উপচেতনের অন্ধকার থেকে চেতন-লোকের আলোতে ক্রমশ উঠে আসে চিহ্নরেখা।

"দিনের শেষে এক-একসময় উঠে আসত দু-একটা চিত্রকল্প, স্মৃতি থেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতাম। 'যৌবনবাউল'-এর মধ্যপর্যায় থেকে সূচিত কবিতাগুলির ভিতরে তাই বুঝি বিন্যাসপনার দিকে ঝোঁক ঈষদুগ্র।"[১২] অন্যত্র বলেছেন অলোকরঞ্জন।

অতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়চেতন এই জগৎ থেকে অলোকরঞ্জনের কবিতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্রকল্পমালা উঠে আসে। যেখানে দুই বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আশ্লিষ্ট হতেও আমরা দেখেছি, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে 'শ্লিষ্ট চিত্রকল্প' বা 'Tied imagery'-র। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে অলোকরঞ্জনের বিশিষ্ট চিত্রকল্পগুলি কখনো ভাবনার জগতেও আলোড়ন তোলে। কখনো তা হানা দেয় অনুভূতির রহস্যলোকে।

আকস্মিক পথদুর্ঘটনা কবির মেজো ভাই দিলীপরঞ্জনের মৃত্যু (১৯৮৫) কবিকে কাঁপিয়ে দেয়। লেখালেখি থেমে না গেলেও নতুন বই প্রকাশ করবার ব্যাপারে কুণ্ঠা আড়ষ্ট করে দিয়েছিল তাঁকে। 'ধুনুরি দিয়েছে টংকার' (১৯৮৮) বইয়ের বিভাব কবিতায় দেখব এক আশ্চর্য চিত্রকল্প ঃ

> 'দেখছ তো চৌরাস্তা ধরে ঝুলতে-থাকা দেহীর বাড়িঘরের
> মজ্জাগত ইট-সুরকি তুলোর চেয়ে মজবুত কিছু না'—

লোকায়ত বাউল দর্শনের আলোয় দেহতত্ত্ব এখানে 'গেহতত্ত্বের' শরীর পরিগ্রহ করেছে 'কায়াকোঠা'র রূপকে। সরাসরি এসেছে মেজো ভাইয়ের ছবিও,

> 'অন্তরিক্ষে মিশে যাবার আগে

আমার মেজোভাই
আমার দিকে তাকিয়ে হাসল
ভাবখানা এই : কেমন মজা?'

তবুও এখানে আসে 'বাগ্‌দত্তা'র মতো কবিতা যেখানে এক নারীর চিত্রকল্প, 'দূর থেকে মনে হচ্ছিল/ গড়িয়াহাট বুলভারে/বিক্রি না-হওয়া শেষ/সরস্বতী মূর্তিটি/থমকে আছে তার/পরনের শাড়ি/হাঁটু আর পায়ের পাতার/মাঝখানে থতোমতো'...

জার্মান নাট্যকার ক্লাইস্টকে নিয়ে 'মৃত্যুমদির ভান্‌সি-হ্রদের তীর' নাটক লেখার মুহূর্তে যখন 'এক গর্ত রোদ্দুরের মধ্যে পড়ে যান কবি', রোদ্দুরের দৃষ্টিগ্রাহ্য বাক্‌প্রতিমা তখন আয়তন' পেয়ে স্পর্শযোগ্য হয়ে ওঠে। কবিতার নাম 'আমাদের পরিকীর্ণ গেরস্তালি'।

এ বইয়েরই—'চিত্রিত আছো, নিসর্গ' কবিতায় অসামান্য এক চিত্রকল্প, 'জলরঙে ধোওয়া জাপানি ছবিতে ছোট্ট একটা সেতু/প্রেমিকেরা পার হয়/দুধারে চৈতি চেরিগাছগুলি ফুল্ল খুশিতে জানায়/ সামরিক অভিবাদন/রামধনু দিয়ে গড়া ওই সেতু মজবুত মসৃণ/ প্রেমিকেরা পার হয়/ চিত্রিত আছে নিসর্গ, বলো স্বেদাক্ত শ্রমিকেরা/ কোন্ সাঁকো দিয়ে যাবে?'—সম্পূর্ণ-কবিতা এক চিত্রকল্পে উত্তীর্ণ। মনে রাখতে হবে সংগীতের মতো চিত্রকলার বিষয়েও অলোকরঞ্জন প্রায় গবেষকের মতো আগ্রহী। এই মাত্র আমরা দেখে নিলাম পাউণ্ড-কথিত সময় ও পরিসরের খণ্ড ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া এক 'intellectual and emotional complex', তাঁর চিত্রকলা সম্পর্কে বোধের আলোকেই। ট্রাজিক শিল্পী ভ্যান গখের কথা 'অকৃতজ্ঞ সূর্যমুখীর ব্যালাড' কবিতায় এসেছে এই শিল্পবোধের টানেই।

'ভাতের হাঁড়ির তলায় কিছু সফেন ফুল'-এর মতো চমকে দেওয়া চিত্রকল্প পাচ্ছি 'কবিসম্মেলনে' কবিতায়। 'রক্তাক্ত ঝরোখা'-র 'নির্বাসন' কবিতার যেমন আমরা গান্ধীর চিত্রকল্প পেয়েছিলাম অনবদ্য ব্যঞ্জনায়, দুই বাংলার সংযোগসেতু 'নিজস্ব এই মাতৃভাষায়' (১৯৯০) বইয়ের 'বিবর্ণ পরিচয়' কবিতায় পাচ্ছি বিদ্যাসাগকে 'বাবুরা শৌখিন এখনো, তুমি, আজো তাদের কুলি হয়ে/বহন করো ভার'...। 'মরমী করাত' (১৯৯০) বইয়ের নামকবিতায় অব্যক্ত ব্যথার স্বরাঘাতে/ জল চিরে নিয়েছি করাতে' কিংবা 'নিজেকে না ফেড়ে বলো বাজিয়েছে সঙ্গীত কবে কে?'র মতো জৈবিক (Organic) চিত্রকল্প, দ্বিতীয়টি আমরা জৈবিক চিত্রকল্পের উদাহরণ প্রসঙ্গে আগেই দেখে নিয়েছি। এ বইয়েরই 'বৃষ্টিরা আশ্রয় নেবে বলে' কবিতায় পাবো এক সদানন্দ সাধুর ছবি, যাঁর 'ছাতার নীচে বৃষ্টিরা আশ্রয় নেবে বলে মেঘের গা ঘেঁষে কিউ বেঁধে দাঁড়াত'।

যুধ্যমান বিশ্বে প্রতীতি ও অনাস্থার দোলাচলে কেঁপে ওঠা কবির আয়নায় যখন বিস্মন নয়, 'চরাচর জরিপের কাজ চলেছে', 'আয়না যখন নিঃশ্বাস নেয়' (১৯৯১) হল কবির সেই পর্বের কবিতার বই। তাই এখানে উঠে আসে 'শেফালির মুখে বারুদ এখন, মৃত্যু দুর্বাঘাসে'র

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

('যুদ্ধ বিষয়ে কয়েকটি ভগ্নাংশ) মতো চিত্রকল্প, হন্যমান দুনিয়ার মতোই নিষ্করুণ বারুদে-ঠাসা, মৃত্যুদীর্ণ। 'শরনার্থীর আর্জি' কবিতায় তাই দেখি, 'দূতাবাসগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? যেহেতু দেবেনা ভিসা'—শুধুমাত্র 'শরণার্থীর আর্জি নামঞ্জুর/করার জন্যে নিযুক্ত আছে রাজদূত আর হাজার দুই মনীষা।' মানুষের মেধাশক্তির করুণ অপচয় এখানে অপরিমেয় ভাবে সুপরিস্ফুট। 'সংকলয়িতা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ কবি তাই অভিমানে বলেন, 'এই টিউলিপ ফুলের হাসিগুলি/সংকলন করে নিয়ে মৃত্যুর গহ্বরে চলে যাব/নিদারুণ অনায়াসে ('সংকলয়িতা')। অনায়াসেই এক মৃত্যুত্তীর্ণ চিত্রকল্পের জন্ম হয়। তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় কবি 'পাখি আর ফুলের নাম' ওদেরই 'ভালোবাসতে বাঁচাতে মুক্ত করে দিতে গিয়ে কবিতার মধ্যে ওদের কবিতার মনোনয়ন আরেকটু সীমাবদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলাম....' ('বলেছিলাম')।

'যৌবনবাউল'-এর কানায় কানায় ভরা আলোর রিখিয়া থেকে অনেক দূরে এখন বেঁকে গেছে কবির চলতে থাকার চালচিত্তির। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আর গোছো গোছো ফুলের জলসাকে কবিতায় সীমাবদ্ধ করে কবি ফিরছেন নিত্যব্যবহার্য জীবনের প্রাত্যহিকতায়, তার স্বেদে, রক্তে ক্লেদে।

'রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ' (১৯৯৩) বইয়ের প্রথম কবিতাতেই তাই দেখব 'বাঁওড়, নদী' রয়েছে নিজেরই অবরোধে।'-র ('আর-তাছাড়া') মতো গতিরোধের চিত্রকল্প। 'অধমর্ণ' কবিতায় পদ্মের দোকানিকে নিয়ে 'একরাশ চিত্রকল্প মজুত হয়েছে', তবু তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারছেন না। 'রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ' কবির সেই পর্বের বই, যখন যুদ্ধরত পৃথিবী তাঁর জন্য রেখে গেল পূর্বধার্য-কাব্যমীমাংসার বদলে চ্যালেঞ্জসঞ্জারী কাব্যজিজ্ঞাসা। বিভাব কবিতায় তাই দেখি, 'রেখদেউল মেঘের রক্তলেগে/ভেসে উঠল প্রসন্ন উদ্বেগে'র মতো চিত্রকল্প। 'ইকলজির কবিতা'তেও আজ 'ভূর্জপত্রে শুধু রক্ত লেগে আছে' তাই।

(ছয়)

মিলটন, ডান, ড্রাইডেন, পোপের বৌদ্ধিক কবিতা থেকে রোম্যান্টিক পুনর্জাগৃতি ছিল অনেকটাই চিত্রকল্পের স্বতঃস্ফূর্ততায় ফিরে আসা। বাংলা কবিতায় পঞ্চাশের কবিদের জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্বে, কৈশোর মন্বন্তর ও দেশভাগের বেদনাসিক্ত, তা সত্ত্বেও কবিতাকে আবার কবিতার কাছে ফিরিয়ে আনবার ভাবনায় তাঁরা ছিলেন আলোড়িত। 'শতভিষা' (১৯৫১) এবং 'কৃত্তিবাসে'র (১৯৫৩) মতো সাহিত্যপত্রে সেই শুদ্ধ ও স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার অভিজ্ঞান। তিরিশের এলিয়ট-প্রভাবিত বৌদ্ধিকতা তো বটেই, পঞ্চাশের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা কবিতার মূল লিরিক্যাল সুর কিছুটা হারিয়ে যেতে বসেছিল স্লোগানধর্মী অথবা যৌনগন্ধী কবিতার প্লাবনে। ধূসর দিক্‌প্রান্তে দূরাদয়শ্চক্রনিভ এক ক্ষীণ নীলাঞ্জনরেখার সন্ধান পঞ্চাশের কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পঞ্চাশের তো বটেই, উত্তররৈবিক বাংলা কবিতার এক প্রধান কবি অলোরঞ্জনের কবিতায় আমরা চিত্রকল্পের স্বতোৎসার যেমন দেখেছি, তেমনি দেখব তার রহস্যগ্রন্থিল অপ্রত্যক্ষতাও।

'নদী ও রাত্রি বন্টন হয়ে গেলে' (১৯৯৪) বইয়ের 'রায়' কবিতায় আমরা দেখব একটি শ্রুতিধর্মী চিত্রকল্পকেই, কিন্তু তাকে ঈষৎ বাঁকিয়ে ধরা, নস্যাৎ করার মুদ্রায় 'মর্গ থেকে দুর্ঘটনামৃত/ ভাইয়ের জামা আনতে গিয়ে শিরীষবীথিকায়/ দোয়েলপাখির পদাবলির প্রতি/কর্ণপাত করিনি বলে আমার যত বৈরী ও বন্ধুর/মধ্যে সেদিন অবাধ মেশামেশি/ রায় দিয়েছে আমার চেয়ে আর কেউ নয় নিসর্গ বিদ্বেষী!'

'জ্বরের ঘোরে তরাজু কেঁপে যায়' (১৯৯৪) বইয়ের একটি কবিতায় দেখব কবি নিসর্গ-দেখেন ঠিকই, তবে লাইব্রেরি থেকে, 'কিন্তু গ্রন্থাগারে/ গোধুলি বড়োই চিরায়ত...এবং সহসা দেখি সহপাঠকের শিরোরুহের পিছনে/গিরিরাজি সুচিরায়ত সূর্যাস্তের উপান্ত্য আভায় বিভাসিত' ('এখন লাইব্রেরি থেকে নিসর্গ দেখব')। ঋগ্‌বৈদিক দেবতা রুদ্রকে আমরা নানা ভাবেই বাংলা কবিতায় পেয়ে এসেছি। তবে 'রুদ্রের ককুদ ঝাঁকিয়ে' দেবার চিত্রকল্প বোধহয় অলোকরঞ্জনেই সম্ভব। 'তুষার জুড়ে ত্রিশূল চিহ্ন' (১৯৯৬) বইয়ের 'মনোমুগ্ধকর দুর্বিপাকে' অংশের শিরোনামহীন ২৩ সংখ্যক কবিতায় যেমন।

'এখনো নামেনি, বন্ধু, নিউক্লিয়ার শীতের গোধুলি' (১৯৯৯) বইয়ের 'ড্যামোক্লেসের ছোরা' কবিতাটিতেও যুধ্যমান বিশ্বে আতঙ্কের এক উদ্যত চিত্রকল্প পশ্চিমি তথা গ্রীক পুরাণের ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত ঃ

সেই যে তুমি একফোঁটা মসলিনে
বুনতেছিলে দামাস্কাসের গোলাপ
মাথার উপর তখনো ঝুলছিল
ড্যামোক্লেসের ছোরা।

এই ড্যামোক্লেস ছিলেন সিরাকিউসের রাজা দ্বিতীয় ডায়নোসিয়াসের এক মোসাহেব পারিষদ। রোমান লেখক সিসেরোর আখ্যানে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের এই কাহিনিতে জানা যায়, ড্যামোক্লেস ছিলেন রাজার ক্ষমতা বিষয়ে ঈর্ষাপরায়ণ। রাজা ডায়নোসিয়াস ড্যামোক্লেসের চেতনা ফেরাতে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন, কিন্তু মাথার ওপরে রাখেন ঘোড়ার চুলে বেঁধে ঝোলানো এক তলোয়ার। ড্যামোক্লেস উপলব্ধি করেন ক্ষমতাসীন মানুষের আতঙ্কের কথা, তিনি রাজপদ ফিরিয়ে দেন। এই মিথটি প্রতীকী অর্থে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষের বিপদ বোঝাতে উল্লিখিত হয়ে থাকে।

অলোকরঞ্জনের কবিতায় দেখি মসলিনে সীবনকর্মরত দামাস্কাসের গোলাপ আঁকতে থাকা শিল্পীর মাথার ওপরেও সেই ড্যামোক্লেসের ছোরা। সৃজনের পরিসরেও এখন আশঙ্কার কালো মেঘ।

২০০৫ সাল। চলে গেলেন জীবনসঙ্গিনী ট্রুডবার্টা দাশগুপ্ত। 'ওষ্ঠে ভাসে প্রহত চুম্বন' (২০০৬) বইতে স্বভাবতই তাঁর ছবি, 'তোমার হাসিতে দেখলাম পৃথিবী তো/কিছু মুদ্রিত কিছু অপ্রকাশিত।' (পুঁথি আর বই') আর এই কবিতা শেষ হচ্ছে, 'তোমার যাবার পর

ISSN : 2394-4889 Sahitya Angan Vol : VI, Issue : XIV

থেকে/একটিও রাত্রির পাঠোদ্ধারে/ আর নেওয়া হয়নি প্রস্তুতি।' রাত্রি এখানে পুঁথি হয়ে উঠে ব্যতিক্রমী এক চিত্রকল্পের জন্ম দিয়েছে। পরবর্তী 'দুধে আলতায় কুয়াশায় আঁকা ছবি' (২০০৮) বইয়ের ইন্দ্রধনুর সাঁকোয় কাঁটা বিছিয়ে রাখার চিত্রকল্প আমরা আগেই দেখে নিয়েছি স্পর্শযোগ্য বাক্‌প্রতিমার উদাহরণ হিসেবে।

'চিত্রকল্প' কথাটির সরাসরি উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরেই। 'নৌকা চলেছে চূর্ণ চূর্ণ চিত্রকল্প নিয়ে' ('মাত্রাবৃত্তে', ওষ্ঠে ভাসে প্রথম চুম্বন)। উল্লেখ্য, এ বইয়েরই প্রথম কবিতার নাম 'ইমেজ'।

'বয়সের ছাপ মুছে ফেলি বল্কলে' (২০১০) বইয়ের কাব্যনাটিকা 'কবির মৃত্যু', কবীরের মৃত্যু নিয়ে লেখা। এখানে দেখব কবীরের সঙ্গে সংলাপরত এই কাব্যনাটিকার চরিত্র অলোকরঞ্জন কবীরকে বলছেন, 'ছড়িয়ে ছিলেন গোধূলির জাফরান/মাটি ও দিগন্তরে।' দৃষ্টিনন্দন এক চিত্রকল্পে কবীরবীজক নব-অলংকৃত।

'এখন নভোনীল আমার তহবিল' (২০১৩) বইয়ের প্রথম কবিতা 'শূন্যকোষ'-এও দেখছি বাক্‌প্রতিমার উল্লেখ :

একটি প্রিয়তম
বাকপ্রতিমা ছিল
সেটাও লাগিয়েছি কাজে

'দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি' (২০১৬ অন্তময়তার রেশ-লাগা কবির অন্ত্যপর্যায়ের এক উল্লেখ্য সৃষ্টি। এখান থেকে দেখে নেব একটি তীব্রতীক্ষ্ণ চিত্রকল্প,

'পাখিরা যখন খেলতে নামত তাদের শরীরে কোনো পালক
থাকত না। তখন তাদের দেখাত
এক-একটি উলঙ্গ অগ্নিপিণ্ডের
মতো।'...

হন্যমান দুনিয়াতেও কবির আশাবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী, স্পর্শযোগ্য চিত্রকল্পে, 'মাটি খুঁড়ে জল পাব, সেই জল সমুদ্রে মেশাব' ('এক-এক লাইনে সব বলে চলে যাব')।

পরের বই অমিয় দেব এবং সৌরীন ভট্টাচার্যকে উৎসর্গীকৃত 'তোমরা কী চাও, শিউলি না টিউলিপ'?' (২০১৭)। এর 'ভাইফোঁটার দেয়ালটা' কবিতা থেকে একটি আশ্চর্য চিত্রকল্প তুলে ধরি? মেজদির মৃত্যুর পর প্রবাসী ছ-ভাই জড়ো হয়েছেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। টালিগঞ্জের সেই পোড়ো বাড়িতে 'পাশের বাড়ির মালি তালা খুলে আমাদের নিয়ে গেল চোরাগোপ্তা/একটি কুঠুরিতে যার একটাই মাত্র দেয়াল। যে- সব ভাই ভাইফোঁটার দিন/ আসতে পারেনি সেই দেয়াল জুড়ে তাদের জন্য মেজদির-দেওয়া চন্দনের ফোঁটা থরে/থরে

বিকীর্ণ রয়েছে!' আজকের দুনিয়াজোড়া বিচ্ছিন্নতার আবহে বঙ্গসংস্কৃতির একান্নবর্তী স্নেহাঞ্চল যেন করুণ মমতাভরে কবিতাটির গায়ে বিছিয়ে আছে।

'ঝাউশিরীষের শীর্ষসম্মেলনে' (২০১৯) বইয়ের 'অজন্তা সিরিজ' নামের কবিতাটি স্বভাবত দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্পের সৌজন্যে উজ্জ্বল। কথা এখানে ছবি নয়, ভাস্কর্য হয়ে ওঠে। ভগিনী নিবেদিতার বয়ানে নন্দলাল বসুকে বলা, 'মুহূর্তে-মুহূর্তে মেঘের মর্মরমূর্তিতে যে-ভাস্কর্য তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়/ব্রোঞ্জ বা পাথর পেরে ওঠে না'। আবার এ বইয়েরই 'ফল্গুপাখি' কবিতায় দেখি, 'ময়ূর মাতে শ্রাবণ মাসের বিকট বিজ্ঞাপনে।' বিজ্ঞাপনে মুখ-ঢাকা পৃথিবীরই উচ্চকিত প্রতিচ্ছবি। তাই 'ভস্মগর্ভা' কবিতায় কবি দেখেন 'জল পুড়ে ছাই'। একদা মেরুদণ্ডে গোলাপ রেখেছিলেন কবি, সে-গোলাপ লুণ্ঠিত, তবুও তিনি ঘোষণা করেন দৃপ্তভাবে, 'এখন আমার ব্যাপ্ত মেরুদণ্ড সমস্ত আকাশ।'

শেষ বই 'বস্তুহারার পাহাড়তলি'-র চিত্রশালা থেকে কিছু চিত্রকল্প আমরা আগেই দেখেছি। 'প্রভাতের একটি দিন' কবিতায় আমরা দেখছি, 'শুশ্রূষার অভাবে রক্তবমি জুড়ে দিল এক শ্যামকান্তি মেঘ? এর মতো বাকপ্রতিমা। বাক্প্রতিমা নির্বাচনের ব্যাপারে কবি নিত্যনতুন দিগন্তের অভিসারী। পুনরুক্তি তাঁর স্বধর্ম নয়। তাই তিনি বলেন, 'চিলে কোঠায় খুঁজে পেলাম মাদুরে পাতা/আমার নতুন পাণ্ডুলিপির আদুরে খাতা/ছাপতে তবু দিতে পারি না আমি এটাকে/যেহেতু তার প্রতিটি বাঁকে/আমার আগের বাক্প্রতিমা অব্যাহত' ('উদয়াস্ত লিখতে গিয়ে')।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কাব্যপ্রবাহে কাঠবেড়ালি, জোনাকি বা শিশিরের মতো অণোরণীয়ান বিষয়ও মহত্ত্ব পায়। শেষ বই থেকে শিশির নিয়ে এক বিপ্রতীপ চিত্রকল্প দিয়ে আমাদের এই মিতাভিলাষ আলেখ্যের ইতি টানি : 'আমার মশাল থেকে যখন ঝরছিল শিশির' ('বলা হয়নি')। কবি চলে গেছেন, তবু তাঁর মশাল থেকে ঝরা শিশিরে বাংলা কবিতা অভিস্নাত হোক।

উল্লেখপঞ্জি :

১। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : রবীন্দ্র অলোকবর্ষে (পাঠক,), ২০২০ 'রবীন্দ্রকবিতায় চিত্রকল্প'

২। তদেব

৩। তদেব

৪। I. A Richards : Practical criticism (cambridge,)1939

৫। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : রবীন্দ্র আলোকবর্ষে (পাঠক, ২০১৯)

৬। সুমিতা চক্রবর্তী : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ঃ প্রত্যক্ষের রূপ (কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণ কমিটি, ২০১৮)

৭। তদেব

৮। তদেব

৯ । গীতা চট্টোপাধ্যায় : এক অক্ষৌহিনী বৃষ্টিরেখা (ঋক্ প্রকাশন, ১৯৯৩)

১০। আলোক সরকার : বাহিরে অন্তরে (দি সি বুক এজেন্সি, ২০১৩)

১১। Marjorie Boulton : The Anatomy of Poetry (Kalyani Publishers, 1998)

১২। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : আমার প্রথম বই (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ মার্চ, ২০১৩)

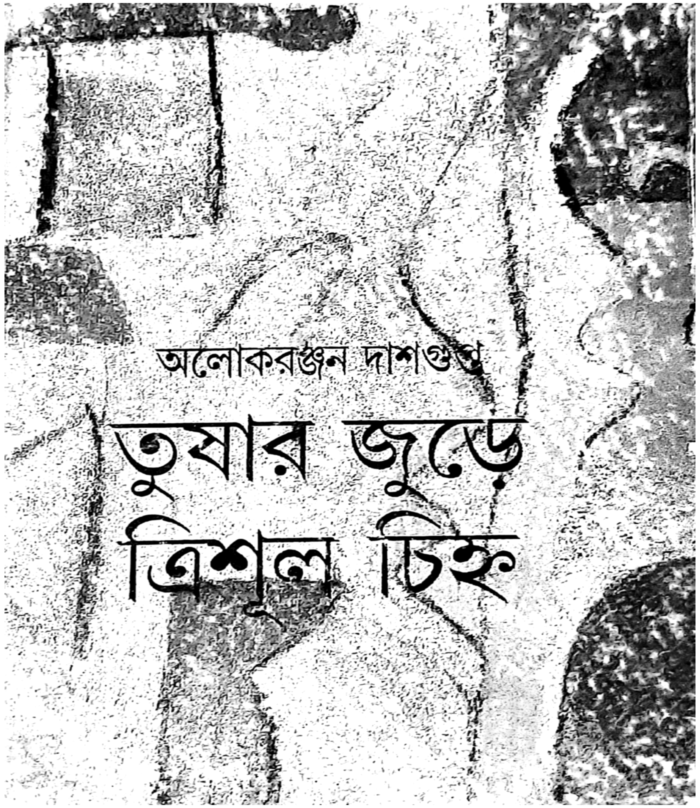

অলোকরঞ্জনের জীবনানন্দ : সেমিওটিক অনুধাবন

রমাপ্রসাদ দে

"শব্দটি হলো 'চিহ্ন'। আজকের বরণীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের সহায়তায় আমরা তার কাছে নত হই। আমি এখানে বিশেষ করে সেমিওলজিস্ট অথবা চিহ্নবিজ্ঞানী ফের্দিনাঁ দ্য সোস্যুর-এর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন পালাপার্বণকেও যদি আমরা চিহ্ন হিসাবে নির্ণয় করে নিই তাহলে তারা নতুন আলোর সন্দীপনে দুলে উঠবে।"—কথাগুলি লিখেছেন আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'সুন্দরের অভ্যর্থনা' (১৯৯৭) গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠায়। কিন্তু শুধু সুন্দরের অভ্যর্থনা নয়, আট বছর আগে লেখা তাঁর 'জীবনানন্দ' শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনাও, আমরা পুলকিত হয়ে লক্ষ্য করি, এই নতুন আলোর সন্দীপনে দুলে উঠেছে।

সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩) অবশ্য ভাষার সাহিত্যিক প্রকাশ নিয়ে ভাবিত ছিলেন না। ভাষাতত্ত্বকে তিনি চালিত করেছেন সমকালীন ভাষার অনুধাবনে। ডায়াক্রনিক ফসিল উদঘাটন নয় আর, ভাষার জীব সিনক্রনিক রূপ-রহস্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন তিনি। আমরা পরিচিত হলাম শব্দচিহ্নের পরস্পরস্পর্শী দুটি উপাদানের সঙ্গে—চিহ্নায়ক (signifier) ও চিহ্নায়িত (Signified)। ভাষার ক্ষেত্রে চিহ্নায়ক শব্দের ধ্বনিরূপ (acoustic image), চিহ্নায়িত তার ধারণা (concept), বস্তুজগতের নির্দেশক-অর্থ থেকে যা বিশ্লিষ্ট। কারণ তাৎক্ষণিক উপস্থিতি ছাড়াও বস্তুর চিত্ররূপ আমরা মনের চোখে প্রত্যক্ষ করি। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত এই দুই প্রান্তের মেলক হচ্ছে চিহ্ন। চিহ্নের মধ্যে পদার্থিক চিহ্নায়ক ও মনস্তাত্ত্বিক চিহ্নায়িত সমাহৃত :

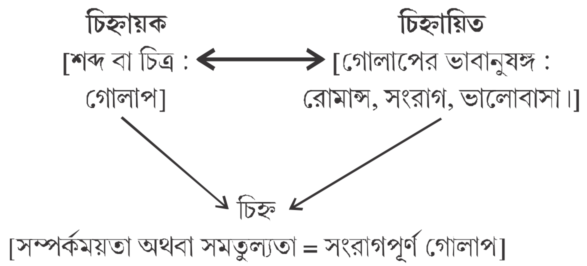

জীবনানন্দের চিন্তার নিজস্ব সিনট্যাক্স আলোচনা প্রসঙ্গে দ্য সোস্যুর, রোমান ইয়াকবসন, রোলা বার্ত প্রমুখ চিহ্নবিজ্ঞানীর প্রসঙ্গ এনেছেন অলোকরঞ্জন। ভাষাতাত্ত্বিক সোস্যুরের উত্তরসুরি ইয়াকবসন ভাষাতত্ত্বের আঙিনা থেকে কবিতার পর্যালোচনা করেছেন। কবিতার

ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে তাঁর প্রাজ্ঞ অনুধাবন : 'The poetic function projects the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of combination'। একদিকে নির্বাচন, অন্যদিকে গ্রন্থন :

নির্বাচন-অক্ষ নিম্নগামী, আমাদের আত্মস্থ সঞ্চয়গৃহ থেকে তা তুলে আনে সমশব্দাবলির কোনো একটি বিকল্প। এখানে নির্বাচিত শব্দটির সঙ্গে সমতুল্য অন্য শব্দগুলির সম্পর্ক অনুপস্থিতির। অন্যদিকে গ্রন্থন-অক্ষে পাই শব্দাবলির সমন্বয়ী বিন্যাস; এখানে একের সঙ্গে অন্যের উপস্থিতির সম্পর্ক। চিহ্নের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন দার্শনিক চার্লস স্যাণ্ডার্স পার্স (১৮৩৯-১৯১৪)। চিহ্নাবলিকে তিনি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেন—প্রতীক (symbol), সূচক (index), এবং প্রতিম (icon)। শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক যখন আপতিক, পার্সের বিবেচনায়, তা প্রতীক। লাল আলোয় থেমে যাওয়া, সবুজ আলোয় চলতে থাকা যেমন আরোপিত অভিজ্ঞান, ভাষার শব্দচিহ্নগুলোও তেমনি ধ্বনিরূপ ও ধারণায় আপতিক সম্পর্ক-সঞ্জাত। সূচক ও প্রতিম মূলত বাচনিক নয়, চিত্রধর্মী। যেমন ধোঁয়া থেকে আগুনের ধারণা (ধোঁয়া আগুনের সূচক) কিংবা ফটো থেকে কোনো মানুষকে সনাক্ত করা (ফটো মানুষের প্রতিম)। কিন্তু সূচকের সঙ্গে মেটনমি এবং প্রতিমের সঙ্গে মেটাফরের যোগাযোগের মাধ্যমে ইয়াকবসন দেখালেন শুধু প্রতীক নয়, সূচক ও প্রতিমও ভাষা-ব্যবহারের অন্তর্গত। এইভাবে বাচনিকস্তরে তিনি সূচক ও প্রতিমকেও অন্তর্গত করলেন এবং কাবের আলোচনায় চিহ্নের পরিধিকে প্রসারিত করলেন।

ভাষা কিভাবে অভিধেয়-অর্থ থেকে দ্যোতনা-অর্থে পৌঁছে যায় তার একটি মডেল দিয়েছেন রোলাঁ বার্ত। অভিধেয় প্রকাশস্তর থেকে দ্যোতনার প্রকাশস্তরে উত্তরণের ছকটি তিনি এভাবে দেখিয়েছেন—

Secondary Sign : Connotation	expression$_2$ (R_2)	content$_2$	
Primary Sign : denotation	expression$_1$ (R_1)	content$_1$	

বার্ত প্রাথমিকভাবে চিহ্নকে দেখেছেন ERC-র সমবায়। E, an experession (or signifier), in relation (R) to C, a content (or signified) : ERC চিহ্নের এই প্রাথমিক পর্যায় উপরিতল চিহ্ন-ব্যবস্থার উপাদান। দ্বিতীয় পর্যায়ে চিহ্নের এই প্রাথমিক $E_1R_1C_1$ কে আমরা পাই চিহ্নায়কের অবস্থানে যার পরিণাম $E_2(= E_1R_1C_1)R_2C_2$। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়টি হল denotative এবং দ্বিতীয় পর্যায়

connotative semiotics। বার্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন Paris-Match পত্রিকার ১৯৫৫-র দিকে প্রকাশিত একটি সংখ্যা থেকে। প্রচ্ছদ চিত্রে একটি তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক—পরণে ফরাসি সৈন্যবাহিনীর পোষাক, চেয়ে আছে ফ্রান্সের জাতীয় পতাকার দিকে। এখানে ফটো (=expression) যাতে দেখানো হয়েছে (denotation) আফ্রিকান এক কৃষ্ণাঙ্গ ফরাসি সৈন্যের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় ফ্রান্সের পতাকাকে অভিবাদন করছে—তাই হল content। কিন্তু এই denotative চিহ্নের ($E_1R_1C_1$) বাইরে আরও একটি content আছে (C_2) আর তা হল 'এক মহান ঔপনিবেশিক শক্তি যেখানে সৈন্যবাহিনীর কৃষ্ণাঙ্গরাও অনুগত'। তা-ই বলা হয়েছে This content (C_2) is the content of a new (connotative) sign. Its expression (E_2) is the whole of the denotative sign $E_1R_1C_1$। Elements of Semiology বইটিতে বার্ত লিখেছেন, 'This is the case which hilmslev calls connotative semiotics; the first system is then the plain of denotation and the second system (wider than the first) the plain of connotation"।

সোস্যুর ভাষাতত্ত্বকে সেমিওলজির অন্তর্গত করে দেখেছেন। তাঁর কথায় 'linguistics mearely formed a part of the general science of signs."। কিন্তু বার্ত ভাষাতত্ত্বের অবস্থান থেকে অন্যান্য চিহ্নব্যবস্থাকে দেখলেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী the world of signifieds is none other than that of language। জীবনানন্দের 'কার্তিকের ভোরবেলা' কবিতাটি আলোচনায় অলোকরঞ্জন বার্তের পরিধেয়-ভাবনায় ভাষাতত্ত্বের এই মডেল লক্ষ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সোস্যুর সামাজিক ভাষাপদ্ধতি (language) ও প্রত্যক্ষ পরিবেশসাপেক্ষ ব্যক্তি-মানুষের বাক্‌রীতির (parole) মধ্যে যে-তফাৎ করেছেন, এখানে তার উল্লেখ অনিবার্য। ব্যাপ্ত ভাষাপদ্ধতির দ্বারা আশ্রিত হয়েও ব্যক্তি যখন সেই প্রথানুমোদিত ভাষাবিধিকে নিজের মতো করে ব্যবহার করে, তখনি বাক্‌রীতির জন্ম হয়। বার্ত মানুষের পরিধেয়ের সঙ্গে তুলনা করে ভাষার এই দুটো দিক স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন। পরিচ্ছেদ যখন ভাষাপদ্ধতি বিভিন্ন বাক্যাংশের দৃষ্টান্ত/বিধি/সংহিতার স্তরে থাকে তখন বোঝায় তার কোন্ কোন্ অংশ বা খুঁটিনাটি একই সময়ে দেহের একই অংশে পরিধান করা যাবে না, অথবা যার ব্যবহার অন্যভাবে করলে পরিধেয় পোষাকের তাৎপর্যটাই যাবে পালটিয়ে। আবার পরিচ্ছদ যখন বাক্‌রীতি/বাক্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে গূঢ় সম্পর্কময়তা/বার্তার পর্যায়ভুক্ত হয়, তখন পরনের একই সাজ-পোষাকে বিভিন্ন উপাদানের সন্নিবেশ ঘটে যায়। বার্ত এখানে টি-শার্ট-জিনস্ ও স্যাণ্ডেল পরা একটি তরুণীর উপমা দিয়েছেন। তার ঐ মিশ্র, প্রচলিত পদ্ধতি থেকে নির্বাচিত অথচ মিশেল-দেওয়া প্রাতিস্বিক, রীতির মধ্য দিয়ে আমরা ঠাহর করে নিতে পারি এখানে 'উচ্চতর জটিলতাসম্পন্ন' একটি ধরণ উদ্ভূত হল। এই যে টি-শার্ট-জিন্স-স্যাণ্ডেলের গ্রন্থনা এটি যেন এক ধরণের বাক্য।"

ISSN : 2394-4889 Sahitya Angan Vol : VI, Issue : XIV

পোষাকের বস্তু (object/o) ভিত্তি (support/s) ও চল (variant/v) একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ফ্যাশনের ক্ষেত্রে তার বিকল্প অভিযোজনও লক্ষ করা যায়। যেমন—

Skirts	with	a full	blouse
O		V	S

বিকল্প দৃষ্টান্ত

Skirts	with	a denim	blouse
O		V	S

অথবা

Skirts	with a	see-through	blouse
O		V	S

ভাষার নির্বাচন অক্ষের বিকল্প উপাদানের মতোই ফ্যাশনের বিন্যাসও বিকল্প-সন্ধানী। এক্ষেত্রে 'চল'-এর পরিবর্তনশীলতাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তবে বদলে যেতে পারে ভিত্তির চিহ্নায়নও (Signification)। বার্ত আমাদের সঙ্গে এই যে তরুণীটির পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, আলোকরঞ্জন লিখেছেন, 'সে অনায়াসেই জিন্স ও চপ্পল বজায় রেখে তদুপরি পুরুষের পরিধেয় একটি বাটিক-রঙা পাঞ্জাবি পরেও তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারত। এই সেই বৈপ্লবিকতার বিন্যাসই ইয়াকবসন কবিতার কাছে দাবি করেছেন। কবিতা প্রতিদিনের বৈধ ভাষার উপর এক অর্থে 'স্বেচ্ছাচারিতা' করেই নতুন জগৎ রচনা করে....। এই সূত্রের সাহচর্যে 'কার্তিকের ভোরবেলা' কবিতাটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক পাঠ করা যাক—

আমলকি গাছ ছুঁয়ে তিনটি শালিখ
কার্তিকের রোদে আর জলে
আমারি হৃদয় দিয়ে চেনা তিন নারীর মতন
সূর্য? নাকি সূর্যের চপ্পলে

পা গলিয়ে পৃথিবীতে এসে
পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়
এ জীবনে আমি ঢের শালিখ দেখেছি
তবু সেই তিনজন শালিখ কোথায়?

আমাদের চমক লাগে সূর্যকে কবি তখন তিনটি শালিখের পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করেন

শালিখের পরিধেয় ≡ সূর্য চপ্পল।

সমন্বয় (নির্দেশিত) ও সমতুল্যতার (নির্দেশিত) উপর ভর করে চিহ্নায়নের বিষয় ও ভিত্তি এখানে একই উপাদানে সমাহৃত। চিত্ররচনার এই সাহসিক অভিনবত্বে আমরা উন্মথিত হই, বারবার মনের মধ্যে ফিরে আসে এই পঙ্‌ক্তিনিশ্চয় ঃ

সূর্য? নাকি সূর্যের চপ্পলে
পা গলিয়ে পৃথিবীতে এসে
পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়

লেখকের সঙ্গে আমরাও একমত : 'ভাষার এই অকুতোভয় ব্যবহার, এই অনায়াস সঞ্চরণ, বাংলা কবিতায় এর আগে কিংবা পরে হয়েছে কিনা, সেই মর্মে সুবিনীত সংশয় প্রকাশ করা যায়।'

এক পৃথিবীর রক্ত নিপতিত হয়ে গেছে জেনে
এক পৃথিবীর আলো সব দিকে নিভে গেছে বলে
রঙিন সাপকে তার বুকের ভিতরে টেনে নেয়;
অপরাহ্নে আকাশের রঙ ফিকে হলে।

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিম বিন্যাস;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত;
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

বাক্যের এক একটা অংশকে স্পর্শভীরু আঙুলে সরিয়ে দিয়ে কবি গড়ে তুলছেন তাঁর নিজস্ব চিন্তার সিনট্যাক্স—প্রদত্ত পুনরুক্তি ও প্রবর্তিত নবত্বের মাধ্যমে নিজের ভিতরের বিবাদী ভাবনার এই রূপায়ণ। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'প্রদত্ত উপকরণকে ব্যতিব্যস্ত করে নবত্ব নিয়ে আসার এই ধরণটি ভাষাতত্ত্বের প্রাগ্ স্কুলের দেশনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়।...প্রকৃত তাৎপর্যকে শব্দ-অর্থের পরিসরে চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রাগ্ ভাষাতত্ত্বের কোনো-কোনো প্রবক্তা ব্যাকরণের স্বাধীন ও সাপেক্ষ দুটি দিকের উপর জোর দিয়েছেন।' সাপেক্ষ অঙ্গবাক্যে (clause) পরিজ্ঞাত তথ্য, স্বাধীন অঙ্গবাক্যে পুনর্ণবের উপস্থাপনা—এভাবেই গৃহীত ও যোজিত অংশের পারস্পরিক অভিঘাতে গড়ে ওঠে জীবনানন্দের বাক্যের ধরন। বাক্যের অন্তর্গত স্তরভেদ লক্ষ না করলে অর্থগত তাৎপর্যও থাকে অনির্ণেয়। আলোকরঞ্জন লক্ষ করেছেন, জীবনানন্দের বাক্যগঠনে এরকম অঙ্গ-বাক্যের 'বিপুল প্রাধান্য'।

বিশেষ্যগুচ্ছ আর ক্রিয়াগুচ্ছের সংযোগে রচিত হয় এক একটি অঙ্গবাক্য। এই সংগঠনের

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

রূপ

NP (.......) X (.........) VP (.........)

NP বা বিশেষ্যগুচ্ছ সাধারণত কর্তা (S), X-উপাদান কর্ম বা সম্পূরক (o/c : object/ complement) কিংবা ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় (Av : adverbial)। ক্রিয়াবিশেষণ আমাদের জানিয়ে দেয় কখন/কিভাবে/কোথায় অঙ্গবাক্যের কাজ সম্পন্ন হল। বাক্যে এই উপাদানের বিলোপন ঘটতে পারে অথবা স্থানান্তরণ। অনেকসময় X- উপাদানে সন্নিবিষ্ট থাকে o/c + Av। শৈলীগত অনুধাবনে কর্ম ও সম্পূরক আলাদা করে দেখা হয় না, কিন্তু ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় উপাদানের বৈশিষ্ট্য আলাদা। বাক্যে তার অবস্থান স্থির নির্ধারিত নয়, সঞ্চরণশীল। অবশ্য বাংলা বাক্যের নমনীয়তার কারণে কর্তাকর্মও আসতে পারে স্থানান্তরিত অবস্থানে। যেমন—

(O) একটি পয়সা (S) আমি (VP) পেয়ে গেছি (Av) আহিরীটোলায়

(O) একটি পয়সা (S) আমি (VP) পেয়ে গেছি	(Av) বাদুড়বাগানে
প্রদত্ত	নবত্ব

সাপেক্ষ / প্রদত্ত	একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
অঙ্গবাক্য /পুনরুক্তি	
স্বাধীন / প্রবর্তিত	তবে আমি হেঁটে চলে যাবো মানে-মানে।
অঙ্গবাক্য / নবত্ব	

স্তরবহুল পুনরুক্তির একটি দৃষ্টান্ত 'নগ্ননির্জন হাত' :

...আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এইসব ছিলো সেই জগতে একদিন।
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিলো,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিলো অনেক,
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো,
অনেক কমলা রঙের রোদ;
আর তুমি ছিলে...

প্রদত্ত ভাবস্তুকে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে নবত্বের আকস্মিক এই উন্মোচন পরিচিতের

অপরিচিতিকরণে অতিক্রান্তির চিহ্নায়ক বহন করে। অলোকরঞ্জন লেখেন 'বিকল্পের মাধ্যমেই যে নির্বিকল্পের যথার্থ প্রতিষ্ঠা সম্ভব, এই ধ্যানধারণা এর আগে আমাদের কোনো কবিই রূপান্বিত করে তোলেননি, অথবা তুলতে চাননি, সেকথাটাও এই সূত্রে স্পষ্টভাবে বলার দরকার আছে।'

মসৃণতাপ্রিয় পাঠক জীবনানন্দের কবিতায় ধ্বনি ও অর্থের সমঞ্জস সমান্তরতা প্রত্যাশা করেন। কিন্তু রৈখিক বিন্যাসে অর্থ যেন কিছুতেই অপাবৃত হয় না। ধ্বনির সমতল থেকে সৃষ্টি সিঁড়ি বেয়ে অর্থের অবতলে নেমে যেতে যেতে হঠাৎ নিভে যায় দীপশিখা। নিরুপায় অন্ধকারে 'পলাতকা'র বামীর মতোই তখন কান্নাভেজা সুরায়ণে বলতে হয়—'হারিয়ে গেছি আমি।' কিন্তু কবির সঙ্গে পাঠকও যদি সৃষ্টিশীল হন, তিনি নির্মাণ করে নেবেন অর্থময়তা—ধ্বনি থেকে, শব্দ থেকে, শব্দবিন্যাস থেকে, এমন কি দুটি শব্দের মধ্যে যে শূন্যায়তন, সেখানেও খুঁজে পাবেন অর্থের ইশারা। আপাতত আমরা সাংগঠনিক দ্ব্যর্থতার একটি দৃষ্টান্ত নিই। 'সুরঞ্জনা' কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম দুই পঙ্ক্তি এইরকম :

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো....

আলোকরঞ্জন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তোলেন—'কীভাবে আমরা এই দুটো লাইন পড়ব?' অবশ্যই প্রথম লাইনের দুরকম পাঠ হতে পারে :

১। বয়স বেড়েছে ঢের—নরনারীদের

অথবা

২। বয়স বেড়েছে—ঢের নরনারীদের

প্রথম বাক্যে 'ঢের' ক্রিয়াবিশেষণ, তার সাযুজ্য 'বয়স বেড়েছে' বাক্যাংশের সঙ্গে, দ্বিতীয় বাক্যে 'ঢের' বিশেষণ, তার সাযুজ্য 'নরনারীদের' সঙ্গে। যদি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করি—ঢের = x নর = y এবং নারী = z, তাহলে দ্বিতীয় বাক্যের সরলার্থ দাঁড়াবে এইরকম : $x (y + z) = xy + xz$ অর্থাৎ ঢের নর এবং ঢের নারীর বয়োবৃদ্ধি। "এর পরেই আমরা যখন শুনি 'ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো' তখন বয়স বাড়া এবং নির্বাপণের এক পরস্পরবিষমতা রচিত হয়।" আলোকরঞ্জন লেখেন, 'সন্দেহ নেই, এ দুয়ের মধ্যে একটি গূঢ় সম্বন্ধ আছে। অনশ্বর/নশ্বরের যে-প্রতীপায়ন এখানে ঘটে যায়, তার সামনে দাঁড়িয়ে পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক, এ দুয়ের কোনো একটি অর্থসঙ্কেতের মধ্যে এই কবিতাকে আবদ্ধ করে দেখানো যাবে না।' যাবে না তার কারণ বয়োবৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত সূর্যনক্ষত্রের ঈষৎ নিভে যাওয়া আলোয় বার্ত-কথিত দ্বিতীয় পর্যায়ী অর্থে উত্তীর্ণ।

জীবনানন্দের 'সুরঞ্জনা' কবিতার তৃতীয় স্তবকের ধ্বনিবিন্যাসে দুরকম স্বরতরঙ্গের

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

স্পন্দমানতা লক্ষ করেছেন আলোকরঞ্জন :

এ-ধ্বনি	**ও-ধ্বনি**
মনে পড়ে কবে	উতরোল
রাতের বাতাসে	অন্তিম
ধর্মাশোকের ছেলে	বড়ো
মহেন্দ্রের সাথে	তবুও
সাগরের পথে	সংঘ
নিয়ে প্রাণে	আরো
পারিনি বোঝাতে	আলো

কবিতায় স্বরতরঙ্গ তথা সংগীতময়তার মূলে স্বননশীল ধ্বনি (sonorants)। ব্যঞ্জনের কোলাহল ছাপিয়ে এই ধ্বনির পুনরুক্তি যতই প্রাধান্য পায়, ততই অনুভূত হয় কবিতার সংগীত।

জীবনানন্দের মতো কবির রচনায় শব্দ ও ধ্বনির যৌথ সক্রিয়তা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। গদ্য যেখানে শব্দার্থেই সমর্পিত, কবিতায় সেখানে ধ্বনিও সংজ্ঞাপনে সহায়ক। নীচের রেখাচিত্রটি লক্ষ করা যাক :

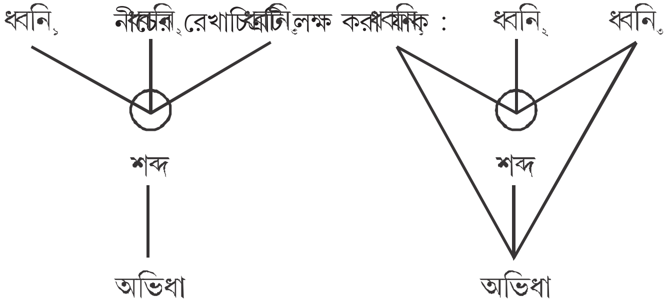

গদ্যে ধ্বনি শব্দের সেবায় নিয়োজিত, শব্দের অন্তর্গত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছে প্রার্থিত অভিধায়। কবিতায় (ডানদিকে)শব্দের অভিধার সঙ্গে প্রসঙ্গ-সংবেদী (context sensitive) ধ্বনিরও প্রত্যক্ষ সংযোগ।

কিন্তু শুধু অভিধাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না কবিতার ধ্বনি। সহসংবেদনের (Synaesthesia) স্নায়ব সূত্রে তা রূপকধর্মী হয়ে উঠতে পারে। যেমন আমাদের অতি পরিচিত এই পংক্তিটি—

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'

আ-ধ্বনি এখানে ব্যপ্তির মেটাফর। সুদূর অতীতে বিদিশার অন্ধকারে আমাদের পৌঁছে দেবার জন্য কবি পরপর কয়েকটি ধ্বনি-ঢেউ তৈরি করেছেন—

চুল তা—র কবেকা—র অন্ধকা—র বিদিশা—র নিশা

আ-এর ক্রমিক দীর্ঘ উচ্চারণে আমরা পাচ্ছি সুদূরের phono-signifier বা স্বনচিহ্নায়ক।

ধ্বনিকে স্বলক্ষণসমবায় হিসাবে উপস্থিত করে রোমান ইয়াকবসন যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বিপ্লব এনেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিকতা দূর বিসর্পিত। স্বলক্ষণের ইতি ও নেতিবাচক দ্বিসম্ভব বিশ্লেষণরীতি যেমন প্রযুক্ত হয়েছে নোয়াম চমস্কি ও মরিস হালির সঞ্জনন ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে, তেমনি তা এসেছে লেভি স্ট্রসের সাংগঠনিক নৃতত্ত্বে, মিখাইল বাখতিনের ডায়ালগধর্মী সমালোচনা সাহিত্যে। কবিতার ক্ষেত্রেও ধ্বনির দ্বিসম্ভব স্বলক্ষণ সমবায় তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষ করা যাক নীচে এই সারণি :

	ই	এ	অ্যা	আ	অ	ও	উ
তীক্ষ্ণ (acute)	+	+	+	±	−	−	−
জলদ (grave)	−	−	−		+	+	+
সঘন (Compact)	−		+	+	+		−
বিতত (diffuse)	+		−	−	−		+

কবিতায় ধ্বনি রচনার দুটি প্রধান বৈপরীত্য আলো-অন্ধকার, স্থিরতা-অস্থিরতা স্বরের ধ্বনিপদার্থিক বৈশিষ্ট্যে আভাসিত। আলো-অন্ধকারের সঙ্গে যেমন Acute-grave স্বলক্ষণের সম্পর্ক, তেমনি স্থিরতা-অস্থিরতার সঙ্গে Compact-Diffuse স্বলক্ষণের সহযোগ। প্রথম বৈপরীত্য দেখা দেয় 'by opposing vowels with maximally low second formants (grave) to those which have maximally high second formants (acute)।' পরবর্তী বৈপরীত্য অনুভূত হয় 'by the opposition of vowels with maximally high first formants (compact) to vowels with maximally low first formants (diffuse)'। formant বা রূপছায়া

±

মুখবিবরে অনুনাদের চিত্ররূপ। রূপছায়ার চূড়ান্ত অবস্থানই বৈপরীত্য নির্দেশক। যেসব স্বরধ্বনির রূপছায়া চূড়ান্তভাবে উচ্চ নয়, নিম্নও নয়, তাদের অবস্থান নিরপেক্ষ ( )।

কবিরা স্বভাবত ধ্বনিসচেতন। ইয়াকবসন লক্ষ করেছেন চেক শব্দ den দিন এবং noc রাত-এর মধ্যে যে স্বরস্বনিমগত পার্থক্য তার স্বলক্ষণ তীক্ষ্ণ (acute) ও জলদ (grave) যা এক্ষেত্রে দিবসের উজ্জ্বলতা ও নক্ত আচ্ছন্নতায় বিপরীতার্থক। কিন্তু সব ভাষাতেই দিন ও রাতের প্রতিশব্দে প্রার্থিত এই বৈপরীত্য আসে না। সেক্ষেত্রে কিভাবে আলো-অন্ধকারের ব্যঞ্জনা আনেন কবিরা? এই সূত্রেই এসেছে ফরাসি শব্দ jour দিন ও nuit রাত-এর প্রসঙ্গ। মালার্মের মতো ধ্বনি সচেতন কবিরা সেক্ষেত্রে jour ও nuit এর প্রতিবেশে নিয়ে আসেন যথাক্রমে তীক্ষ্ণ ও জলদ স্বরস্বনিমের শব্দ আর এভাবেই খুঁজে নেন দিন ও রাতের আলো অন্ধকারের ব্যঞ্জনা-নির্ভর ধ্বনিমাধ্যম। ধ্বনির এই ভাবদ্যোতকতা compact ও diffuse ধ্বনি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। স্থিরতা-নির্দেশক সঘন ধ্বনির অনুষঙ্গে জেগে ওঠে ব্যাপ্তি, সমগ্রতা, ভারসাম্য ইত্যাদি ভাবানুভূতি। বনলতা সেন-এর বর্ণনায় আমরা যেমন লক্ষ করেছি কিভাবে আ-ধ্বনি (compact) আমাদের পৌঁছে দিচ্ছে ইতিহাসের দূর প্রাপ্ত অতীতে। পক্ষান্তরে বিতত ধ্বনিতে আভাসিত হয় অসম্পূর্ণতা, ভারসাম্যের বিচ্যুতি, দুঃখানুভূতি। স্বভাবতই জীবনানন্দের কবিতা যখন ইতিহাস-আশ্রিত, তখন সেখানে compactness আর যখন তার কবিতার বিষয় সমকালীনতা, তখন diffuseness লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দের কবিতা আলো-অন্ধকারে আন্দোলিত। এখানে আলোর মধ্যে অন্ধকার, অন্ধকারে আলোর উৎসারণ। অলোকরঞ্জনের অনুধাবনে 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের বিভাব : 'রৌদ্রের অন্তর্নিহিত অন্ধকার'। রিস্টওয়াচ, নাবিকী, সূর্যপ্রতিম প্রভৃতি কবিতায় ঘুরে ঘুরে আসে অন্ধকারের কথা।

দূর সমুদ্রের শব্দ
শাদা চাদরের মতো—জনহীন—বাতাসের ধ্বনি
দু' এক মুহূর্ত আলো ইহাদের গড়িবে জীবনী।
স্তিমিত-স্তিমিত আরো ক'রে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।

(রিস্টওয়াচ)

একদিকে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির', অন্যদিকে —

নক্ষত্রপথের
অন্তঃশূন্যে অন্ধ হিম আছে জেনে নিয়ে
তবুও তো ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিশিল্প জাগে;(মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প)

উল্লিখিত পংক্তিনিচয়ের মর্মার্থের আনুগত্যে আমরা পাই তীক্ষ্ণ ও জলদ ধ্বনির সন্নিকর্ষ, আলোর জন্য তীক্ষ্ণ কিংবা অন্ধকারের অনুকূলে জলদধ্বনির পৃথক পৃথক সন্নিবেশ নয়। ধ্বনি বিতরণ তাই উভমুখ—

[জলদ তীক্ষ্ণ] [অন্ধকার আলো]

আলো-অন্ধকারের এই মায়াবী জগতে সংবেদী ধ্বনির যে সন্নিকর্ষ, সেখানে

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।

অনুবাদে কাব্যনাটক ও কাব্যনাট্যকার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তরুণ মুখোপাধ্যায়

১.

ইয়েট্সের কাব্যনাটক

আইরিশ কবি ইয়েট্স্ তাঁর The Shadowy waters নাট্যকবিতাটি ১৮৮০ তে লিখলেও বারংবার পরিমার্জনা করেন। অ্যাবে থিয়েটারে ১৯০৪ ও ১৯০৬-এ মঞ্চস্থ করেন। রিচার্ড অ্যালেন বেঙ একে 'symbolist tradition' এর ফসল হিসেবে দেখেছেন। Forgael ও Dectora চরিত্র দুটি তাঁর মতে 'closer kinship with Tristan and Isolade'. ফ্র্যাঙ্ক ফে-কে ইয়েট্স এই নাটকটি প্রসঙ্গে বলেন, 'more ritual than a human story'. এখানে আসে 'emotional intensity' মনে করেন কেভ (cave)। তাঁর মতে,

The shadowy waters is an excellent yardstic against which to measure the extent of yeats's subsequent innovations in dramatic technique,.......it is prised between an old style of theatre and a new. (W.B. yeats : Selected plays : notes)

কবি ইয়েটসের রচনার প্রতি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর অনুরাগ দেখা যায়। সেজন্য তাঁর দুটি কাব্যনাটক অনুবাদ করেছেন। অবশ্য The shadowy waters এর তিনি আংশিক অনুবাদ করেছেন, নাম দিয়েছেন 'ছায়াচ্ছন্ন জলরাশি।' নাট্যচরিত্রগুলির নাম বঙ্গীয় করেছেন, যাতে বাঙালি পাঠক/দর্শক আইরিশ নাট্যকবিতার স্বাদ সহজে নিতে পারেন। ধ্বনি সাদৃশ্য বজায় রেখে তাই লিখেছেন—

Forgael = পরাগ
Aibric = অভীক
Dectora = দয়িতা

এছাড়াও এই নাট্যকবিতায় আছে Sailors. যেহেতু শেষাংশ অনূদিত হয়েছে তাই তিনি প্রধান তিনটি চরিত্রকেই বেছে নিয়েছেন। অনুবাদক হিসেবে তিনি চেষ্টা করেছেন আক্ষরিক বা মূলানুগ হতে। তবে কোথাও কোথাও স্বাধীনতাও নিয়েছেন। Aibric এর সংলাপ ও তার অনুবাদ দেখা যেতে পারে।

Let the birds scatter, for the tree is broken
And there's no help in words.

এবার 'ছায়াচ্ছন্ন জলরাশি' পড়া যাক। অলোকরঞ্জনের অনুবাদে অভীক বলে—

ছড়াক ছড়াক পাখি, কারণ গাছটা গেছে ভেঙে
শব্দে তার নেই কোনো সহায়তা।

একে আক্ষরিক বা মূলানুগ অনুবাদ বলা যায়

আবার একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

Forgael (to Dectora)–Go with him,
For he will shelter you and bring your home.
Aibric (taking forgael's hand)–I'll do it for his sake.

এর পাশে বঙ্গানুবাদ পড়া যেতে পারে—

পরাগ (দয়িতাকে)—ওর সঙ্গে যাও,
তোমাকে আশ্রয় দেবে, নিয়ে যাবে বাড়িতে তোমাকে।
অভীক (পরাগের হাত ধরে)—এটা আমি ওর হয়ে করব।

নাট্যকবিতার শেষাংশে দায়িতার চুল নিয়ে খেলতে খেলতে পরাগ বলে—

...মন্ত্র কেঁদে ওঠে বীন, ধূসর পাখিরে কাছে ডাকে,
আমাদের মধ্যে লীন পিতৃপুরুষের স্বপ্ন জাগে।।

ইয়েট্সের লেখায় পড়ি—

And that old harp awakens of itself
To ery aloud to the grey birds and dreams
That have had dreams for father, live in us.

বলা বাহুল্য, মূলের সঙ্গে অনুবাদ সৌষম্য বজায় রাখেনি। ইয়েট্স দু'বার dreams ব্যবহার করে যে ব্যঞ্জনা আনতে চেয়েছেন, তা' অনুবাদে আসে নি। যে-স্বপ্ন সত্তায় নিহিত ও পরম্পরা-বাহিত, তাকেই কবি বলেন— 'live in us' অথচ অনুবাদক 'স্বপ্ন জাগে' এই মর্মানুবাদ করায় অভিঘাত তীব্র হয়ে ওঠে না।

অনুবাদ ও অনুবাদক কখনো মূলের অবিকৃত রূপ-রস-গন্ধ এনে দিতে পারে না। কিন্তু যাঁরা মূল লেখাটি পড়েননি, তাঁদের কাছে অনুবাদ দৌত কার্য্য করে, এটা মানতেই হয়। একে দুধের বিকল্প ঘোল বলা হবে কি না, সেটা পাঠকের ব্যাপার। বিশ্বসাহিত্য আমাদের সকলের পক্ষে অরিজিন্যাল পড়া কোনোদিনই সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে তা পড়ার vehicle রূপে অনুবাদকে গ্রহণ করতেই হয়। অনুবাদ তাই আমাদের মাধ্যম—যা আমাদের বিশ্বসাহিত্য পাঠে উদ্বুদ্ধ করে; সাহায্য করে। কাজেই অনুবাদ নিয়ে বিতর্ক কিংবা নিন্দা থাকলেও, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, এই প্রবচন মেনে নিয়ে আমরা অনুবাদকে সৃষ্টির পাশে সসম্ভ্রমে রাখব। অলিভিয়া শেক্সপিয়রকে একটি চিঠিতে W.B. yeats লিখেছিলেন,

My two plays (the prose version of KGCT and The

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

Resurrection)....both deal with that moment—the slain God, the risen God.

তাঁর The King of the Great Clock Tower নাটকটির গদ্যরূপ পড়ে এজরা পাউণ্ড খুশি হননি। বলেছিলেন, 'putrid'। ইয়েট্স নতুন করে নাটকটি লেখেন ও তাকে কাব্যনাটকে রূপ দেন। বিশেষত মার্শ্ট রুডক (Ruddok) এখানে অভিনয় করবেন, এটাই ছিল কবির লক্ষ্য। তিনি ছিলেন নৃত্যশিল্পী, তাই এই নাটকে নাচ অগ্রাধিকার পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের সঙ্গে যার তুলনা চলে। রিচার্ড অ্যালেন কেভ (Cave) এই নাটকে দেখেছেন 'relationship between lyric and drama? এছাড়া জাপানি নোহ্ (NOH) নাটকের রীতিও ব্যবহৃত হয়েছে। ইয়েট্স্ একে বলেছেন 'complete asthetisism? কেন এই নোহরীতি গ্রহণ? কেভ বলেন, 'Noh-inspired plays for dancers but with a freedom and audacity' এবং

Masks, Ghosts, dances, songs, rituals, mimes appear now in startling juxtapositions ordisrupt seemes progressing in a style suggestive of conventional stage realism. (Introduction/W.B. Yeats : Selected Plays)

আর এই নাটকে আছে 'the most intimation of relations between the sexes,' মুখোশ ব্যবহারের কারণ 'to create a sense of the magical and miraculous'; কাটামুণ্ড সেখানে গান গায়। নাটকে পাঁচটি চরিত্র—রাজা, রাণী, দুই সহচর ও ভবঘুরে। এই ভবঘুরে রাণীকে ভালোবাসে। তার চুম্বন চায়। রাজা এটা বরদাস্ত করতে পারে না। তার গর্দান নেবার হুকুম দেন। সেই কাটামুণ্ড নিয়ে নাচ শুরু হয় (যেমন, অস্কার ওয়াইল্ড 'সালোসে' নাটকে দেখিয়েছেন); সেই মুণ্ডর মুখে রানী ঠোঁট স্পর্শ করেন। কাটামুণ্ড গান গেয়ে ওঠে।

পঞ্চাশের দশকের কবি মনস্বী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ইয়েটসের দুটি কাব্যনাটক অনুবাদ করেছিলেন। একটি 'দি শ্যাজোয়ি ওয়াটার' অন্যটি 'দি বিং অফ দি গ্রেট ক্লক টাওয়ার'। শেষোক্ত কাব্যনাটক অনুবাদে নামকরণ হয়েছে 'রাজমহলের ঘণ্টামিনার'। নাটকটি ইয়েটস্ উৎসর্গ করেছেন নিনেৎদে ভেলোয়াকে, তবে তাঁর মুখ মুখোশে আবৃত রাখার জন্য মার্জনা চেয়েছেন। কে এই Ninette de Valois? ১৮৯৮-এর জন্ম। আইরিশ নর্তকী ইনি। লণ্ডনেও এঁর নাচের স্কুল আছে। গ্রে-র পরিচালনায় থিয়েটারে এসে ইয়েট্সের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁকে কবি ডাবলিনে যেতে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর নাটকে নৃত্য পরিচালনায় সাহায্য চান। এই সূত্রে নাটকটি কবি তাঁকেই উৎসর্গ করেন।

অলোকরঞ্জন স্বয়ং কবি। তাই কাব্যনাটকের অনুবাদে তাঁর কবিত্ব স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। প্রথম পার্শ্বচর শুরুতেই বলে,

There every lover is a happy rogue;

And should he speak, it is the speech of birds
No tought has he, and therefore has no words.

অলোকরঞ্জনের অনুবাদে পড়ি:

যেখানে প্রতিটি প্রেমিক আসলে সুখী বুজরুক;
যদি কথা বলে সে-ভাষা পাখির সুরেলা বুকনি;
ভাবনাচিন্তা নেই তার, তাই কোনো কথা নেই,

'rogue'—শঠ, প্রতারক; তাই বুজরুক যথাযথ প্রয়োগ। 'speech of birds' ভাষান্তরে 'পাখির সুরেলা বুকনি' একেবারে বঙ্গীয় রূপান্তর এবং ধ্বনিময়।

এই নাটকে রাণীর মুখে ভাষা দিতে চাননি ইয়েটস্। নাচই তাঁর ভাষা। রাজা যখন রাণীকে বলেন, 'তোমার এ নিস্তব্ধতা দুর্বিষহ হয়েছে এখন', শুনেও রাণী নিশ্চল প্রতিমা, তখনই দরজায় কেউ আঘাত করে। এক আগন্তুক আসে, বলে 'আমি ভবঘুরে, মূর্খ।' কী চায় সে ভবঘুরে বলে রাজাকে,

আপনি যাকে ঘরে তুলেছেন তিনি রমণীসমাজে
সুন্দরী পরমা! আমি শুধু এক কবি—
তখন থেকেই তাঁকে গানে বেঁধে নিয়েছি আমার

যদিও তার ঘরণী আছে, কিন্তু সে মনের মানুষ নয়, তাই রাণীকে সে ডাক দেয়। দেখতে চায়, তার বেয়াদবি রাস্তা মানতে পারেন না। দেখার পর সে বলে রাণী 'আমার জন্য নাচবেন, তার ইচ্ছে। আর সে গাইবে দৈবাদেশ আছে 'সপ্রভাতী চুম্বিবে তোকে'। রাজাকে সে বুঝিয়ে বলে, 'অর্থাৎ আপনার রাজ্ঞী অধরোষ্ঠ দেবেন আমাকে'। আর সহ্য হয় না রাজার। তিনি মুণ্ডুচ্ছেদ করার আদেশ দেন। ভাষান্তরে স্বাভাবিকভাবেই অলোকরঞ্জন ঈষৎ স্বাধীনতা নিয়েছেন। এতে ভাবনা স্পষ্ট হয়েছে। যেমন, unendurable' অনুবাদে 'তোমার এ নিস্তব্ধতা দুর্বিষহ হয়েছে এখন'।

দ্বিতীয় পার্শ্বচর রাণীর ভূমিকায় গান গায়—

আমার শরীরটা সে
ছন্ন করতে আসে
এবং থিরথিরায় আমার
গা-হাত-পা থমকায়

মূল রচনা দেখা যাক—

He longs to kill
My body, untill
That sudden shudder
And limbs lie still.

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

একেবারে বাঙালিয়ানায় 'shudder' হয়েছে 'থিরথিরায়', চমৎকার কাঁপুনির শব্দবন্ধ। রাণী নাচতে শুরু করলে রাজা বলেন,

Dance woman, dance!
Neither so red, nor white, nor full in breast,
That's what he said ! Dance, give him scorn for scron.
Display your beauty, spread your peacock tail.

অলোকরঞ্জনের অনুবাদ—

হাততালি দাও সুধীজন আর নাচো রঙ্গিলা,
রাঙা নও, নও শুভ্র, তোমার বক্ষের লীলা
উন্নত নয় বলেছে লোকটা। নাচতে নাচতে সেকথা তুচ্ছ
বরবাদ করো, ছড়াও তোমার ময়ূরপুচ্ছ।

ইয়েট্সের লেখার মধ্যে যে গতি, যে রঙ-রস আছে, এখানে তা ঠিক আসেনি। রাণীকে 'রঙ্গিলা' সম্বোধন বেমানান। 'ঘৃণা করো' ভাষান্তরে তুচ্ছ, 'বরবাদ করো' কিছুটা ফিকে। 'ছড়াও তোমার ময়ূরপুচ্ছ' একেবারে বিবৃতিধর্মী। ইয়েটস্ বলেছেন, তোমার সৌন্দর্য বিস্তার করো ময়ূরপেখমের মতো; এর মধ্যে গভীরতা আছে। নাটকের শেষে দ্বিতীয় পার্শ্বচর বলে,

সেই কবে থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি দেয়ালের একভাঁজে,
শুধু ভয় হয় কখন সরব না যে।

মূল লেখায় পড়ি, 'I have stood solong by a gap in the wall
may be I shall hot die at all.

আক্ষরিক অনুবাদ, কিন্তু সাবলীল এবং ছন্দিত।

১.

এঙ্গেলসের কাব্যনাটক :

১৮৯৫ সালের ৫ আগস্ট ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্ (জন্ম ১৮২০) প্রয়াত হলে এন. এ. নেক্রাসভ কবিতায় শোকাঞ্জলি দিতে গিয়ে লিখেছিলেন,

অস্ত গিয়াছে প্রজ্ঞাদীপ্ত যুক্তির প্রভাকর
মহান হৃদয় স্পন্দনহারা স্তম্ভিত চরাচর।

কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস্ নাম দুটি অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা। সমাজতন্ত্রী তথা সাম্যবাদী চিন্তাচেতনা প্রসারে ও প্রচারে তাঁদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এঙ্গেলস প্রুশিয়ার বাইনে প্রদেশে বারমেনেয় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবা ম্যানুফ্যাকচারার। পরিবারের অবস্থা ভালো নয়। তাই তাঁকে পড়া শেষ না করেই এক সওদাগরি অফিসে কেরানীর চাকরি নিতে হয়েছিল। ছাত্রাবস্থায় এঙ্গেলস দেখেছিলেন স্বৈরতন্ত্রী শাসন ও আমলাতন্ত্র। যা তাঁর পছন্দ

ছিল না। তাই সমাজ-রাজনীতি-দর্শন পাঠের মাধ্যমে নিজের বোধ উজ্জ্বল করেছিলেন। কীভাবে শোষণ পীড়নমুক্ত সমাজ তৈরি করা যায় ভেবেছিলেন। সেই সময় জার্মানে হেগেলের প্রভাব গভীর ছিল। পৃথিবীতে সবই পরিবর্তনশীল তিনি বলতেন। কাজেই স্বৈরাচারও বদল হতে বাধ্য। বুর্জোয়া শ্রেণীর দম্ভ ও দাপট চিরকালীন হতে পারে না। এই ভাবনা মার্ক্স ও এঙ্গেলসকে উজ্জীবিত করেছিল। তবে হেগেলের ভাববাদী দর্শন বর্জন করে তাঁরা বাস্তববাদী দর্শন গ্রহণ করলেন। তাঁরা দেখলেন উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের কর্ম ও চিন্তাশক্তি জড়িত। সম্পর্কও এর ফলে নানা মাত্রা পায়। কাজেই সম্পদ কুক্ষিগত হলে সমাজের বৃহত্তর মঙ্গল হবে না। শ্রেণীস্বার্থ বিষয়ে মানুষকে সজাগ করা দরকার।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এঙ্গেলস ইংল্যান্ডের যারা সর্বহারা ও শ্রমিক-মজুর তাদের জীবনযাত্রা দেখেছিলেন। তাদের অভাব, দারিদ্র, বঞ্চনা তাঁকে পীড়িত করে। সেজন্য 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' এই নামে বইও লেখেন। ক্রমশ সমাজতন্ত্রর ভূমিকা তাঁর মনে প্রবল হয়। ১৮৪৪ এ মার্ক্সর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দুজনেই এই সামাজিক সমস্যা নিয়ে ভাবেন। আলোচনা করেন। এরপর দুই বন্ধু মিলিত ভাবে লেখেন 'হোলি ফ্যামিলি' গ্রন্থ। বস্তুবাদী সমাজতন্ত্র কি তা নিয়ে এখানে মার্ক্স বিস্তারিতভাবে লেখেন। এরপরই রচিত হয় বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার' (১৮৪৮)—দুই বন্ধুর স্মরণীয় কীর্তি। কার্ল মার্ক্সের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসই 'দি ক্যাপিটাল' গ্রস্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন প্রভূত পরিশ্রমে। এই বন্ধুত্ব সত্যিই দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়।

বৃহত্তর জনসমাজে এঙ্গেসল একজন সমাজবিজ্ঞানী দার্শনিক ও সাম্যবাদী আন্দোলনের অগ্রপথিক রূপে পরিচিত। দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদতত্ত্বের প্রবক্তাও। কার্ল মার্ক্সের মতো তিনিও সাহিত্যচর্চা করতেন, নাটক ও কবিতা লিখতেন, এ তথ্য অনেকেরই অজানা। তাত্ত্বিক ব্যক্তিসত্তার আড়ালে সৃজনশীল লেখকসত্তা ঢাকা পড়ে গেছে। ফ্রীডরিশ ওস্‌ভাল্ড এই ছদ্মনামে এঙ্গেলস কবিতা লিখতেন। ১৮৪১ এ লেখেন একটি কাব্যনাটক 'কোলা দি রিয়েনৎসি'। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। পঞ্চাশের দশকের অন্যতম মেধাবী কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'স্তিমিত সিংহাসন' নামে অনুবাদ করেন। সংকট নাট্যগোষ্ঠী ১৯৮৩ সালের ২৬ নভেম্বর ম্যাক্সমুলার ভবনে এটি মঞ্চস্থ করেছিল। (১৯৭৮ এ 'অনুক্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল)।

এই নাটকে ক্ষমতাদর্পী রিয়েনৎসির পতন ও জনতার ভয় ঘোষিত হয়েছে। যে মানুষ জনতার সহযোগিতায় শীর্ষস্থানে ওঠে, সে যখন জনতাকে অবজ্ঞা করে, তখন তার এমনই পরিণতি হয়। অনুবাদক অলোকরঞ্জন ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'অপেরার জন্য নির্ণীত হলেও প্রথমার্ধ গীতিনাট্যের কাঠামোয় না সাজিয়ে বিষয়বস্তুটি বৈপ্লবিকভাবে বিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন এঙ্গেলস। এবং এই রূপকল্পটির নাম কাব্যনাট্য।'

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

প্রসঙ্গত বলা যায়, তরুণ বয়সে কার্ল মার্ক্স-ও 'অউলানেম' নামে একটি কাব্যনাটক লিখেছিলেন। সেখানে অবশ্য প্রেম ও দার্শনিকতা ছিল।

অনুবাদক বলেন, এঙ্গেলস তাঁর কাব্যনাটকটিতে কবিতার স্বরাজ এনে দিতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কবিতার 'অন্ত্যমিল/অন্তর্মিল/পর্বন্যাস প্রভৃতি সরঞ্জাম' ব্যবহার করেছেন। কাব্য নাটক হওয়ার জন্য এগুলি জরুরী উপাদান, এখন বলা যায় না। এজন্য দু'চার কথায় আমরা কাব্যনাটকের রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কে জেনে নিতে পারি।

কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য শব্দবন্ধ নিয়ে অনেকেই ধন্দে পড়েন। দুটি স্বতন্ত্র সংরূপ মনে রাখা দরকার। নাট্যকাব্য মুখ্যত কবিতা যা নাট্যসংলাপে বিধৃত। সেখানে 'story is told by some actor it, not by the poet himself'. যেমন, শেলির প্রমেথিয়ুস আনবাউণ্ড, ব্রাউনিঙের 'মাই লাস্ট ডাচেস', টেনিসনের 'ইউলিসিস' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল মজুমদারের একাধিক নাট্যকবিতা এর উদাহণ---কর্ণকুন্তী-সংবাদ, বিদায়-অভিশাপ; মৃত্যু ও নচিকেতা ইত্যাদি। কাব্যনাটকে এলিয়া তিনটি স্বর পেয়েছেন। অভিনেতা, দর্শক ও কবি মিলে রচিত হয় স্বরসমন্বয়। কবি সব চরিত্রের মধ্যে তাঁর ভাবনা ও বক্তব্য ছড়িয়ে দেন এবং নিজেই তা অনুভব করেন। সেই অনুভূতি 'থার্ড ভয়েস'—নৈর্ব্যক্তিক স্বর। ডেনিস ডনুগ তাঁর The Third Voice গ্রন্থে কাব্যনাটকের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—

> A play is poetic; when its concrete elements (plot, agency, scnene, speech, gesture) continuously exihibit in their internal relationship those qualities of mutual coherehce and illumination required of the words of poem.

কাব্যনাটকে আমরা কবিতার মুক্তি নাকি নাটকের মুক্তি খুঁজি? এলিয়ট সুন্দরভাবে বলেছেন, ভালো কাব্যনাটক পাঠে ও দর্শনে

> our own sordid, dreary, daily world would be suddenly illuminated and transfigured. (poetry and Drama)

এছাড়াও তাঁর শর্ত 'The poetic drama must have an emotional unity'; কাব্যনাটককে শেষ পর্যন্ত নাটক হতে হবে, মঞ্চস্থ হওয়ার গুণ অর্জন করতে হবে—নাট্যকাব্যের সেই দায় নেই।

'স্তিমিত সিংহাসন' কাব্য নাটকে (মূল ভাষায় পড়িনি) অনুবাদক যেভাবে সাজিয়েছেন তাতে অন্ত্যমিল ও অন্তর্মিল সত্যিই প্রাধান্য পেয়েছে। সংলাপে ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণ অনেক সময় স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ করে। যদিও রবীন্দ্রনাথ 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'-য় সাফল্য পেয়েছিলেন। এখানে নাট্যচরিত্ররা মিত্রাক্ষর সংলাপ বলে, পড়তে বা শুনতে খারাপ লাগে না। অভিনয়

দেখিনি; নিশ্চয় মঞ্চেও তা অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হয়নি। কেমন সেই সংলাপের ধরন, একটু নমুনা দিই। প্রথম অঙ্ক-বাতিস্তা—

মজা গড়াবে না আজ বেশি দূর।
ভাঙন ঘনালে হবেন চতুর।

কিংবা গণকোরাস বলে, জয় ট্রিবিউন জয়
জাতির জনক হোক পরমায়ুময়।

আর শেষ বা তৃতীয় অঙ্কে উৎকণ্ঠা যখন চরমে, বিনাশ আসন্ন তখন কোরাস—

মুক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে স্বৈরী
প্রতিশোধ নিতে আমরা তৈরী!

আবার কামিলা বলে,

জনতার ক্রোধ জ্বলন্ত অঙ্গার
তারই দাহে হবে জীবন সাঙ্গ তার।

এই ভাষার মধ্যে যেহেতু গতি ও প্রাণাবেগ আছে, তাই নিছক কাব্যিক ও পদবাহন সংলাপ মনে হয় না।

জনতার নির্বাচিত শাসক ও রাজা ক্ষমতালোভী ও অত্যাচারী হলে তার পতন ঘটে; ইতিহাস তাই বলে। এই নাটকে সেই ঐতিহাসিক সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এর সঙ্গে নারীর স্বাধিকারও গুরুত্বলাভ করেছে। কামিলার অচরিতার্থ প্রেম প্রতিহিংসার আকার নিয়েছে। স্বামী প্রেমে আবার নিনা উন্মত্ত জনতার হাতে নিজের প্রাণ দিতে চেয়েছে। এঙ্গেলস তাঁর নাটকের বিষয় পেয়েছেন এডোয়ার্ড লিটনের, **'Rienzi'** উপন্যাস থেকে। নাটকটি ট্র্যাজিক পরিণতি পেতেই পারতো। এঙ্গেলস সেই প্রলোভন জয় করেছেন। গণ অভ্যুত্থানকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। আর দেখিয়েছেন স্বৈরাচারীর নির্মম নীরস্ত্র পতনের ছবি। তিনটি অঙ্ক জুড়ে এই নাটক ক্ষোভ-দ্রোহ-বিদ্রোহে আন্দোলিত।

রূপান্তরিত নাটকে অনেক সময় বাঙালি কবি বা নাট্যকারেরা ভারতীয় বা বঙ্গীয় আদল আনতে চান। অলোকরঞ্জন সেই কাজ করেননি। রিয়েনৎসির অহং ও আত্মসন্তোষ সুন্দরভাবে এই সংলাপে দেখা যায়।

আসে তো আসুক ঝড়—আমি ঠিকই আছি,
বসিয়েছি নিজেকেই রাজসিংহাসনে,
এবং আসীন আজও, যদি কেউ বাদ সাধে
আমি তার উষ্মা খুব প্রশমিত করে দিতে জানি।

স্ত্রী নিনাকে একথা বলার মধ্যে তাঁর দম্ভ প্রকাশিত। যার তুলনা পাই দুর্যোধন কিংবা

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

ঔরংজীব চরিত্রে। জানি না, এই 'স্তিমিত সিংহাসন' বহু পরে নাট্যকার ও কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটক লিখতে প্রেরণা দিয়েছিল কিনা।

২.

কাব্যনাট্যকার অলোকরঞ্জন

'বাংলা ভাষায় কাব্যনাট্যরচনার মূলে যদি কোনো—একজনের প্রবর্তনা উদ্যত হয়ে থাকে, তাঁর নাম টি. এস. এলিয়ট' (দ্বিতীয় ভুবন), বলেছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। যদিও শেষপর্যন্ত সম্ভবত কাব্যনাট্যরচনায় তিনি ইয়েট্‌সকেই মান্য করেছেন। কারণ ইয়েট্‌স্ তাঁর কাব্যনাটকে 'মনকেই অকপটচিত্তে করে তুললেন একযোগে কবিতা ও নাটকের সামগ্রী'। তাই তিনিই হয়ে ওঠেন 'কাব্যনাট্যের পুরোধা'। পঞ্চাশের অন্যতম মেধাবী কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। বিশ্বসাহিত্যপাঠে ও বিশ্বপরিক্রমায় যিনি অমিয় চক্রবর্তীর উত্তরসূরী। আর আছে আস্তিক্যবাদী ভূমিকা, যা তাঁর 'যৌবনবাউল' কাব্যে বিকশিত হয়েছে। যেখানে জীবন ও কবিতা দুইই তিনি আঁকড়ে ধরেছেন।

পরিণত বয়সে একাধিক কাব্যনাট্য/নাট্যকাব্য এবং সংলাপিকা লিখলেও প্রথম যৌবনে লিরিক কবিতাই ছিল তাঁর প্রকাশমাধ্যম। এলিয়ট বলেন, কবিরাই কাব্যনাটক লিখবেন। তাই অলোকরঞ্জন কাব্যনাটক লিখলে সেটা সংগত, স্বাভাবিক বলা যায়। তাঁর কাব্যনাটকগুলি পত্রপত্রিকায় বা তাঁর কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্যনাট্যসংকলন কেন করেননি জানি না। অধিকাংশ নাট্যকবিতা নিয়ে অবশ্য 'ছায়াপথে সান্দ্র সংলাপিকা' একমাত্র বই।

কবির সব লেখাই কাব্যনাটক হয়েছে কিনা, সেটা তর্কযোগ্য। কেননা, কাব্যনাটক কবিতা ও নাটকের হরগৌরীরূপ, মুখ্যত নাটক, অন্তঃসার কবিতা—যা একই সঙ্গে পাঠ্য, শ্রাব্য ও দৃশ্যমান। কাব্যনাটকের অন্যতম শর্ত তাকে মঞ্চস্থ হতে হবে। ছন্দোবদ্ধ বা গদ্যসংলাপ দুইই গ্রাহ্য কাব্যনাটকে। তবে তার ভিতরে কবিত্ব ও কাব্যরস স্ফুরিত হতে হবে। কাব্যনাটক কাব্যিকতা চায় না। তাই কাব্যনাট্যের সংলাপ **'speaking peotry'**, নিছক **poetic** নয়। বাস্তবতা ও ধ্যানলোক একই বৃন্তে ধারণ করে কাব্যনাটক। অনুভূতিকে মূর্ত ও দৃশ্যময় করে তোলা কাব্যনাটকের কাজ। এভাবে দেখলে অলোকরঞ্জনের 'শেষ প্রহর' কাব্যনাটক কিনা সংশয় জাগে, মিশ্রবৃত্ত ও কলাবৃত্ত উভয় ছন্দের ব্যবহার তিনি করেছেন। মুখ্য চরিত্র স্বপন ও সুপর্ণা। যা হতে পারতো প্রেমের কাব্যনাটক। তার বদলে স্বপন মৃত্যুপিপাসিত। সে চায় 'মহামরণের অন্ধকারের জীবনের ঝিনুক' কুড়াতে। সেখানে সুপর্ণা 'মৃত্যু আর অমৃত মণিলতা' হোক, সে চায়। সুপর্ণার কাছে 'মৃত্যু এক অনন্য প্রেমিক'। ভাবে 'পরপারে গভীর দরদী' কোনো এক খেয়া মাঝি আছে। তার সঙ্গে স্বপনকে মেলাতে চেয়ে ব্যর্থ হয়। তাই সে হয়ে ওঠে 'অবসন্ন আলো'। তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত এই কাব্যনাটক—সায়াহ্ন, সন্ধ্যা, রাত্রি। কবি-প্রাবন্ধিক উত্তম দাশ একে মনে করেন 'মূলত তাত্ত্বিক এ রচনা', (বাংলা পত্রনাট্য)।

'প্রত্যাবর্তন' কাব্যনাটকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অধ্যাপক ও তাঁর বন্ধু দীঘা-ভ্রমণে গেছেন। চিন্ময়ীকে চান অধ্যাপক; বিয়ের কথাও পাকা অথচ চিন্ময়ী পছন্দ করে স্যারের বন্ধু সুহাসকে। তা জেনে সুহাসও বলে,—

তুমি যে সূর্য, আমার
তোমারই আলোয় আমি ঘরে বসি, বাইরে আর
কাজ করি, কাজ করে ফিরে আসি আবার।

কিন্তু এই আবেগের বানে ভেসে যায় না চিন্ময়ী। সে শান্ত ও নিরুত্তাপ। তার একটা কারণ, অধ্যাপককে সে বিয়ে করবে। কিন্তু সুহাসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাও কম নয়। নইলে রাতজাগা সুহাসকে সে প্রশ্ন করত না তাকে দেখবে বলেই সুহাস বিনিদ্র কিনা। তবু সুহাসের হৃদয়ের কাতরতা তার কাছে কবিত্ব মাত্র। নিজের সূর্যের কাছে এই অবহেলা, অনাদর শেষ পর্যন্ত সুহাসকে যন্ত্রণা-বিদ্ধ করেছে। নিজের মধ্যে ডুব দিয়েছে সে। তাই ফেরার সময় চিন্ময়ীর অনুরোধেও? আর ট্রেনে সুহাসের নিংসঙ্গতার, যন্ত্রণা, অনুভবই এই কাব্যনাট্যে প্রধান। চিন্ময়ীর আচরণ তেমন ব্যাখ্যা করা হয়নি। ত্রিভুজ প্রেমে দ্বন্দ্ব রেখেছেন। ফলে, কাব্যনাট্যের অন্তর্মুখী ভাব এখানে অনেক আছে। সমিল ছন্দোময় কাব্যনাট্য। আর 'বাক্‌ছন্দ এখানে সহায়, ফলে চরিত্রগুলোকে চেনা মানুষ বলে মনে হয়। জীবন্ত তাদের উপস্থিতি'।

ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগেও কাব্যনাট্য লঘু হয় না, এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দিতেই যেন অলোকরঞ্জন 'নামভূমিকায়' লিখেছেন। প্রেমের সমস্যা এখানেও আছে। এক আশ্চর্য নাটকীয়তা এর সর্বাঙ্গে। অথচ কাব্যত্ব কম নয়। পরাগ ও রুণা পরস্পরকে চায়। কিন্তু তাদের মাঝখানে আসে অদিতি (পূর্বে যার বিয়ে হয়েছিল), আর আছে অল্টার-ইগো। যার সম্পর্কে পরাগ বলেছে, 'আমারই অল্টার-ইগো অর্থাৎ আরেক-সত্তা হয়ে/ছোক্‌রা কিনা আমাকেই তাড়া করে।' এই দ্বিতীয় সত্তা-কে অধিভৌতিক মনে হয়। শেক্সপীয়রের এরিয়েল (টেম্পেস্ট নাটকের) অলোকরঞ্জন-কে অনুপ্রাণিত করেছিল কি না জানা নেই। তবে ব্যক্তির সঙ্গে বিবেক বা অন্যসত্তার দ্বন্দ্ব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'সু ও কু' রূপ আছে। আর পাই ইয়েট্সের কবিতায়—'এ ডায়ালগ অফ্ সেলফ অ্যাণ্ড সোল'-এ।

নাটকের শুরুতে মঞ্চসজ্জায় পাই, একটি অস্বাভাবিক শূন্য ঘর। চেয়ার, টেবিল বই—কিছুই নেই। দেয়ালের অনেক উঁচুতে একটা জানালা খোলা। দরজাটা বন্ধ। সেখানে একজন দর্পিত যুবক দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে অদৃশ্য ব্যক্তিকে কথা বলছে। যুবকটির নাম পরাগ চৌধুরী। শুরুতেই এই-বর্ণনা ও পরাগের সংলাপ এক অদ্ভুত ইন্টারভিউ নিয়ে। যে দেবদারু সংঘে স্থান পেতে চায়। এই বিচিত্র কথাবার্তার মধ্যে আসে অল্টারইগো। পরাগ বলে 'ও আমার অল্টার ইগো, আমরা একজন, কিন্তু ইদানীং ভাবি মুশকিল হয়েছে, বড়ো বেশি আলাদা আলাদা থাকছে, মনে হয় আমরা দু'জন', জনৈক ছদ্ম সামরিক ব্যক্তির

তর্জনগর্জনকে কৌতুকে ভাসিয়ে দিয়েছে এই অল্টার-ইগো। আবার দ্বিতীয় দৃশ্যে রুণা-কে ভয় দেখিয়েছে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'র প্রসঙ্গ টেনে। পরাগ হয়েছে মহিম আর সে সুরেশ। একই মানুষ দুই সত্তা হয়ে কিভাবে নিজেকে বিচার বিশ্লেষণ ও উপভোগ করতে পারে, মনে হয় সেটা দেখানোই অলোকরঞ্জনের উদ্দেশ্য। যদিও পরাগ নাটকের শেষে বলেছে, অদিতি যতদিন অতীত কথা বলেনি, তার গোপন পরাজয় খুলে দেখায়নি, ততদিন এই অল্টার-ইগোকে তার দরকার ছিল। কিন্তু এখন সে 'ফসিল অথবা অকৃতার্থ আদিম সিম্বল' যাকে পরাগ হত্যা করে মুখোশহীন বাঁচতে চায়। আসলে ইয়েট্সীয় মুখোশের (যা জাপানী নোহ নাটকের বিশেষত্ব) ধারণাকে অলোকরঞ্জন এখানে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ব্যক্তি ও মুখোশের দ্বন্দ্বে কথোপকথন তাদের গোপন ব্যথা-কে উৎসারিত করেছে। একদা প্রেমিকা অদিতি আজ ধ্রুব মিত্রের স্ত্রী। তাই তার প্রতি পরাগ উৎসাহহীন। রুণাই তার সর্বস্ব। সে বলে,

তবুও এখন তুমি শত চেষ্টা করলেও রুণাকে
একতিল সরাতে পারবে না।

অন্যদিকে অদিতি বলে, সে 'একমাত্র চ্যুত' নষ্টমেয়ে হতে চায় না। তার চেয়ে বরং

অন্যায় করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও,
আমাকে দীক্ষিত করো সহধর্মিনীর মর্যাদায়।
তোমায় সেবা করবো আমাকে সে অধিকার দাও।

বলাবাহুল্য, এক চরম নাট্যমুহূর্ত এখানে ধরা পড়েছে। পরাগ ও অদিতির অন্তরঙ্গ ভাষা আড়ালে শুনেছে রুণা। যাকে ফেরাতে চেয়ে পরাগ বলে—

ক্ষমা চাই, কী করলে তোমার ক্ষমার
উপযুক্ত হবো বলে দাও।

অদিতির কথা পূর্বে না বলার জন্য সে ক্ষমা চায়। কিন্তু রুণা মনে করে সে বুঝি, পরস্পরের অন্তরায়, তাই সে চলে যাবে। সে যাবে অল্টার-ইগোর সঙ্গে। কিন্তু এই দ্বিতীয় সত্তা হাল্‌কা মনের, তাই দায়িত্ব নিতে ভয় পাই। পরাগও যখন তার সঙ্গে যেতে চায়, সে বলে—

আমি খুব ক্লান্ত। আমি একটি পালক
বহন করতে অপারগ।

রুণা অতঃপর পরাগকে চায়, বিকল্প চায় না। বলে 'আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ এনেছি, তুমি নাও।' ইতিমধ্যে ধ্রুব মিত্র কন্যা সুমনাকে নিয়ে এসেছে অদিতির কাছে। তবু অদিতি 'ঘরের বাইরে পরাগের 'বাঁচার অংশীদার' হতে চায়। আর পরাগ হতে চায় সকলের 'আনন্দের প্রহরী'।

'নামভূমিকায়' কবিত্বের চমৎকার স্বাদ পদে পদে মেলে। যেমন অদিতির দাবি ও অধিকারের প্রসঙ্গে পরাগ বলে—

কেন তুমি আমার শীতের সব জীর্ণপাতা নিয়ে
দাবাগ্নি জ্বালাবে, কেন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে
আমার যেটুকু তাপ বাকি আছে নমুনা হিসাবে
মৃত্যুকে দাখিল করতে নিয়ে যাবে?
আমার শীতের সব ক্ষুণ্ণ পাতা রুণাকে দিয়েছি,
অদিতি, তোমার জন্যে আমি কোনো কবিতা রাখি নি।

এখানে 'কবিতা' শব্দের বহুস্তরী বা বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। যা শুধু কাব্য নয়, জীবন, আবেগ, সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক। এই কাব্যনাট্যে নানাছন্দের মিশ্রণের কথা শুরুতেই বলা হয়েছিল। সমিল ও অমিল পদ্যছন্দ এই কাব্যনাট্যে আছে। তবে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে চারমাত্রার নির্দিষ্ঠতা কাব্যনাট্যের গভীরতা ক্ষুণ্ণ করে। রবীন্দ্রনাথের 'লক্ষ্ম ীর পরীক্ষা'র কথা আমরা জানি। সেখানে বিষয়ানুযায়ী ছড়ার ছন্দ মানানসই হয়েছিল, সন্দেহ নেই। আগাগোড়া কৌতুকের আমেজ নাটকে থাকায়, চারমাত্রার প্রয়োগ তাই রসহানি ঘটায় নি। অলোকরঞ্জনের 'নামভূমিকায়' ছড়ার ছন্দ অল্টার-ইগো সমসাময়িক ব্যক্তির সঙ্গে কৌতুক করে বলেছে :

সিকেয় তুলে রাখুন রসিকতা
জানেন, এটা গ্রাম না, কলিকাতা?
জানেন, খুব কাছেই পুলিশ-ফাঁড়ি
আপনাকে যে ধরিয়ে দিতে পারি।
ভাবছি মহাশয়ের মাথায় খুলি
ছিন্ন করে খেলবো ব্যাগাতুলি!

আলোকরঞ্জনের 'ঝাড়লণ্ঠনের নিচে' কাব্যনাটিকাকে কি খানিকটা আত্মজৈবনিক বলা যায়? যদিও কবি বা লেখকেরা প্রক্ষিপ্তভাবে তাঁদের সমস্ত লেখার মধ্যে বিকীরিত হন, আমরা জানি।

মাত্র দুটি চরিত্র এই কাব্যনাটিকায়—লেখক অরিন্দম ও সংঘমিত্রা; যে লেখকের ভাষায় ও ভাষ্যে—

একা দশমহাবিদ্যার বিদূষী
এডিটার, কম্পোজিটার, প্রচ্ছদচিত্রীনী, প্রকাশক,
এমনকি পরিবেশক।

নাটক শুরু হয় দ্রুতলয়ে, নেপথ্যে সেতারের সুরঝংকারে। মঞ্চের বাঁ-দিকে লেখার

টেবিল। চেয়ারে ঝুঁকে লেখক—দর্শকেরা যাঁর মুখের ডানদিক দেখতে পান। একটা সদ্যসমাপ্ত কবিতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে লেখক দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়ান। লেখাটি তিনি সংঘমিত্রার অনুরোধে ও চাপে লিখেছেন, জেদী ও কর্তৃত্বপরায়ণা সঙ্ঘমিত্রা। 'বড়ো দজ্জালিকা'। তাই 'যক্ষুনি যা বলে সেটা তৎক্ষণাৎ লিখে দিতে হবে'। না হলে সন্তান লেলিয়ে 'কাড়বে, রাত্রির ঘুম, ছিঁড়বে দিনের অবসর', লেখা হাতে তিনি প্রস্তুত। তখনই নেপথ্যে তাগিদ আসে—'অরিন্দম তার নিজের ভাবনা-জগতে থাকে। ভাবে, সব শব্দ কি কানে ঢোকে? অন্তত 'উনিশ হাজার' ধ্বনিমাত্রা না ঘটালে শুনতে পাব না কিছুতেই'। অবশেষে মঞ্চে সঙ্ঘমিত্রার প্রবেশ ঘটে। লেখককে অভিযোগ জানিয়ে বলে, 'তোমার মতো এমন আত্মকেন্দ্রিকতা দেখিনি আর কারোর মধ্যে'। এখান থেকেই শুরু হয় দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ব্যক্তিত্ব-সংঘাত। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। লেখক ভাবেন, বলেন,

লেখার মানেই হলো
জীবনটাকে নিজের দিকে এনে
ঘুরিয়ে দিয়ে নতুন আদল গড়া।

তিনি এও মনে করেন,

জীবন এসে খরগোসের মতো
আছড়ে পড়বে লেখকের দু'পায়ে—
তবেই ঘটবে লেখার মতো লেখা।

সঙ্ঘমিত্রা এমন ভাবনায় বিশ্বাসী নয়। সে বলে,

লেখককে হতে হবে রীতিমতো যোগী, যার হাতে
রূপার ভিক্ষার বাটি, দরজায়-দরজায় ঘুরে গিয়ে
জীবনের স্বাদ-বর্ণ ভিক্ষা করে যাওয়া যার কাজ।

জীবনকণা দিয়ে লেখক 'ফোটাবেন বিশ্বব্যাপী পদ্ম এক।' অরিন্দম একথা মানতে পারেন না। আরিস্টটল থেকে ব্রেশটের নন্দনতত্ত্বের দৃস্টান্ত দেন, যেখানে 'লেখার সঙ্গে ত্যাগের সম্বন্ধ কোনো নেই।' এখন পাণ্ডিত্যের রেফারেন্সে সঙ্ঘমিত্রা খুশি হয় না। বলে, 'তুমি ধ্যানধারণার/কুয়াশার মাঝখানে অন্তরীণ হয়ে বসে আছো।'

এই উতর-চাপান দাম্পত্য কলহ যদি হয়, তো আমরা ভাবতে পারি সৃজনশীল কবিরা কদাচিৎ সংসার-মনস্ক হন। তাঁদের মধ্যে বোহেমিয়ন ভাব থাকে। লেখার জগৎ ছাড়া আর সবই প্রবাস। সঙ্ঘমিত্রা প্রাত্যহিকে গড়া বিশ্বের নারী; নিছক সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কবি অলোকরঞ্জনও কি তাঁর প্রথম প্রণয়ে এমনি দুস্তর বাধা অনুভব করেছিলেন? যেজন্য অরিন্দম বলেন, 'লেখক নিজেই-নিজে স্বয়ম্পূর্ণ।' আরো বলেন, লেখার জন্যই তাঁর সংসার-যাপন। অন্য কিছু তাঁর কাছে দাবি করা ঠিক নয়।

তুমি, অথবা আমার কাছাকাছি,
যারা আনছে তাদের একমাত্র কাজ আমার লেখার
যজ্ঞে শুধু অরণির মতন নিঃশব্দে জ্বলে ওঠা;

বিবাহের মন্ত্রপূত অগ্নিও এই আগুনের কাছে তুচ্ছ ভাবেন লেখক।—'তার চেয়ে আরো দাবিময় এ আগুন'। যে-আগুনে প্রেমিকা, মা, ভাইবোন, বন্ধু 'বিভাব মাত্র', তার চেয়ে বেশি কিছু কিছু নয়।' সঙ্ঘমিত্রা উত্তেজিত হলে, লেখক তাকে শান্ত হতে বলেন। দু'কাপ কফি একসঙ্গে খাবেন বলেন। তারপর জানান—

এত অভিমান ভালো? কী করি, আমার সময়ের,
সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে তোমাকেই, আমি যদি
তোমার নিয়মে চলি তাহলে কখন লিখি-টিখি?

এই সমস্যা ও ক্ষোভ কি ব্যক্তি আলোকরঞ্জনেরও নয়?

সঙ্ঘমিত্রা বলে, সে তার একদা-প্রেমিক অরিন্দমের বিরুদ্ধে কোনো শস্ত্র ক্রুর সৈন্য পাঠাবে না। তবে আত্মকেন্দ্রিক ও ঊর্ণনাভের মতো নিজস্ব সৃষ্টিতে বিভোর অরিন্দমকে তিরস্কার করে সে বলে,

তুমি এই ঘরে
অহংকারের, ঝাড়লণ্ঠনের নিচে
ভালো থেকো।

তাকে ছাড়া সঙ্ঘমিত্রার দিন কাটবে কিনা সেও বুঝে নেওয়া যাবে। যাবার আগে সে ক্ষোভ ও দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে যায়—

তুমি ভালো থেকো ঝাড়লণ্ঠনের নিচে
আলোর মালঞ্চ জ্বালা অন্ধকার ঘরে।

একজন লেখকের নিঃসঙ্গতা চমৎকারভাবে কবি চিত্রিত করেন।

'অমৃতধামযাত্রী' সংলাপিকা 'দান্তের রচনা থেকে নির্বাচিত' কবি নিজেই বলেছেন। দান্তে ও বিয়াত্রিচের অমর প্রেমের কথা কারো অজানা নয়। এই এক দিব্যপ্রেম—'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি', তাই দিয়েই দান্তে রচনা করেন ফাল্গুনীগাথা—'দি ডিভাইন কমেডি'। নরক থেকে স্বর্গে কবির যাত্রা। এই সংলাপিকায় প্রথমে পাই ফ্রাঞ্চেস্কা ও পাওলোর কথা। দান্তে, ভার্জিল ও ফ্রাঞ্চেস্কার কথোকথন প্রথম ঘটে। কুদর্শন স্বামীকে ছেড়ে সুদর্শন পাওলোকে ভালোবেসেছিল ফ্রাঞ্চেস্কা। তাই তার স্বামী দুজনকেই হত্যা করে। এখন তারা দুজনে নরকবাসী। নরকদর্শনে এসে দান্তে প্রেমিকযুগলকে দেখে দান্তের কাছে জানতে চান, 'ওরা কারা যায় মন পবনের কালো হাওয়ায়'। ওদের ডেকে কথা বলতে চান। ভার্জিল ওদের প্রেমের কথা বলেন। শুনে দান্তে বলেন,

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

এসো কাছে এসো, আরো কাছে এসো, ভ্রাম্যমাণ
ক্লান্ত যুগল, আমার সমীপে অগ্রসর।

দান্তের আন্তরিক আহ্বানে ফ্রাঞ্চেস্কা বলে—'কে তুমি মহৎ প্রাণ? কে তুমি, এমন দয়াময়?' সমাজ ও সংসার তাদের প্রেম মানেনি। হত্যা করেছে। তবু

এক মরণে মিলিত দ্যাখো আমরা দুইজনে,
কিন্তু কে বা ঘাতক, তার কী দশা, নিশ্চয়
শাস্তি পাবে চন্দ্রলোকে চিরনির্বাসনে?

শুনে দান্তে বলেন, 'ফ্রাঞ্চেস্কা, তোমার দুঃখে বুক ভরে সমবেদনায়'। এবার ফ্রাঞ্চেস্কা তাদের পূর্বরাগ ও প্রেমের কাহিনী সংক্ষেপে শোনায়, যে প্রেমে 'হঠাৎ একমুহূর্তে ঘটে গেলো ভীষণ প্রলয়'। এগিয়ে আসে পাওলো। 'দয়াময় দয়া করো' বলেন দান্তে। এরপর আত্মশুদ্ধির পার্বত্যদ্বীপে গেলে দ্বীপের বৃদ্ধ অধিপতি নানা প্রশ্নবাণে তাঁকে বিদ্ধ করেন। নিশীথরাজ্যের নিয়ম কেন দান্তে ভাঙতে চান, জানতে চায়। ভার্জিল বলেন তিনি দান্তের কাছে এসেছেন 'দুলোকদুহিতা এক নারী'র নির্দেশে। সেই নারীর কথা শুনে পার্বত্যদ্বীপের পিতা সামনে চলার অনুমতি দেন। শিশিরস্নানে মুছে যায় সমস্ত কলুষ।

স্বর্গপথে দান্তে দেখেন বিয়াত্রিচেকে। ভাবেন, ও 'নারী, না ঈশ্বরী'? স্বগত সংলাপে বিয়াত্রিচেকে তার আটবছর বয়সে প্রথম দেখার স্মৃতি বলেন। দেখামাত্র সেদিন 'সমস্ত অস্তিত্বে 'এক প্রবল ঝংকার' ওঠে। ঈশ্বরদুহিতা বলে তাকে মনে হয়েছিল। একদিন নগরগগন শূন্য করে সেই বিয়াত্রিচে চলে গেলে 'মৃত্যুশোকে ভুলবো বলে আরেকটি রমণীকে হৃদয় দিলাম আমি' দান্তে বলেন। এখন অমরাবতীর পথে এসে দান্তে কি অমৃতরূপ নারীটিকে চিনে নেবেন? দান্তে জানান, 'এখন আমার দৃষ্টি পুনর্নব'। প্রায় স্তোত্রের মতো প্রিয়াবন্দনায় বলেন,

তুমি স্বরচিত স্বর্গে বিরাজো, হে জ্যোতি পরমাগতি,
তুমিই প্রজ্ঞাপারমিতা তুমি অন্তর্লীন আলো,
সারা মুখে আনো আত্মদীপের সুস্মিত সংগতি।
একি রহস্য একি আনন্দ নূতন ভুবন জুড়ে
মহান বৃত্ত—দিব্যপ্রতিমা তারি পরে সমাসীন
ডানা মেলে নয়, উত্তরণের সৌরশিখর চূড়ে
এসেছি সহসা রৌদ্রাভিসারে, দেখেছি অন্তহীন
আবর্তরত আলোকচক্র।

আমরা জানি, বিয়াত্রিচে দান্তের জীবনে পবিত্র আলোকশিখা-তাঁর সর্বস্ব। রবীন্দ্রনাথ 'বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাহার কাব্য' প্রবন্ধে যথার্থ বলেছেন—

বিয়াত্রিচে তাঁহার সমুদয় বাক্যের নায়িকা, বিয়াত্রিচেই
তাঁহার জীবনকাব্যের নায়িকা। বিয়াত্রিচেকে বাদ দিয়া
তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা......তাঁহার জীবনের
দেবতা বিয়াত্রিচে, তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রিচের স্তোত্র।

অলোকরঞ্জন অনেকগুলি কাব্যনাটক বা নাট্যকাব্য লিখেছেন। যা তাঁর ভাষায় 'ছায়াপথের সান্দ্র সংলাপিকা'। সব লেখা কোনো একটি গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। নানা কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। যেমন, 'কবির মৃত্যু' (প্র. বয়েসের ছাপ মুছে ফেলি বল্কলে কাব্য) সন্ত কবীর নিয়ে লেখা সংলাপবদ্ধ নাটিকা। কবীরের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সাধারণ মানুষের জন্য ভালোবাসা কত, কবি তা দেখাতে চেয়েছেন। মৃত্যুর পর যখন হিন্দু ও মুসলমান মিলে তাঁর অন্তেষ্টি নিয়ে দ্বন্দ্বে মাতে, দেখা যায় চাদর সরিয়ে একটি ফুল শুধু ভালোবাসা। অলোকরঞ্জন মানবতাবাদী সন্ত হিসেবে কবীরকে দেখনি। যেমন 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ' নাট্যকাব্যে বিবেকানন্দ-প্রাণিত নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষ, মানুষ ছাড়া কোনো মন্ত্র নেই....বুকে নাও মানুষের ব্রত'। কবি অলোকরঞ্জনও মনুষ্যত্বের এই উদ্বোধন চান।

৩.

কবীর : এক কবির মৃত্যু

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ও কবি সন্ত কবীর। তাঁর সম্পর্কে যা জানা যায়, তা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। উইকিপিডিয়ার তথ্যানুসারে কবীর পঞ্চদশ শতকের মানুষ—'Indian mystic poet and saint'. যাঁর লেখা দোঁহা ভক্তি আন্দোলনে জোয়ার এনেছিল। হিন্দু ভক্ত রামানন্দ ছিলেন তাঁর গুরু। শিখধর্ম থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলেই কবীর অনুপ্রাণিত।

কবীর কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। নিখুঁত তারিখ ভালো নেই। পেশা ছিল তাঁত বোনা। বলা হয় জাতিতে তিনি মুসলমান। তাঁর নাম কবীর আরবী 'আল-কবির' শব্দ সঞ্জাত; যার অর্থ মহান। আল্লাহর ৩৭তম নামও এটি। কবীর রচিত। 'বীজক' তাঁর তত্ত্ব ও কবিত্বের নিদর্শন। তাঁর ভক্তিবাদীসাধনা কবীরপন্থ রূপেই পরিচিত। তিনি সুফি; তবে কেউ তাঁকে শৈব বৈষ্ণব বা নাথযোগীও বলেন। তাঁর জন্মরহস্য রোমাঞ্চকর। কোন এক বিধবার গর্ভে সন্ন্যাসীর বরে কবীরের জন্ম। তাই লোকনিন্দার ভয়ে মা শিশুকে পথে ফেলে দেন। জনৈক তাঁতী বা জোলা তাঁকে কুড়িয়ে নেয় ও প্রতিপালন করে। আবার কেউ বলেন, সাধু রামানন্দর বরে এক নারীর হাতের পাতায় তার জন্ম। যেজন্য তিনি 'কর-বীর' বা কবীর। কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর জাতধর্ম জানা নেই বলে কাজীর হুকুম একে হত্যা করো। তখনই শিশু কবীরের মুখে থেকে বাণী উচ্চারিত হয়,

অন্ধ বসুন্ধরায় কেউ চেনে না আমাকে।

বাতাসও নই, মাটিও নই, আমি শুধুই জ্ঞান।
সবার উৎকর্ষ আমি শুধুই শব্দের এক ফেরিওয়ালা।
ধ্বংস নেই আমার, কবীর আমি।

কোনো ধর্মীয় বিভাজন তিনি মানতেন না। গলায় কণ্ঠী, কপালে তিলক এঁকে বলতেন, 'গীতা আর গায়ত্রী মন্ত্র তোমাদের মুখে আর গোবিন্দ আমার প্রাণে'। নিজের তাঁত বোনা নিয়ে তাঁর লজ্জা ছিল না। তাঁর লেখায় তাঁত ও বুনন রূপক হয়ে উঠেছে।

কবীরের দোঁহার মধ্যে তাঁর জীবনদর্শন, সাধনতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যেমন,

১। মো কো কাহা ঢুণ্ঢে রে বান্দে
ম্যায় তো তেরে পাস
না মন্দির পে না মসজিদ পে
না কোয়ি অনন্ত নিবাস মে
২। জাতি না পুছে সাধু কি
পুছ লিজিয়ে জ্ঞান।
৩। পোথি পড়ি পঢ়ি জগ মুয়া
পণ্ডিত গয়া না কোয়ি।
৪। হাঁসি হাঁ কান্ত না পায়া জিন পায়া তিন রোয়
৫। হাম নে মরে মরি হে সনসারা
হাম কো মিলে জীবনহারা।

এমন সন্তকবি কবীরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন একটি কাব্য নাটিকা 'কবির মৃত্যু' (দ্র. বয়েসের ছাপ মুছে ফেলি বল্কলে কাব্য)। তবে কবীর নিয়ে তাঁর অনুরাগ কিছু কবিতায় আগেই প্রকাশিত হয়েছে। 'চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো' কাছে 'কহত কবীর' নামে কবিতা আছে। যেখানে কবীরের বকলমে কবি বলেন।,

ভেবে দেখেছ কি চিত্রার্পিত আমাদের এই তিন ভুবন তো,
যাঁর হাতে আঁকা প্রকৃত অর্থে তিনিই আসলে চিত্রবন্ত।

কাব্যতত্ত্বের ভাষায় চিত্রতুরগ এই বিস্তৃত, এই সংসার। 'এখন নভোনীল আমার তহবিল' কাব্যে কবীরকে নিয়ে লিখেছেন, 'মনীষা জন্ম কি মৌজ' এবং 'কবীরের কিছু মজায় হেঁয়ালি" শিরোনামে বাইশটি চতুষ্পদী কবিতা। দোঁহার রূপান্তর।

১। দেহ আমার দীপের চেরাগ
আত্মা এখন সলতে, আমার
ঘৃতরক্তে আমায় মাখাও,

দাও দেখা দাও প্রভু এবার।
২। সপ্তসিন্ধু কালি হোক আর
বনরাজি হোক কলম তোরই
তার ধরিত্রী কাগজ, কিন্তু
অবর্ণনীয় থাকেন হরি।

আবার ভাষ্যসহ "মনীষা জন্ম কি মৌজ" কবিতায় সাধনতত্ত্ব এইভাবে দেখান,

মূল দরজায় বন্ধ্যা বধূ অপার।
চন্দ্রকে ফেলে সুজ্জি গেছে ওপার।
পাছদুয়ারে কে আমার মাথায় বসে
সূর্যসাধনা করছে এক গোঁয়ার।

বোঝা যায় কবীর ও তাঁর কবিতা, জীবনবোধ কবি অলোকরঞ্জন নিজের গরজে বুঝে নিতে চান। সেই অনুশীলনেই জন্ম নেয় 'কবির মৃত্যু' নামে কাব্য নাটিকা। যেখানে কবীরের রহস্যময় মৃত্যু অসাম্প্রদায়িক চেতনার ও উদার মানবতার জয়গান করে।

কোনো অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভাজিত নয় 'কবির মৃত্যু'। কবি যা গদ্যভাষ্যে বলেছেন, সেটাই মঞ্চ-নির্দেশ ও পটবদলের ইঙ্গিত দেয়। নাট্যচরিত্র মাত্র দুজন—কবীর ও কবি অলোকরঞ্জন। আছে কোরাস। নেপথ্যে কবীরপন্থী শিষ্যদল। কাব্যনাটিকার শুরুতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'কবীরে মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এসেছে।' তিনি অর্ধশায়িত। আর দুদিকে বিভক্ত কোরাসের ধরনের আছে কবীরপন্থী শিষ্যেরা। তাঁদের গুরুর মৃত্যু আসন্ন জেনে তারা উদ্বিগ্ন। বিশেষত তাঁর সৎকার কীভাবে হবে তার উপায় তারা জানে না। ত্রিকালজ্ঞ কবীর সেই দুশ্চিন্তার আভাস পেয়ে স্বগতকথনে বলেন,—

এখনও আমার সময় হয়নি যাবার—
তাছাড়া যেহেতু ইচ্ছামৃত্যু আমি
ইন্তেকালের সমূহ দিনক্ষণ
নির্ণয় করা নিজেরই হাতে আমার।

বলেন, 'এখনও আমার দুয়েকটি কাজ বাকি'। যেমন, পাখিরা অভুক্ত; তাদের খাওয়াতে হবে। শুনে শিষ্যেরা ছুটে যায়। পাখিরা ভয় পেয়ে সরে যায়। কবীর ভর্ৎসনার সুরে বলেন, 'অনেক হয়েছে, তোমরা থামো এবার'? এরপর তিনি অলোকরঞ্জনকে ডাকতে বলেন, দুয়েকটি কথা তাঁকে বলবেন। কেন তিনি আলোককে চান? কারণ, 'সে নয় হিন্দু সে নয় মুসলমান'; খৃষ্টানও নয়। শিষ্যেরা প্রায় ধরে বেঁধে অলোকরঞ্জনকে নিয়ে এলে কবীর জানতে চান, জার্মানে তাঁর দোঁহার সন্ধান কেউ জানে কিনা। অলোক জানান 'লোথার লুৎসে তর্জমা করেছেন'। কবীর ক্ষিতিমোহন সেনের কথা জানতে চাইলে শোনেন, তিনি

প্রয়াত। বিস্মিত কবীর বলেন, 'কী কাণ্ড। আমি তো খবর রাখি নাতো'।

কবীরের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন যেন টাইপমেশিনে চড়ে পরিভ্রমণ। অতীত ও বর্তমান দুইচালকে একই বৃন্তে ধারণ করেছেন অলোকরঞ্জন। তাই সপ্তসিন্ধু কালি, বনরাজি কলম ইত্যাদি কথা কবীর বললে, অলোক বলেন,

কাগজে কলমে এখন লিখে না কেউ,
প্রকৃতপক্ষে ল্যাপটপ একা লেখে,

'যন্ত্রেরই হাতে সবটুকু ঢেলে দেয়' মানুষ। শুনে বিমর্ষ, হয়ত বিরক্ত কবীর বলেন,

এভাবে বাঁচলে বাঁচা আর হলো কই,
হাবড়ি ধাবড়ি জনম গবাবৈ।
কবলুঁ ন রামচরণ চিত লাবৈ।।

নেটশাসিত প্রযুক্তিতাড়িত এই যুগে মানুষ সবকিছু এখনই চায়। অলোকরঞ্জনের ভাষায় 'মানুষ এখন অদ্যপ' (অধুনা ও সাম্প্রতিকের অনুরাগী')। তাই তারা 'আজকের মদটাই/তন্হা মিটিয়ে পান করে'। কবীর বলেন, একদা তিনিও 'ব্রহ্মের আস্বাদ' পেতে ছুটেছিলেন, তখন তাঁকেও শুনতে হয়েছিল 'বামন ছুঁয়েছে চাঁদ'। তবে অলোক তাঁকে 'বিধাতার রাজদূত' আখ্যা দেন। কবীর বলেন, যার রজোগুণ নেই সে রাজপুত নয়। আর জ্ঞান বিনা ফোকটে অবধূত হওয়া যায় না। যা কবীরের আত্মসমালোচনা মনে করেন অলোকরঞ্জন। কবীর সাধন পদ্ধতির কথা বলেন—'ঢুঁড়ে, আলো পাঁচ পবন'। অলোকরঞ্জন বলেন, তাঁর সাধ্য ও সাধনা কবিতা। বিপন্ন মানুষ 'বাঁচার কবিতা চায়'। কবিতা এজন্য 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরা'। তিনি তারই মুখপাত্র হয়ে কবিতা লিখে চলেন। 'যৌবনবাউল' এখন আর লেখা সম্ভব নয়। কবীরও বলেন, তিনি নিছক জ্যোতি-কমলের বর্ণনা দেননি; দুঃখিনীদের কথাও বলেছেন—

মঙ্গলাগান গাইবে অঙ্গনারা
যারা আজীবন সন্তানে সন্তাপে
জ্বলে উঠে শেষে অগণন ধ্রুবতারা
হয়ে আছে,

এরপর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বলেন 'সূর্যসাধনা করছে এক গোঁয়ার।' আছে 'দশম শেষ দুয়ার'। কবীর জানান, যারা হিন্দু তারা তাকে দাহ করবে। আর যারা মুসলমান, তারা দেবে গোর। আসলে মানুষ এক নদীর প্রবাহ। তার কি ভেদ হয়? কবীর এবার নিজেকে ছেঁড়া কাঁথায় ঢেকে দেন। অলোকরঞ্জন শবচ্ছদ তুলতেই দেখতে পান, 'মৃতদেহের বদলে জেগে আছে একটি ফুল।' অলোকের প্রশ্ন ঃ ফুলকে কি কখনো দগ্ধ বা প্রোথিত করা যায়?' পঞ্চাশের কবির এমনও মনে হয়, 'কবীরের মৃত্যু যে একমাত্র রিলকের গোলাপ কাঁটায় আঙুল ছড়ে গিয়ে দেহাবসানের সঙ্গেই উপমেয়'। একজন সাধক

শুধু নন, একজন যথার্থ কবির মৃত্যু যে ভ্রমণ ফুলের প্রতীক হবে এটাই সংগত ও স্বাভাবিক। কবীর মানুষ হিসেবে দৈবী কিনা সে প্রশ্ন সরিয়ে রেখে বলা যায় তিনি মানবপ্রেমী। জাত-ধর্ম-বর্ণ তাঁর কাছে তুচ্ছ। ঈশ্বরই মানুষ, মানুষই ঈশ্বর তাঁর অনুভবে। তাই প্রিয়জনকে উপহার দেবার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ফুল। কবীর তাই ফুল হয়ে ফুটে উঠেছেন—এই অবসান সত্যিই কাব্যিক। তবে কাব্যনাট্য হিসেবে 'কবির মৃত্যু' যতটা পাঠ ও শ্রুতিসুভগ, মঞ্চস্থ হলে ততটাই চিত্তাকর্ষক হবে কিনা, তা বলা মুশকিল। দক্ষ পরিচালক হয়তো সেই কৃৎকৌশল জানেন। আপাতত সুন্দর সংলাপিকা হিসেবে একে আমরা অভ্যর্থনা জানাতেই পারি।

৪.

নাট্যকবিতায় নিবেদিতা

৪ঠা জুলাই, ১৯০২-এ স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসানের পরে 'নিবেদিতার মানসিক পটভূমিতে' পঞ্চাশের কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত যে সংলাপিকা লিখেছিলেন, তার নাম 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ'। কবি একে কাব্যনাট্য বলতে চাননি সংগত কারণে। উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে। গাথা নাট্যকবিতা ধরনে লেখা এই সংলাপ-কবিতা। যেখানে কোনো মঞ্চনির্দেশ নেই, নাট্যচরিত্রের বর্ণনা নেই, নাটক অভিনয়ের নির্দেশও নয়। অনেকটাই শ্রুতিনাটকের মতো—যেমন রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' নাট্যকবিতা দুটি চরিত্রের সংলাপের বিনিময়ে গড়ে উঠেছিল। সংলাপই এখানে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। পিরানদেল্লোর ভাষায় 'dialogue is action' হয়েছে। যার দ্বারা আবার চরিত্রের গভীরতল পর্যবেক্ষণ করা যায়।

নিবেদিতার জীবনের Friend, Philosopher & Guide-এর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। যাঁকে তিনি 'প্রভু', 'রাজা' বলে ডাকতেন। তাঁর হৃদয়ের হৃষিকেশ স্বামীজী—'হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।' লিজেল রেমঁ তাঁর 'ভারতকন্যা নিবেদিতা' গ্রন্থে 'তিরোভাব' অংশে স্বামীজীর প্রয়াণের শেষ দিনগুলি বর্ণনা করেছেন। গয়া-কাশী ঘুরে এসে ক্লান্ত, অসুস্থ বিবেকানন্দ। নিবেদিতা গুরুকে মায়াবতী নিয়ে গেলেও অবস্থার উন্নতি হয় না। ফিরে এলেন বেলুড়। তাঁর সাধের মঠে। আলোচনা, ধ্যানে সময় কাটে। তাঁর সময় ফুরিয়েছে বুঝতে পারেন। কাজের ভার বুঝিয়ে দিতে চান প্রিয় শিষ্যকে। বলেন,

> স্নেহের নিবেদিতা, অফুরন্ত শক্তির আধার হও।
> স্বয়ং জগদম্বা তোমার দেহ-মনে আবিষ্ট হন।
> তোমার মাঝে চাই দুর্নিবার বিপুল শক্তির উদ্বোধন।

একদিন খাবার পর নিবেদিতার হাত ধুয়ে দিলে বোঝা যায়, অন্তিম দিন সমাগত। এরপর ফিরে আসেন বাগবাজারে। পরদিন ভোরে সারাদানন্দের চিঠি পান—

> নিবেদিতা, সব শেষ। কাল রাত নটায় স্বামীজি
> ঘুমিয়ে পড়েছেন চিরতরে। (৪ঠা জুলাই, ১৯০২)

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

ছুটে গেলেন বেলুড়ে। দেখলেন মেঝেতে মাদুরে শায়িত প্রভুর দেহ ফুলে ঢাকা। পাশে বসে তালপাতার পাখায় হাওয়া দিতে থাকেন বড় আদরে, ভালোবাসায়। অমরনাথ গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন, মহেশ্বর তাঁকে 'ইচ্ছামৃত্যুর বর' দিয়েছেন। কোলে রাখা প্রশান্ত মুখটির তাকিয়ে কত কথা মনে পড়ে। মাত্র ৩৯ বছর বয়স। যৌবনের তারুণ্য মুখে অম্লান। এখনই কি চলে যেতে হয়? কেন? উত্তর খুঁজে বেড়ান। শেষকৃত্যের আগে নিয়মকানুন-আচার পালিত হয়। 'গুরু মহারাজ কী জয়' ধ্বনি ওঠে। চিতার প্রথম আগুন দেন নিবেদিতা। চোখের সামনে ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হয় প্রিয় গুরুর নশ্বর দেহ। একটু স্মৃতিচিহ্ন কি তিনি প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতার জন্য রাখবেন না? ভাবতেই জ্বলন্ত চিতা থেকে উড়ে আসে প্রভুর একটুকরো আধপোড়া বস্ত্রখণ্ড। বাইরে গেরুয়া—ভিতরে অনুরাগে রঙিন, করুণ। বন্ধু সদানন্দ সান্ত্বনা জানান। নিবেদিতা জানান, 'তাঁর বোঝা তাঁরই হয়ে বইতে চাই আমি, আর কিছু চাই না।'

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এই পটভূমিকা স্মরণে রেখে লিখেছিলেন সংলাপিকা। 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ' অবশ্যই কাল্পনিক কথোপকথন। প্রয়াত স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতা তাঁর মনের ভাব-ভাবনা বিনিময় করে আশ্রয় ও পথ খুঁজছেন। যেন এক ইলুউশন — রেজারেকশন—শুরুতেই পড়ি,

প্রভু, তুমি আবার এসেছো নাকি? অন্ধকারে শিলালিপি রেখে চ'লে যাবে, ভোর হলে পড়া যাবে?

শুধু কি তাই? কৃষ্ণবিহীন মথুরা যেমন শূন্য, তেমনি অনুভবে নিবেদিতা বলেন,

> দ্যাখো এই ঘর
> জনহীন, দ্যাখো এ নগর
> আর জনপদ নয়, আর
> ঝর্ণা নিভে গেছে দীপাধার
> ঢালো না শতদ্রু শিখা, ফুল
> ঝরে গিয়ে বাগানে আবার
> ফিরে তো আসে না—

বিবেকানন্দকে তিনি জানান, বিশ্বে মানুষ দুঃখী, অসহায়। অন্ধকার থেকে আলোয় যেতে চায়— 'বিশ্বের মানুষ রাত্রিযাম'
মুছে দেবে ব'লে দীক্ষা চায়।'

কিন্তু মানুষ তো এখনো সেইভাবে আলোকার্থী নয়। সখেদে স্বামীজী বলেন, 'অবুদ্ধ ভারতবর্ষ, এখনো অবুদ্ধ বিশ্বধাম।' নিবেদিতা এই উদাসীনতা মানতে না পেরে বলেন, স্বামীজীই তো বলেছিলেন, 'মানুষ বানাতে এসেছি' কিংবা 'মানুষ, মানুষ ছাড়া কোনো মন্ত্র

নেই'। তাহলে? যাঁর মধ্যে তিনি দেখেছেন 'সিদ্ধার্থের মানবমূর্তি', তিনি কেন দায় এড়িয়ে যাবেন? শুধু মৃত্যু নিয়ে কি এগোনো যায়? প্রেমই আশ্রয় ও পথ। প্রভুকে প্রশ্ন করেন, 'মৃত্যু ও প্রেমের মধ্যে কাকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলে মনো?' নিবেদিতা নিজের জীবনের আদর্শ ব্যক্ত করেন—'আমি মৃত্যু প্রেম দুই দীপ জ্বালি।' প্রত্যুত্তরে বিবেকানন্দ জানান, প্রেম মৃত্যুর মতন শক্তিশালী'। শুনে নিবেদিতার প্রশ্ন—

তুমি কি এখনো আমাদের
হাত ধরে আছো?
বরাভয় পূর্ণিমা চাঁদের
মতো তুমি সর্বত্র বিরাজো?

জানতে চান, 'তুমি কি পাতকপরিত্রাতা'? দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিবেকানন্দ বলেন, 'অনাশ্রিত মাটিতেই আমার আসন আছে পাতা।'

তাহলে নিবেদিতাকে কে গান শোনায় 'মন চলো নিজ নিকেতনে'? উত্তরে শোনেন, 'মৃত্যুরূপা মাতা'। কথায় কথায় আসে অমরনাথ গুহা যাত্রার প্রসঙ্গ। যেখানে তুষার শিব জটার ভিতর থেকে প্রপাত ঝরিয়ে বলেছেন,

'ইচ্ছামৃত্যু নাও, কিংবা, নামান্তরে, ইচ্ছা-অমরতা।'

ব্যাখ্যা করে স্বামীজী বলেন—

আমি যেন বারংবার জন্ম নিতে পারি, সেই বর—
আমি যেন জন্মে-জন্মে সৈনিক এবং নশ্বর
হতে পারি, সেই বর।

'গৈরিক-যুদ্ধের প্রান্তরে,' নিবেদিতাকে বলেন, 'মৃত্যুই তো কর্মের মোহানা।' আর নিবেদিতাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলেন,

তুমি পূর্ণতার পাখি, অলৌকিক ঈগলের মতো
উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ বিবোধত
ভ্রূবলয় দিয়ে আঁকো ভারতপতাকাকেন্দ্রতলে
বজ্র এক।। আমাকে জন্মাতে হবে অজস্র অনলে
যারা নিমজ্জিত, শ্লথ, বঞ্চিত এবং অসহায়
আবার তাদের মধ্যে নেমে এসে প্রভাতসন্ধ্যায়
শত কাজ বাকি আছে।

এই ভারতে যারা প্রত্যহ ঘৃণিত ও পদানত, যাদের রুধিরশ্রাবে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তাদের পাশে তিনি দাঁড়াতে চান। জানেন, এই হতমান মানুষেরাই ভবিষ্যৎ ভারতের

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

সম্পদ। সেই মানবসেবায় তিনি চান নিবেদিতাকে। যে নটরাজ বিবেকানন্দকে 'ছুঁয়েছেন আগ্নেয়মুদ্রায়', সেই আগুনের পরশমণি তিনি দিতে চান প্রিয় শিষ্যাকেও। তবে এও বলেন, একান্ত ব্যক্তিকতায় যদি নিবেদিতা মজ্জিতা হন, 'আপন কান্নার অন্তঃপুরে' থাকতে চান, তবুও তাঁর হৃদয়ের রাজা আশ্বাস দেন, 'অন্তিম মৃত্যু পর্যন্ত আমি আছি তোমারি নিকটে'। জীবন ও মরণের এই মোহনায় দাঁড়িয়েই নিবেদিতার আত্মনিবেদন সত্য ও শিবের জয় ঘোষণা করে।

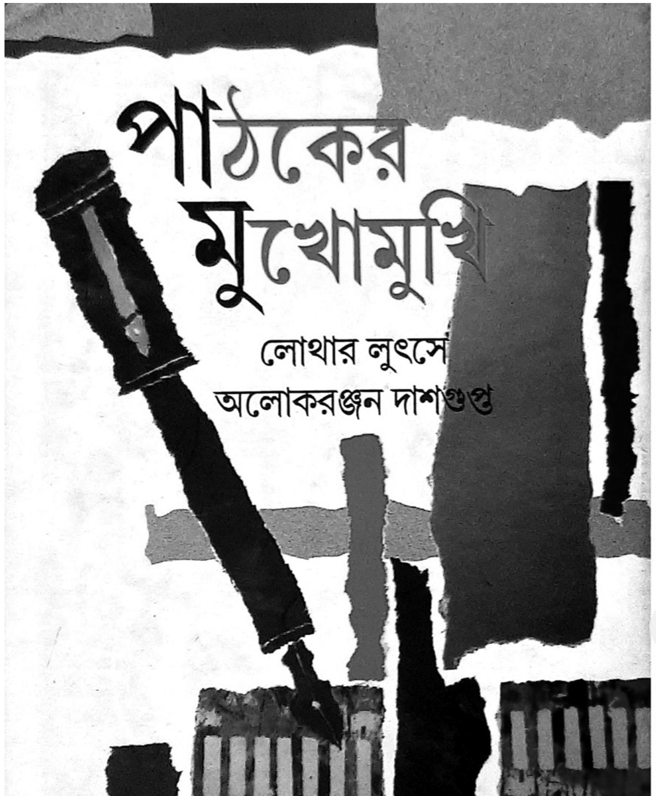

অনুবাদকের ভূমিকায়

শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

আপনার বাঙ্গলা অনুবাদ মোটের উপর চমৎকার লাগিল। আপনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। গ্রীক ট্যাজেডির দেহ ও আত্মা দুই-ই বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে আনা সহজ কথা নহে। — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কৃত 'আন্তিগোনে'-র অনুবাদ প্রসঙ্গে)

'একটি কবিতার মর্মে পৌঁছতে হলে আর একটি ভাষায় তার অনুবাদ দরকার হয়ে পড়ে।' —অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসের একটি সন্ধ্যায় Hirscberg -এ অগ্রজের বাড়িতে বসে কবিতার অনুবাদ নিয়ে দুজনে কথা বলছিলাম। আমি তখন গুন্টার গ্রাস-এর তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার কবিতার অনুবাদে নিয়োজিত আর বড়দা সে সময়ে বের্টোল্ট ব্রেশট-এর কবিতার বাংলা তর্জমা করছেন। অনুবাদের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বড়দা সেদিন বললেন, "কোনও এক কবির সৃষ্টি অনুবাদ করতে হবে বলেই আমি তাঁর কবিতা পড়ি না। অনুবাদের তাগিদ দেয় কবিতা পড়তে পড়তে। তুই অবশ্যই জানিস যে আমার প্রিয় কবি হল রায়নার মারিয়া রিলকে, কিন্তু রিলকের কবিতার অনুবাদ আমাকে প্রাণিত করেনি। আমার মনে হয়েছিল যে এই বিরটি কবি far too mystical এবং তার ঈশ্বরচেতনা far too solemn and personal। এই দুটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হয়তো ঠিক উঠে আসবে না। অন্যদিকে, ব্রেশট-এর কবিতা এবং তাঁর কবিস্বভাব আমাকে অনিবার্য্যভাবে টেনে নিয়েছিল অনুবাদের দিকে। সত্যি বলতে বের্টোল্ট ব্রেশট আমার সযত্নে সুরচিত লিরিক কবি স্বভাবের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমি আমার লিরিক একাগ্রতার তীব্রতা কিছুটা কমিয়ে, ব্রেশট-এর হাত ধরেই লিখতে শুরু করেছিলাম argumantative dialectical কবিতা। আমার কবিস্বভাব আমি বর্জন করিনি, যদিও তাকে এই রূপান্তরের পর্বে আমি নৈর্ব্যক্তিক ও বিশ্বজনীন করতে চেয়েছিলাম।

এবারে অনুবাদপ্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রথমে আমি মূল কবিতাটি পাঠ করি শ্রদ্ধাভরে, অনুবাদের চিন্তা না করে পড়তে পড়তে আমার মনে হয় যে এই কবিতা অনুবাদের যোগ্য। অর্থাৎ বাংলা অনুবাদে এর অন্তঃসার অটুট থাকবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আমি অনুবাদযোগ্য কবিতাটির সেই বিশেষ অংশগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করি যেগুলির সুযোগ্য তর্জমা করা কিছুটা দুরূহ। তৃতীয় পর্য্যায়ে আমি construct করি তর্জমার একটি

খসড়া। চতুর্থ পর্য্যায়ে মূল কবিতা আর তার অনুবাদ পাশাপাশি রেখে আমি এক কড়া বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। বিচার করি মূল ও তর্জমার পারস্পরিক নৈকট্য, বিচার করি মূল কবিতার অন্তস্পন্দন অনুবাদেও অক্ষত আছে কিনা। যতক্ষণ না আমি তুষ্ট হচ্ছি, ততক্ষণ পরিমার্জনা সংশোধন অব্যাহত থাকে। শেষ পর্বে আমি আমার কৃত তর্জমা কয়েকজন যোগ্য শ্রোতাকে পড়ে শোনাই। তাঁদের মতামতের ওপর ভিত্তি করেই অনুবাদ তার কাঙ্ক্ষিত রূপ পরিগ্রহ করে।

কার কবিতার ভাষান্তর করে আমি সর্বাধিক আনন্দ পেয়েছি, এই সূক্ষ্ম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবুও, বলতে যদি হয়ই, আমি বলব ফ্রিডরিশ হোল্ডারলিন, হাইনরিশ হাইনে এবং বের্টোল্ট ব্রেশট এর কবিতার অনুবাদ আমাকে সর্বাধিক প্রাণিত করেছিল এবং এখনও করে। প্রায় তুলনীয় আনন্দ পেয়েছি টি এস এলিয়ট এর Burnt Norton অনুবাদ করে হাইনরিশ হাইনে-র গীতিকবিতার সুগভীরে সারল্য, ফ্রিডরিশ হোল্ডারলিন-এর দিব্যউন্মাদনা, ব্রেশট-এর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ততা আমাকে বরাবর আকৃষ্ট করেছে। এখনও, এদের অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরেও, যখনই সুযোগ এবং সময় পাই আমি এদের কাব্যের ভাষান্তরের কাজে মগ্ন হয়ে পড়ি। ও বলতে ভুলে গেছি, টি.এস. এলিয়টের সময়চেতনা ও ঈশ্বর উপলব্ধিও আমাকে আকৃষ্ট করেছে। Burnt Norton-এর সেই অমোঘ শক্তি only through time time is conquered' আমার কাছে মন্ত্রোপম মনে হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ আমাকে বারংবার এই লাইনটি স্ক্যান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এলিয়ট-এর সঙ্গে যুক্ত করব উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসকে। তার Tower / দুর্গ কবিতাটিও আমি অনুবাদ করেছি সাগ্রহে, সানন্দে।

প্রেম নিজে অচল থেকেও
সব চলাচলের নিধান,
সময়ের পারে ঈপ্সাহীন,
শুধু কখনো-বা ধরা পড়ে
আপেক্ষিক কালের মণ্ডলে
ব্যক্তঅব্যক্তের মধ্যভাগে।
সহসা শায়ক-সূর্য্যালোকে আর যেই সরে যায় ধূলি
নিহিত সৌহাস্যে উচ্ছ্বসিত পল্লবে লুকোনো শিশুদের
এখুনি, এখানে, সারাক্ষণই
বিধ্বস্ত বিমূঢ় ক্ষুব্ধকাল
একাকার আগে আর পরে। (ইয়েস/এলিয়ট, দুটি মহাকবিতা)

এই প্রাঞ্জল বিশ্লেষণের পর যে প্রশ্নটি অবধারিত ভাবে উঠে আসে তা হল; আমি কোন অনুবাদটিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করি। এই গূঢ় ও প্রশ্নের উত্তরদান সত্যিই একটি দুরূহ কাজ। যখন -হাইনের কবিতার ভাষান্তর পড়ি, তখন মনে হয় হাইনের গীতিকবিতার এত উৎকৃষ্ট অনুবাদ আর কেউ আমাদের ভাষায় করেননি, এমনকি রবীন্দ্রনাথও নন, যিনি যত্নভরে হাইনের ক'টি কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। হাইনে - অনুবাদের বিচার করতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'অলোকরঞ্জন হাইনের সুপ্রসর ৭৪টি কবিতার অন্তরঙ্গ পরিক্রমা করে তার নিজস্ব অনবদ্য ভাষায় প্রস্তুত করেছেন গ্রন্থখানি, এ বইয়ের ('প্রেমে পরবাসে') অনুবাদমালা চূড়ান্ত অনুবাদসিদ্ধি সম্পূর্ণ করেছে বলে আমাদের ধারণা।'

Anfangs Wollt ichh fast verzagen.
Und ich glaubt– ich trüg es nile;
Und ich hab es doch getragen
Aben fragt mich nur nicht– wie? (হাইনরীশ হাইনে)

গোড়ার দিকে দ্বিধান্বিত ছিলাম না তো কম, ভেবেছি, সেটা সহ্য আমার হবে না কখনো রে অথচ আমি করে নিয়েছি বেমালুম হজম— তোমরা তবু প্রশ্ন যেন কোরো না, কেমন ক'রে? (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

যখন হোল্ডারলিন এর কবিতার অনুবাদ গ্রন্থটি (নিয়তি ও দেবযান) পড়ি, তখন মনে হয় এই ভাষান্তরই শ্রেষ্ঠ। এমনকি মাইকেল হামবুর্গার কৃত ইংরেজি ভাষায় তর্জমাও এর কাছাকাছি পৌঁছোয় না। আবার যখন এই দুই আদ্যন্ত রোমান্টিক কবির পরিবহ অতিক্রম করে পৌঁছোই ব্রেশট-এর কবিতার অনবদ্য বিশ্বে, তখন মনে হয়, এত সুতীক্ষ্ণ অনুবাদ আগে পড়িনি। অগ্রজকে যখন আমি আমার দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা বলেছিলাম, তখন উনি নীরব থেকে ছিলেন। পীড়াপীড়ি করতে বলেছিলেন, "এই তিনটি কাব্যবিশ্বই একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র, অতএব এগুলির ভিতর তুলনা করাটা ঠিক হবে না। তবে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করিস আমি বলব যে আমি বারংবার ফিরে যাই হাইনরিশ হাইনের কবিতার জগতে।' মুহম্মদ মতিউল্লাহ এই তিনটি তর্জমার সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, "অলোকরঞ্জনের অনুবাদে হোল্ডারলিন-এর কবিতার সংকলন 'ঈথারদুহিত্যা' এবং 'নিয়তি ও দেবযান', কিংবা হাইনের কবিতা 'প্রেমে পরবাসে', কিংবা 'ব্রেশট-এর কবিতা ও গান তার মেধা ও সরসতার, উৎস ভাষার প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সুজন দক্ষতার পরিচয় বহন করে।" শ্রদ্ধেয় অমিয় দেব, যিনি অলোকরঞ্জনের ছাত্র ছিলেন, তিনি বলেছেন, 'এ এক আশ্চর্য্য দক্ষতা।' আসলে, কবিস্বভাব এবং ভাষান্তরের অন্তর্নিহিত ধর্ম পরস্পরের সঙ্গে আদ্যন্ত প্রথিত হয়ে এই অনুপম অনুদিত কবিতার জগৎ নির্মাণ করেছে। এ বিষয়ে সব

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

থেকে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্যটি করেছেন বন্ধু ও সাহিত্যপ্রেমী চিন্ময় গুহ। তাঁর ভাষায়, "যৌবনবাউল-এর কবি যে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তের ডাকে ছড়িয়ে পড়বেন তা বোধহয় অনিবার্য্য ছিল। অনুবাদকে এমন ভালোবাসার সঙ্গে নিজের সৃজনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর কবিতাভাবনা এমন এক মাত্রা পেয়েছে বা তাঁকে করে তুলেছে সম্পদের এক আলোকস্তম্ভ। যখনই নানা সংকীর্ণতায়, বলা উচিত গ্রাম্যতায়, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে, আমি সেই আলোকস্তম্ভের কাছে গিয়েছি... জার্মান ধ্বনির পাশাপাশি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর বিদ্যুৎবাহী পরিমিত বাংলা ভাষা এক প্রত্যয়ের সাক্ষী দেয়। তিনি আমার ও অন্যান্য অনুবাদকদের কাছে এক পথপ্রদর্শক।" Hirscberg এ আলোচনার অনেক পর অলোকরঞ্জন ফিরে যান গোয়েটের কাব্যবিশ্বে, এবং এই প্রত্যাবর্তনই আমার কাজটি সহজ করে দেয়। গোয়েটের ভাষান্তরটি পড়েই আমি ওই কঠিন সিদ্ধান্তে পৌঁছেই যে West Ostlicher Dria-এর অবিশ্বাস্য অনুবাদ 'প্রাচী-প্রতীচির মিলনবেলার পুথি' আমার অগ্রজ-কৃত শ্রেষ্ঠ অনুবাদের অক্ষয় অটুট নিদর্শন। আমি এই অনুবাদগ্রন্থ থেকে কোনো উদাহরণ পেশ করব না। আমি শুধু পাঠককে বলব, "অনুবাদটি আগে পড়ুন, তারপরে হয়তো আপনি আমার মতটি গ্রহণ করবেন।" এক কথায়, গোয়েটে থেকে বের্টোল্ট ব্রেশট — এঁদের কবিতার আশ্চর্য্য অনুবাদ আমাদের ঋদ্ধ করেছে।

অগুরুগন্ধে অর্চনা যদি করি
তবেই তোমার আনন্দ আরো বাড়ে,
আর সহস্র গোলাপ ফুলের কুঁড়ি
ডুবে যাবে খুব জ্বলন্ত অঙ্গারে।

সেই সুগন্ধ তোমার অসাধারণ
অঙ্গুলমেয় একটি শিশিতে যদি
নিরবধিকাল করতে চাই ধারণ,
তবে লেগে যাবে আরেকটি বসুমতী।

সেই বসুমতী জীবনের সংরাগে
আপূর্য্যমান, মাতে অনুসন্ধানে
বুলবুল কেন মানুষের সত্তাকে
স্পন্দিত করে আকর্ষণীয় গানে।

যন্ত্রণা বুঝি এভাবে আকাঙ্ক্ষার
করে আরো বেশি আনন্দবর্ধন ?

এভাবেই তৈমুরের স্বেচ্ছাচার
লক্ষ হৃদয় করেছে সংহরণ?
(জুলেখার জন্য, প্রাচী প্রতিচীর মিলনবেলার পুথি)।

এতক্ষণ আমি নিমজ্জিত ছিলাম আমার অগ্রজের বক্তব্যে এবং নামী সাহিত্যবোদ্ধাদের সশ্রদ্ধ মূল্যায়নে। শেষ করার আগে আমি ফিরে যেতে চাই আমার কন্যা লোকেশ্বরীর কাছে, যে-লোকেশ্বরী তাঁর 'কবিজেঠু'র ভাষান্তরের নিমগ্ন পাঠক। ইতিহাসের ছাত্রী এবং কথকনৃত্য শিল্পী লোকেশ্বরী আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছে, "এত সহজ সরল তন্ময় অনুবাদ আমি আগে পড়িনি। এবং গ্যেয়েটের 'মিলনবেলার পুথি' পড়েই আমার মা সুরঙ্গমা এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করেই কাব্যটির নৃত্যালেখ্য প্রস্তুত করেন। না, যে যাই বলুক, আমি বলব যে আমার কবিজেঠুর রচনা, বিশেষ করে অনুবাদ, আদৌ দুর্বোধ্য নয়।"

উৎস : কৃত্তিবাস, জানুয়ারী ২০২১

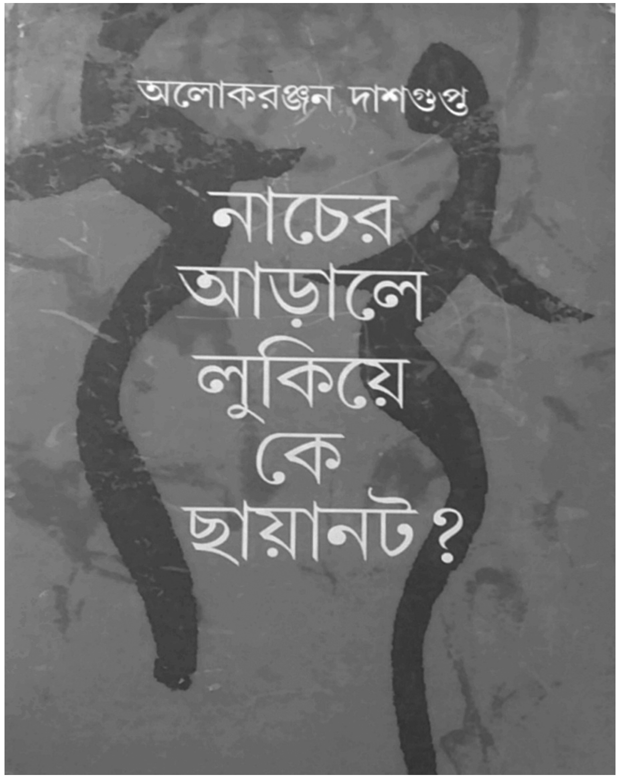

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র প্রবন্ধ-প্রাঙ্গণে প্রসঙ্গ : গদ্যশৈলী

দেবারতি জানা

আজকের আলোচনা একান্তই প্রাবন্ধিক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে ঘিরে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে প্রাবন্ধিকের ভাষাশৈলীর আনাচে-কানাচে পরিভ্রমণই আমাদের লক্ষ্য। আমরা তাঁর গদ্যের বিশেষ প্রবণতার দিকেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করব।

তাঁর বয়ানেই ফিরে পড়া যাক গদ্যকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, তাঁর কাছে 'গদ্যও, কবিতার মতোই, উদ্দীপনের প্রত্যাশায় অপেক্ষাতুর থাকে।'[১] বাস্তবিকই তাঁর গদ্যকেও জাগিয়ে তোলার জন্য গদ্যরচয়িতার সংবেদী প্রয়াস প্রতিক্ষণে অনুভূত।

তিনি যেমন বিশ্বাস করতেন জীবনানন্দ বা অবন ঠাকুরের গদ্য scan করা যায়, আমরাও বহুক্ষেত্রে লক্ষ্য করব অলোকরঞ্জনের গদ্যেও সেই গুণ আছে। তাঁর শ্রুতিতে ধরা পড়েছে চার পাশের মানুষের কথাবার্তার মধ্যে এক স্বাভাবিক বাক্ছন্দ আছে, সেই সূত্রে যে মনন নিয়ে তিনি গদ্য রচনা করেছেন সেখানেও স্বাভাবিক স্পন্দের অনায়াস আনাগোনা ঘটে যায়। আর যখনই তাঁর শ্রুতিগ্রাহ্য কথাদের scan করতে পারতেন না তাঁর মনে হত চারপাশের বলার মধ্যে কোনো গোলমাল হয়ে গেছে। এই যে পরিপার্শ্বকে ছন্দোস্পন্দিত আবহে শোনার আকুতি তারই বহমানতা তাঁর গদ্যমালা। তাই বক্তব্য নয়, তিনি জোর দিয়েছেন কীভাবে তা বলতে হবে তার ওপর। তাঁর প্রত্যয় সেই বলার ধরনের মধ্যে থেকেই বলার কথাটা বেরিয়ে আসবে।

কবিতা প্রসঙ্গে একদা তাঁর যে অভিমত, 'আধুনিক কবিতায় শব্দই সমগ্র ভাষাকে কোণার্ক কিন্নরীর চিবুকে ক্ষোদিত করে তুলে ধরেছে'[২] সেই সূত্রেই তাঁর বলার মধ্যে 'শুধু তৎসম শব্দ নয়, যেসব শব্দ হারিয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে এনে সচল কালস্রোতে প্রতিষ্ঠিত করার একটা দায় বহন'[৩] করেছেন তিনি —যে প্রবণতা তাঁর গদ্য সম্পর্কেও খাটে।

যিনি একদিন গর্বিত উচ্চারণ করেছিলেন, '... মাতৃভাষাকে তার সম্পূর্ণ বলয়ের মধ্য থেকে আমি ধরব,...'[৪] আপাতত তাঁর কবিতার ভুবন সরিয়ে রেখে গদ্যের আঙিনায় প্রবেশ করে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক অলোকরঞ্জনের এমনই কিছু ঝোঁকের প্রতি অনুসন্ধানী মনোনিবেশ জারি রাখব।

অলোকরঞ্জনের রচনার এক 'অমোঘ মুদ্রাগুণ - শব্দ নির্মাণের ঝলকানি'[৫]। তিনি নিত্য নতুন শব্দ সন্ধানের পাশাপাশি অপূর্ব শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে কেবল ভাষার কারুকার্য বৃদ্ধি করেননি, সেখানে বিন্যস্ত শব্দের অন্তঃস্থলে বৈদগ্ধ্যের ফল্গুস্রোতও বহমান। আমরা খুঁজতে চেয়েছি এই বিন্যাসের কয়েক টুকরো। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে পাঠকের

জন্য স্বল্পসংখ্যক দৃষ্টান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে আহরিত হয়েছে।

অ] নির্মিত বাক্যে কীভাবে তিনি শব্দযোজনা করছেন এখানে 'সুন্দরের অভ্যর্থনা' থেকে রইল নিম্নরেখাঙ্কিত তেমনই কিছু নমুনা, বন্ধনীমধ্যে পৃষ্ঠাসংখ্যা চিহ্নিত। ১৩ নং দৃষ্টান্তটি 'শিল্পিত স্বভাব' থেকে সংগৃহীত

১) 'তাঁর (হ্বান্স-গেয়র্গ গাদামার) বয়েস এখন ছিয়ানব্বই' কিন্তু সংবেদী অধ্যাপনার ছিলা এখনো খুব টানটান।' (৪)

২) 'আধুনিকতা বিধুনিত হওয়ার সংক্রান্তিপর্বে...' (৭)

৩) 'রবীন্দ্রসমগ্রেও, এভাবেই নিঃসন্দেহে, ওতপ্রোত হয়ে আছে অগ্রসৃতি ও পুনরাবর্তের পরস্পর-স্পর্শিতা।' (৭)

৪) 'আমাদের প্রধান আধুনিক কবিরা রবীন্দ্ররচনা থেকে রসদ নিয়ে লিখতে-লিখতে আমাদের প্রধানতম আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথকে কেমন পুনর্ভাবিত করে তুলেছেন, তাঁকে নতুন ঠামে লিখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন, সেদিকে কৌতূহলী হবার সুযোগই বা আমরা অনায়াসে ছেড়ে দেব কেন?' (১১)

৫) '... কবির বোধের প্রখরতা এবং সংবেদনের চিকন ক্ষমতা...' (১৬)

৬) 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্কশের অঙ্গীকরণে নয়, রবীন্দ্রভূষণের থেকে স্বাধীন প্রতিসরণের সাহায্যেই অমিয় চক্রবর্তী আধুনিকতা উদ্‌বুদ্ধ হতে পেরেছিল।' (২৩)

৭) '... মানুষের মনে জগতের বিভিন্ন ঘটনা ও ভাবনাকে যোগযুক্ত করে দেখবার প্রবণতা...।' (২৭)

৮) '... আজ বারো মাসে তেরো পার্বণের খিদে মেটাবার জন্য কাব্যিক এইসব নাটুকেপনার প্রশ্রয়েই প্রণীত হয়ে চলেছে গীতিবিচিত্রা-নামক অনুপভোগ্য এক জঞ্জালপুঞ্জ...।' (৪৫)

৯) '... মুকারোভ্‌স্কি, যিনি তাঁর ... বইতে খুলে দিয়েছিলেন নতুন সুন্দরের প্রমূল্যায়নের ক্রান্তিদ্বার।' (৪৮)

১০) 'একদা-কীর্তিত সাহিত্যের অভিঘাত আগলে-আবজে রাখার সমস্যা নিয়ে দুর্ভাবিত গ্যোয়েটেকেও বলতে হয়েছে, ...' (৭৯)

১১) '... কোনো-কোনো ছবির গায়ে দর্শকের অসংখ্য দৃষ্টির দাগ লেগে থাকে।' (৭৯)

১২) 'রবীন্দ্রসৃষ্টি ও তাঁর বিগ্রহের গায়ে এভাবেই যে-সব দৃষ্টি-দাগ লেগে আছে তাদের ভিতরেও কি তাঁকে নিয়ে আমাদের অভ্যস্ত একটি মনোবৃত্তির সংরক্ষণশীলতা ধরা পড়ে নি?' (৭৯)

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

১৩) '... গত শতকের ক্রান্তিক্ষণে ঝড়তুফানের মধ্যেও কেউ কেউ আত্মস্থতার আর্তিতে দান্তের দিকে তাকিয়ে বিবেকের তানপুরা বেঁধে নিচ্ছিলেন।' (দান্তে ও আমাদের আত্মপ্রতিকৃতি, ৫)

আ] কেবল অভিনব শব্দযোজনই নয়, বাক্যে আমদানিকৃত শব্দাবলির মধ্যে সুষম আন্বয়িক সাযুজ্য রক্ষার্থে শব্দের মধ্যে সমধ্বনির অভিনব পুনরাবৃত্তিও ঘটিয়েছেন বারে বারে। এমন সচেষ্ট প্রয়াস তাঁর প্রতি গদ্যরচনার অন্যতম সম্পদ। এখানে সামান্য কিছু দৃষ্টান্তের খোঁজ দেওয়া গেল 'সুন্দরের অভ্যর্থনা'

১৪) '... বিমূঢ় উপলব্ধির বীক্ষাই নয়, অন্তর্গূঢ় উপকথনের এই ডৌল...।' (২১)

১৫) '... এই কান্না-পাওয়া খিন্ন সময়কালের দিকে...।' (২৬)

১৬) ''গলির পর গলি' পার হয়ে উৎকেন্দ্রিক উৎপল তখন ফিরে আসে রবীন্দ্র সদনের সান্দ্র চিরায়তনে।' (৩২)

১৭) 'অবশ্য 'স্বাবলম্বিতা'র অর্থ তো সমীপ সময় থেকে স্বনির্বাস নয়।' (৪৪)

১৮) ''... স্বরচিত সৃষ্টির প্রোটোকল দিয়ে-যাওয়াও স্রষ্টার অবশ্যম্ভাবী দায়কাজ নয়।' (৬৩)

১৯) 'সুধীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত অলংকারশাস্ত্রে দস্তুরমতো প্রস্তুত সুসজ্জিত শব্দশিল্পী, ...' (৭৫)

২০) 'নামের নেশা থেকেই নামসংকীর্তন, নির্জন থেকেই জনাকীর্ণ হয়ে ওঠা। তাই ভক্তিরসের কবিতা সাংকেতিক হলেও সার্বজনিক।' (ভক্তিরসের কবিতা, শিল্পিত স্বভাব, ১৬৬)

২১) '... অজস্রবার অবহেলায় অতি-ব্যবহারে অথবা অপপ্রয়োগে সে-সব নষ্ট ক'রে ফেলতেও তিনি সক্ষম...।' (ঐ, ১৬৯)

ই] প্রচলিত শব্দ সরিয়ে স্বল্প চেনা শব্দ-ব্যবহার বা শব্দ নির্মাণ তাঁর অপর কৌশল। প্রাবন্ধিকের বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে এরকমই কিছু দৃষ্টান্ত :

প্রকৃত অর্থ	অলোকরঞ্জনের ব্যবহৃত শব্দ
নিশ্চিত অর্থে	নিশ্চিতিভাবে বলা (বিপরীত অর্থে অনিশ্চিতির প্রশ্রয়)
ক্রমে ম্লান হয়ে আসা	ম্লানায়মান
আশ্রয়হীনতা	অনাশ্রয়িতা
মাধুর্যমণ্ডিত	অমিয়শীলিত
কারাগার	কারায়তন

প্রকৃত অর্থ	অলোকরঞ্জনের ব্যবহৃত শব্দ
আকাঙ্ক্ষা	উৎকাঙ্ক্ষা
ধরন	ঠাম (সর্বত্র ব্যবহৃত)
নীরব	অরব
প্রকৃত অর্থ	অলোকরঞ্জনের ব্যবহৃত শব্দ
আকার	ডৌল
নশ্বর নয়	অনশ্বর
আচ্ছন্ন	ছন্ন
তুলনা করা	তুলনায়ন (তুলনায়িত)
বয়সের ভারে ন্যুব্জ	বয়োভারানত
প্রাণশক্তি	প্রাণনা
সত্য কথন, সত্যদ্রষ্টা	ঋতকথন, ঋতদর্শী
গর্হিত	গর্হণীয়
পরাভূত	নির্জিত
তত্ত্ব দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়	অতত্ত্বলাঞ্ছিত
সজ্জিত	আতত
শারদীয় আবহ	শারদীয়তা
একটি বিষয় অপসারিত করে সেই স্থানে অপর একটি বিষয় আনয়নার্থে	আলঠে
অন্তঃস্থিত	ফল্গুশায়ী
স্রোতের ন্যায় চলমান	স্রোতশ্চল
উন্মূলিত	উচ্ছ্রিত
দ্ব্যর্থহীন	অদ্ব্যর্থক
অবচেতন	অবমানস
আক্ষরিক	আক্ষর
সজাগ	জাগর
বিদ্রোহের প্রতিবিম্ব-ধারক	দ্রোহদর্পণ
পরিমিত সীমা	সীমাসুমিতি
ঋজু নয়	অনৃজু

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

প্রকৃত অর্থ	অলোকরঞ্জনের ব্যবহৃত শব্দ
ধারা বহন ও রক্ষণকারী	ধারারক্ষী
শুভ ও সুন্দরের সমন্বয়	শুভৈক সুন্দর
অন্তরায়ের আধিক্য	অর্গলকীলক

ঈ) মাতৃভাষাকে ঋদ্ধ করার তাগিদে বিভিন্ন বিদেশি পারিভাষিক শব্দ যেভাবে তর্জমা করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য :

■ 'সুন্দরের অভ্যর্থনা' থেকে

Wisdom Anthology প্রজ্ঞাচয়নিকা, Book review — গ্রন্থবীক্ষণ,
Cognito confuse -- ছড়ানো-ছিটানো সংবিৎ, A priori— প্রাঙ্নির্ণীত,
A posteriori— উত্তর-মীমাংসাজাত, Allusion—পূর্বোল্লেখ,
Empiricism—ক্ষণসাম্প্রতপন্থা

■ 'শিল্পিত স্বভাব' থেকে

Sublimation শান্তায়ন, Objective correlative— বস্তু-বিভাব অথবা ছদ্মপ্রচ্ছদ,
Anti-self অনাত্ম-অহং, Lyricism— গীতি-আতুরতা,
Motif এষণা, Essence আত্মতা,
Communication—সাযুজ্য, প্রভৃতি।

উ] বাক্যে যখন বিশেষণ পদের আয়োজন করেন তখন সেখানেও ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টা সহজেই চোখে পড়বে পাঠকের। এমনই কিছু বিশেষণ প্রয়োগের (নিম্নরেখাঙ্কিত) দৃষ্টান্ত

'সুন্দরের অভ্যর্থনা' থেকে, বন্ধনীমধ্যে পৃষ্ঠানির্দেশ

আগ্রহী স্তব্ধতা (বিভাব অংশ), (কেজো তথ্য অর্থে) নিরঞ্জন তথ্য (৫), (নিজে উপযাচক হয়ে) স্বযাচিত প্রতিনিধি হিসেবে (৫), নির্জিত প্রতিনিধি (৭), মনোরম্য বিভ্রান্তিক ধ্রুপদী উদাহরণ (১৩), নাছোড় কৌতূহল (১৯), স্টাইলাইজড বিপর্যাস (২০), নিজের-মতো-ভাঙানো রবীন্দ্রনাথ (২৪), শান্তিনিকেতনের নাক-উঁচু বিদ্যাভবনের অধ্যাপক মহল (২৬), উন্মোচন-সংবাদ (২৭), শক্তিমন্ত লাবণ্য (২৭), এখনো-না ফিরতে-থাকা-জেলে (২৭), প্রতীক-মাত্র-নয় গাঙচিল (২৭), যুগজাগর কথাশিল্পী (৩১), নক্ত পরিক্রমণ (৩২), এখনো-প্রায়-রম্য পুরুষ (৪২), অতত্ত্বলাঞ্ছিত স্বরায়ণ (৪৭), মনোহীন সংবর্ধনা (৮২), ইত্যাদি।

■ 'শিল্পিত স্বভাব' থেকে

অতৃপ্ত, আত্মবিব্রত, সংগ্রামলাঞ্ছিত মন (২), অভিনীত বিনয় (৫), সহানুভব-সেতু (৮), সদুক্তিতৃপ্ত লেখক (১৩), বক্রোক্তিজীবিত কবিতা (১৩), কার্বন তর্জমা (১৫৩), মৌহূর্তিক সৌভাগ্য (১৬০), সমাজশোধনী প্রবণতা (১৬১), ইত্যাদি।

■ 'আড়ভাবুকের কড়চা' থেকে

দ্বৈপ অবকাশযাপন, নাছোড় বিশ্বনাগরিক সহ শব্দাদি।

এখানে লক্ষণীয়, একদিকে যেমন একক শব্দ অথবা দুই বা ততোধিক শব্দেরা পৃথক-পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে এসেছে বিশেষিত করার তাগিদে, অন্যদিকে তেমনি একটি সমাসবদ্ধ পদও হাইফেন-সহযোগে নির্দ্বিধায় হাজিরা দিতে পেরেছে। কোথাও আছে চেনা শব্দেরা আবার কোথাও কবি-প্রাবন্ধিকের গড়ে তোলা শব্দেরা স্বমহিমায় উজ্জ্বল বিশেষণের ভূমিকায়। এভাবেই বিশেষ্য পদের ঔজ্জ্বল্য বেড়ে গেছে কয়েক মাত্রায়।

ঊ] শব্দ নিয়ে খেলার আর একটি কৌশল একই বাক্যে পাশাপাশি দুটি বিপরীতার্থক শব্দ বসিয়ে দুয়ে মিলে বিশেষ ব্যঞ্জনার আবহ তৈরি করা। এমনই কিছু অদ্ভুত মুনশিয়ানার নিদর্শন রইল এখানে

■ 'সুন্দরের অভ্যর্থনা' থেকে

২২) '... তা নিয়ে সহজাত কোনো যাতনা ঐ সুপ্রসন্ন তত্ত্বদর্শিতায় ফুটে ওঠে নি।' (৬৩)

■ 'শিল্পিত স্বভাব' থেকে

২৩) ম্যাকবেথ অনুবাদ প্রসঙ্গে, 'গিরিশচন্দ্রের আগে থেকে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন প্রচেষ্টা পর্যন্ত কালক্রমিক একটা সংখ্যালেখ্য অনুসরণ করলে দেখা যাবে অসংখ্য : হরলাল রায়, তারকনাথ মুখোপাধ্যায় কিংবা নগেন্দ্রনাথ বসুর শ্রমসাধ্য অথচ শ্রদ্ধেয় ব্যর্থতা ঐ নাটকখানিকে ঘিরে পুঞ্জীভূত হয়েছে।' (শেক্সপীয়র ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ১৪)

২৪) '... যে কোনো প্রচলিত তত্ত্ব কিংবা বক্তব্য দিয়ে দর্শককে 'শিক্ষিত' করার চেয়ে তার সঙ্গে একটি সমগ্র মঞ্চে দাঁড়িয়ে সমবেত একাকিত্ব সত্ত্বেও একযোগে অনধীত জীবননিয়তির সতীর্থ শিক্ষার্থী হতে পারাই যথার্থ গৌরবের।' (শ্রোতৃসাযুজ্য, ১৭৯)

ঋ] বাক্যে তৎসম শব্দের আয়োজন একটু বেশিই নজর কাড়ে। সারি দিয়ে এমনভাবে তারা আন্বয়িক সংগঠন তৈরি করে যা বোধগম্য হওয়ার জন্য পাঠকের মনোযোগে বাড়তি ভাগ বসাতে চায়, উপরন্তু আমরা অলোকরঞ্জনের গদ্য scan করার গুণসম্পন্ন বলে যে দাবি করেছি তারও একটা নজির নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলি

■ 'সুন্দরের অভ্যর্থনা' থেকে

২৫) '... ঐতিহাসিক বিবেকের স্বাভিমানে/সংবেদনশীলিত ঐ ভাবুকদের কাছে/আমি তখন রক্তকরবী থেকে/ পারম্পর্যের পরোয়া না করে/একটির পর একটি চূড়ান্তিক চিত্রকল্প/তুলে ধরে দেখাতে থাকি...' (৫৭)

২৬) 'তার মানে/এই নয় যে/উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত/সুন্দরের প্রতীতি/রূপান্তরণের জন্য/অপেক্ষমাণ হয়ে থাকে।' (৬৬)

■ 'শিল্পিত স্বভাব' থেকে

২৭) 'সন্দেহ নেই,/মধুসূদনের দ্রঢ়িষ্ঠ নৈরাশ্য/উদীয়মান উত্তরসূরীর হাতে/অবারিত বিষাদ/ও প্রার্থিত আশাবাদের/ মিশ্রণে পরিণত হয়েছে।' (দান্তে ও আমাদের আত্মপ্রতিকৃতি, ৭)

২৮) '...তাঁর অভীষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত অলঙ্কৃতি/অথবা সমুচ্চকথনের কম্বুকণ্ঠও/ শেক্সপীয়রের মধ্যেই আছে,/তার সন্ধানে অন্যতর স্রষ্টার কাছে/যেতে হয় না।' (শেক্সপীয়র ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ১৪)

২৯) 'শিল্প সত্য এবং অসত্যের সমাহার,/জাগরণ ও সুপ্তি,/চেতনা এবং ইন্দ্রজালের/অন্বিত সম্মোহন।' (ঐ, ২৩)

৩০) 'চতুর্দিক থেকে সংরুদ্ধ/মনুষ্যনিয়তিকে এখানে/যে আজানু উপাসনাসঙ্গীতে /পরিণত করা হয়েছে,/জীবনানন্দ কঠিনের সেই/অনন্য কোমলীকরণকে/স্পৃশ্যত তাঁর উপর্যুক্ত বিবর্তনে/তুলে নিয়েছেন।' (ঐ, ২৫)

৩১) '... চিরায়ত আভিজাত্যে/সুদূর ও গরীয়ান/সেই ছন্দোময় হর্ম্য/আমাদের নন্দনসম্বিৎ জাগিয়েও/আমাদের স্বেদাক্ত/প্রাত্যহিক সমতল থেকে/ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থাকে।' (তোমার সৃষ্টির পথ, ১২৫)

তিনি নিঃসন্দেহে অবগত ছিলেন, পাঠক তাঁর গদ্যের দুরূহতা সম্পর্কে জ্ঞাত। তবে তাঁর বক্তব্য, 'ভাষা নিয়ে পরীক্ষার ব্যাপারটা থাকবেই। আমি যখন বাংলাতে কথা বলছি, আমি তো শিক্ষকও, চেষ্টা করছি একটা কথাকে বুঝিয়ে বলতে — সেটা যে অবোধ্য থেকে যাবে তা হয়তো নয়। অন্তত একটা-দুটো রণন লোকের কাছে পৌঁছে যাবে।'[৬] অবশ্যই নির্দিষ্ট পাঠকশ্রেণীর কাছে পৌঁছেছে এবং ভবিষ্যতেও পৌঁছবে তাঁর এই ঘরানার গদ্য, সংখ্যা-নির্দিষ্ট হলেও সেই পাঠকগোষ্ঠী স্বচেষ্টা এবং অলোকরঞ্জনের গদ্যশৈলীর চর্চাবলে রণিত হয়েছে ও হতে থাকবে।

এ] বাক্যের অন্বয়ে বাংলা শব্দের পাশে অবলীলায় বিদেশি শব্দের উপস্থিতি ঘটিয়ে

দিয়েছেন প্রাবন্ধিক, আর সেইসব শব্দেরাও বিনা প্রতিবাদে বাংলা বাক্যের শরীরে অর্থবোধকতা নিয়ে হাজির থেকেছে, যেমন

■ **‘সুন্দরের অভ্যর্থনা’ থেকে**

৩২) ‘... নিজের গড়া যুক্তিবাদের যাবতীয় কন্ট্যুর নিভিয়ে দিয়ে তিনি বলে উঠবেন কেন...’ (১২)

৩৩) ‘সঙ্গে-সঙ্গে স্বভাবসুলভ গূঢ় স্নবারির আভিজাত্য গোপন না করেই লিখতে পারলেন...’ (১৩)

৩৪) ‘আমার নাঈভ প্রশ্ন তিনি সুভদ্র সৌকর্যে সেদিন এড়িয়েই গিয়েছিলেন।’(১৯)

৩৫) ‘... প্রতীপ শিবিরের দস্তুরমতো সফিস্টিকেটেড বুদ্ধিজীবী বিষ্ণু দে...।’ (৩১)

৩৬) ‘... রবীন্দ্রনাথের আনন্দলোকে ও মঙ্গলালোকের কাছে নিঃশর্ত একরারনামা লিখে দিতে হয়েছিল।’ (৩১)

ঐ] বাক্যে নির্দিষ্ট অর্থের বিকল্প ক্রিয়াপদ বেছে নেওয়া অথবা ক্রিয়াপদের সজ্জা-বিন্যাস নজর টানে,

■ **‘সুন্দরের অভ্যর্থনা’ থেকে**

৩৭) ‘এই অর্থেই আমাদের বিভাব-কবিতাটি একটু বিছিয়ে দেখা যেতে পারে।’(৪)

৩৮) ‘বহিঃশরীরী সামঞ্জস্যের ধারণার উপর ভর করেই সৃষ্টির সুন্দর আকারিত হয়েছে।’(৯)

৩৯) ‘তবু কথাটাকে আরও একটু বিছিয়ে দেখা যেতে পারে।’ (৫৫)

৪০) ‘এই মূল্যাঙ্কনে রবীন্দ্ররচনার বড়ো একটা অংশই যাচাই করে নেওয়ার সময় চলে এসে গেছে।’ (৭৯)

৪১) ‘এইসব বিচ্ছুরিত সমারোহের মধ্যে থেকে থেকে আছে ভাবগত ছন্দপতন...।’ (দান্তে ও আমাদের আত্মপ্রতিকৃতি, শিল্পিত স্বভাব, ১০)

বামনাচার্যের অনুসরণে তিনি বিশ্বাস করতেন ‘কীরকম গদ্য কবি লেখেন তা থেকেই বোঝা যাবে তিনি কেমন কবিতা লেখেন’[৭], তাঁর গদ্য ও ছন্দের মধ্যে একটা সেতু তৈরি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি কবিতার ছন্দেও স্বাধীনতা নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। আমরা এখানে তাঁর কবিতার আলোচনা করছি না, তবে পাঠক অলোকরঞ্জনের কবিতা ও গদ্যরচনা মিলিয়ে পড়লে অনুভব করবেন আর সেই সূত্রেই তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ পরস্পরের নৈকট্য অনুভব করেছে। আমরাও পেয়ে যাই তাঁর গদ্যের অপর বৈশিষ্ট্যটি।

ও] কবি-প্রাবন্ধিকের কলমে গভীর ভাবনাবাহক বাক্যেরা অনায়াসে সেজে ওঠে কাব্যিক-অন্বয়ে :

■ **‘সুন্দরের অভ্যর্থনা’ থেকে**

৪২) ‘কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-অভিপ্রায় কি নয় রূপ ও নিহিতার্থের তুলকালাম সামঞ্জস্য? (৫৩)

৪৩) ‘নেপথ্যলোক এবং নন্দিনীর টানাপোড়েনেই থরথর করে হাইডেগার-বর্ণিত বল্লমের চূড়োয়, না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে রেখায়-লেখায় থিরথিরিয়ে কাঁপতে থাকে রবীন্দ্রনাথের উত্তর-আধুনিকতা।’ (৫৭)

৪৪) ‘এক-একটি সময় উদ্‌যাপিত সৌন্দর্যের প্রহর মূর্তিগুলির একটি কণাও নষ্ট হয়ে যায় না, মায়ামুকুরের মধ্যস্থতায় অদৃষ্টের অবজ্ঞাকে তুচ্ছ করে ফিরে আসে মানুষের মুখমণ্ডলে, ...’ (৬১)

৪৫) ‘আমি তাই রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত ঐ মঙ্গলসূত্রের কাছে অধমর্ণ থাকি এবং তারই সহায়তায় তাঁর সৃজনধারার একটি তরঙ্গের উপর স্থাপিত বাতিঘর থেকে একটি রশ্মি আহরণ করে আলোকপাতের দুঃসাহসে মগ্ন থাকি কিছুক্ষণ।’ (৬৩)

৪৬) ‘... পরিচিত তথ্যের অরণ্য থেকে সরে আসি অপরিচয়ের পরিচর্যায়।’ (৬৩)

■ **‘শিল্পিত স্বভাব’** —

৪৭) ‘... গ্রেহাম গ্রীন, তাঁর নায়ককে চরম দুর্যোগে, নীরন্ধ্রকলুষ রাত্রে দুটি মোমের মধ্যবর্তী একটি অব্যক্ত নিরঞ্জন মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করালেন।’ (ভক্তিরসের কবিতা, ১৫৯)

৪৮) ‘... সাধারণ মানুষের একটি স্নায়ব বোধি রয়েছে, কেননা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সে তার স্বেদরক্তের প্রত্যক্ষতা দিয়ে ছুঁয়ে আছে। জীবনযুদ্ধ অথবা যুদ্ধ বিষয়ে নিকটতম প্রতিক্রিয়া তার হৃদয়েই ঘটে। সাধারণ মানুষ এই কারণে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় যে তার কাছে যথ যথ অনুভূতিগুলি পাওয়া যাবে —যে-স্বাভাবিক ঝর্ণাতলায় বারংবার ঘট ভ’রে নিতে আসতে হবে কবি, কথাশিল্পী, পটুয়া, অভিনেতা-অভিনেত্রী, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক নেতা এবং আর সবাইকেই। যদি ঐ আবহমান উৎস থেকে জল ভ’রে নেওয়ার কাজে কখনো অবসাদ আসে তবে সেটা গভীর দুর্ভাবনার বিষয়। তখনি প্রশ্ন জাগে, জল কি ফুরিয়ে এল, নাকি ঘটের ভিতরেই ঘুণ ধরেছে? কিন্তু জল কি কখনই ফুরিয়ে আসে?’ (ভক্তিরসের কবিতা, ১৬৮)

৪৯) ‘দায়িত্ববোধ চৈতন্যেরই নামান্তর, সেই বোধ পরিবেশের কাছে হোক না যতোই অবান্তর।’ (ঐ, ১৭১)

ঔ] সুগভীর ব্যঞ্জনাবাহী প্রবন্ধে কিছু বাক্যগুচ্ছ কবিতা ছাড়া আর কী?

৫০) ‘... মানুষীরা যখন মধ্যরাত্রে হংসবলাকায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, রূপান্ধ রাজকুমার সিগফ্রিড শুভ্র সুকুমারী ওদেৎ ও অসিতহংসী ছলনাময়ী ওদিল অর্থাৎ সত্যিকারের এবং

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের মধ্যে প্রথমত শেষোক্তকেই বেছে নেয় এবং শেষে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়ে অনাদি সুন্দরের দিকে ফিরতে চায়।' (সুন্দরের অভ্যর্থনা, ৬৪)

৫১) '...বাংলাদেশের কাব্য সমীক্ষায় শেক্সপীয়ের প্রতিফলন ঘটেনি, প্রতিসরণ ফ'লে উঠেছে স্বগত-হৃদয়ের শুদ্ধ অথবা শ্যামচ্ছায়াসান্দ্র অনুরূপ কোনো ঘিরে-রাখা জলাধারে।' (শেক্সপীয়র ও আধুনিক বাংলা কাব্যজিজ্ঞাসা, ১৩)

৫২) 'আমাদের চতুষ্পার্শ্বে সুন্দরের ললিত পুষ্পল ধারণাগুলি আরো অনেক শিকড়স্পর্শী, অপর্ণ ও সত্যতর হয়ে ওঠে।' (ভক্তিরসের কবিতা, ১৭০)

৫৩) 'ইন্দ্রিয়ের পরাগে পরাগে ঘ্রাণ স্পর্শ স্মৃতি শব্দের মিলিত মন্দিরায় যে-দেশের নাম হৃদয়ে হৃদয়ে বেজে রয়েছে তাকে আজ আর অন্যভাবে বাইরে থেকে উদ্রিক্ত করা অনৈতিহাসিক।' (ঐ, ১৭২)

৫৪) 'স্মার্টফোনের দৌলতে নিঃশর্ত সৃজনী সংলাপের সেই ঐতিহ্য অধুনা পরিলুপ্ত।' (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রয়াণে কালিও কলম—এ শ্রদ্ধাঞ্জলি; সেতু পুরুষের মৃত্যু - অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, জানুয়ারি ১৭, ২০১৯)

৫৫) 'যন্ত্রণার সমাচার কখনই তিনি চিৎকার করে শোনাননি। এমনকি অস্তিত্বের উন্মত্ততাতেও তিনি জুড়ে দেন নরম ডানা।' ('আড়ভাবুকের কড়চা' (গেয়র্গ ট্রাক্ল্ স্মরণে)— অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কালি ও কলম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যা, নবম বর্ষ; প্রথম সংখ্যা; ফাল্গুন ১৪১৮)

৫৬) 'ওই আলোকের ওপরেই তিনি বুলিয়ে দিয়েছেন সুভদ্র শিল্পী-স্বভাবের নম্র নীল রং।' (ঐ)

৫৭) 'চোখের ওপর প্রিয়তম পরিপার্শ্বগুলি এভাবে পালটে যেতে থাকলে পুরোনো সেই দিনের কথা ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য এখনকার কবি কিংবা কথাশিল্পীর দ্বারস্থ হতে হয় আমাদের।' (ঐ)

৫৮) 'দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সে নিঃশর্ত পরিব্রজনের প্রক্রিয়ায়, কখনো রেস্তোরাঁয় প্লেট ধুয়ে, কখনো-বা এলোমেলো শিক্ষকতা কিংবা বইয়ের দোকানে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে, আচমকা খুলে গেল লেখালেখির নির্ঝর।' (ঐ, জর্জ অরওয়েল স্মরণে)

এছাড়াও অলোকরঞ্জনের প্রবন্ধে চোখে পড়বে কিছু অন্যরকম জোড়কলম শব্দ, তার থেকে কয়েকটি এখানে তুলে দেওয়া গেল--

বই-রিভিয়ু, আইকন-সর্বস্বতা, ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিকতা ইত্যাদি।

যিনি ভাবতে পারেন, 'ভাষাটাই আমার দেশ, আমি ভাষার শ্রমিক। আমি আমার নিজের ভাষা তৈরি করে নিতে চাই। ... আমার কবিতার উৎস, এই নিবিড় মাতৃভাষাটি'[৮]

তিনি তো তাঁর সৃষ্টির ধারক ভাষাটিকে বহুযত্নে ঋদ্ধ করার কথাই ভাববেন, তা ভেবেওছেন। আর তাই তাঁর দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারের কথা স্মরণে থাকে। যিনি বলেছিলেন, 'ভাষাই আমার প্রকৃত আবাসন।'[৯] আর একথা আত্মস্থ করেছিলেন বলেই অলোকরঞ্জন বলতে পেরেছিলেন, 'প্রবাসে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি এই আবাসন অটুট রাখার এবং এই আবাসনের উৎস থেকেই উৎসারিত হয় আমার কবিতা। হয়তো একটা বিনীত অহমিকাও কাজ করছে, কারণ ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমার প্রয়াসের কোনও কমতি নেই।'১০

আমরাও তাঁর বিভিন্ন গদ্যরচনা পড়তে পড়তে এই সারকথা বুঝেছি যে, সত্যই তিনি সদা সতর্ক ছিলেন ভাষা-ব্যবহারে। এক স্বকীয় শৈলী তৈরি করে নিয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টির। আর সেই পথে কবি এবং প্রাবন্ধিকের উন্মুক্ত যাতায়াত চলেছে অনিবার। বাঙালির মুখে বাংলা ভাষা নেই, 'না-ভাষা' অনেকাংশেই দখল করেছে তাকে। অলোকরঞ্জনের নিপুণ পর্যবেক্ষণ, শপিংমল হওয়ার পর বাঙালি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তার দরকারের জিনিসটা কিনে নিচ্ছে, তাই 'ভাষায় আর বাঙালি কথা বলছে না।'[১১]এই ক্রাইসিসের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, '... আমি আমার আজন্ম-অর্জিত ভাষার পক্ষে লড়াই করে গেছি।'[১২]

'আজন্ম-অর্জিত'-ই বটে। পাঠক তাঁর গদ্যরচনার আদ্যোপান্ত এলাকায় এই অর্জন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুস্পষ্ট ছাপ খুঁজে পাবে। প্রতিটি শব্দচয়নের আড়ালে প্রাবন্ধিকের জহুরি চোখ নজরে পড়বে। প্রবন্ধের প্রাঙ্গণ তাকে অচিরেই নিয়ে যাবে কবিতার ভুবনে। পাঠককে তাঁর গদ্যের আঙিনায় আমন্ত্রণ জানিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে বসিয়ে রাজকীয় ভোজের আয়োজন রেখে গেছেন প্রাবন্ধিক। এখন প্রয়োজন সসম্মানে সেই আয়োজনের যথাযথ সঙ্গী হয়ে ওঠা। আজ বিশ্বায়নে বুঁদ বাঙালি কীভাবে অলোকরঞ্জনকে স্মরণে রাখবে সে-প্রশ্নের উত্তর সময় দেবে।

উল্লেখসূত্র

১। বিভাব, সুন্দরের অভ্যর্থনা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৭।

২। 'একদিন কবিতায় কবিদের নাম থাকবে না — পাঠককে চিনে নিতে হবে', সাক্ষাৎকার গ্রহণ দীপকরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালি ও কলম, এপ্রিল ৪, ২০১৬।

৩। তদেব।

৪। তদেব।

৫। অলোকরঞ্জন বিশ্বাসী ছিলেন কবিতার সীমা প্রসারিত করায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১ নভেম্বর ২০২০ আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

৬। ২-নং সূত্র দ্রষ্টব্য।

৭। ২০১৫ সালে শুভরঞ্জন দাশগুপ্তের নেওয়া সাক্ষৎকার, ১৮ নভেম্বর ২০২০-তে 'এই সময়' পত্রিকায় প্রকাশিত।

৮। তদেব।

৯। তদেব।

১০। তদেব।

১১। ২-নং সূত্র দ্রষ্টব্য।

১২। তদেব।

গ্রন্থ ও পত্রিকাঋণ

১। সুন্দরের অভ্যর্থনা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৭।

২। শিল্পিত স্বভাব, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৯৫৯।

৩। 'আড়ভাবুকের কড়চা', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কালি ও কলম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যা, নবম বর্ষ; প্রথম সংখ্যা; ফাল্গুন ১৪১৮।

৪। 'একদিন কবিতায় কবিদের নাম থাকবে না — পাঠককে চিনে নিতে হবে', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত-র সাক্ষাৎকার গ্রহণে দীপকরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালি ও কলম, এপ্রিল ৪, ২০১৬।

৫। ২০১৫ সালে শুভরঞ্জন দাশগুপ্তের নেওয়া সাক্ষৎকার, 'এই সময়' পত্রিকা। ১৮ নভেম্বর ২০২০।

৬। আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন। ২১ নভেম্বর ২০২০।

৭। দৃষ্টান্ত সমূহে নিম্নরেখাঙ্কন বর্তমান আলোচককৃত।

৮। দৃষ্টান্তে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি ও শব্দাবলির বানান অপরিবর্তিত।

অলোকরঞ্জনের বাঁশি

অভীক মজুমদার

স্বাধীনতার ব্যাপারটা ঐ
প্রেমের মতোই
ভাগ্য আবার বছর বছর পরে
নিরুদ্ধ আলমারি থেকে আমায় মুক্ত করে

স্বাধীনতার ব্যাপারটা ঐ
ভালোবাসার মতোই অথৈ
এবং যাকে প্রেম বলি তা
বলতে গেলে স্বাধীনতাই'

১

এরিশ ফ্রীড-এর এই কবিতাটি অনুবাদ করেছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০) 'শান্তি আন্দোলনে কবিতার প্রয়োগ' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্বিতীয় ভুবন' নামক একটি সংকলনে ১৯৯১ সালে। সেই প্রবন্ধটি জুড়ে ছিল জার্মানির তৎকালীন ছাত্রসমাজের রাষ্ট্রনিষ্পেশন বিরোধী আন্দোলন। আজ এতদিন পর আমি সেই কবিতাটির দিকে তাকিয়ে ভাবি, আজকের ভারতবর্ষে এই কাব্যউচ্চারণ যেন সবথেকে প্রাসঙ্গিক। এই প্রবন্ধে কয়েকটি বাক্য লিখেছিলেন অলোকরঞ্জন, 'শান্তি আন্দোলনের অগ্রণী ভাবুকেরা তাই এমনকি তথাকথিত ধর্মীয় সাহিত্যেও রাজনীতির উপাদান খুঁজেছেন। এই কাজটি ইয়োরোপে ততটা সহজ নয়। আমাদের দেশের ভক্তিসাহিত্যেই বরং প্রথাতিশায়ী বিপ্লবী মনের প্রত্যক্ষ পরিচয় নিবিড়তর।' লক্ষ করার বিষয়, আন্তর্জাতিক একটি আন্দোলনের পরিচয় যেমন পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন অলোকরঞ্জন তার গান, কবিতা, নাটককে তর্জমায় পরিবেশন করছেন, অন্যদিকে ঐ আন্দোলনের ভাষ্য রচনা করছেন ভারতীয় সাহিত্য কিংবা বাংলা সাহিত্যের নিরিখে। প্রবাসী অলোকরঞ্জনের এই নিরন্তর প্রযত্নগুলি আজীবন জাগরূক ছিল। বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই জাগরূক প্রযত্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যেন চাইছিলেন, পরিবর্তমান দুনিয়ার শিল্পসাহিত্য আন্দোলনের কথা সংস্কৃতি-রাজনীতির অভিমুখ এবং মোকাবিলার পরিপ্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের সচেতন রাখতে। পূর্বাপর তাঁর রচনাবলি এই অর্থে শুধু নিষ্ক্রমণমুখী তাই নয়, স্বদেশ স্বভূমির সঙ্গে নিরন্তর সংলাপে উৎসাহী। তাঁর বাঁশির সুরটি দেশজ কিন্তু তাতে ক্রমাগত ঢুকে পড়ে ভুবন তল্লাটের নানা বিচিত্র তরঙ্গ।

'রাখালিয়া গীতি হাতে নিয়ে ভার্জিল
সারা বিশ্বেরে শোনালেন সেই গান,
যমুনাপুলিনে কৃষ্ণের সম্মান
রাখালের হাতে গীতিকবিতার মিল।' (যে রাখাল দূরদেশী)

২

অলোকরঞ্জনের সাহিত্যসৃষ্টির দিকে তাকালে তিনটি মূলগত আয়তন নজরে আসে। প্রথমটি তার প্রবন্ধজগৎ, দ্বিতীয়টি তাঁর তর্জমার ক্ষেত্র। বলা চলে, এই দুইয়ের সঙ্গে নিরন্তর সংলাপে প্রদীপ্ত ভাস্বর হয় তার তৃতীয় নয়ন--- কবিতা।

বাংলা ভাষাসাহিত্যের ছাত্র অলোকরঞ্জন প্রথম যুগে অভিনিবিষ্ট মনোযোগে বাংলা এবং ভারতীয় সাহিত্যকে কেন্দ্রে রেখে নতুন নতুন আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। 'Lyric in Indian Poetry' (১৯৬২), 'বাংলা কবিতার ইতিহাস' (১৯৬৫), 'বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য' (আদি-মধ্যযুগ) (১৯৬৯) সেই দৃষ্টিকোণের প্রতিবিম্বন। এরই পাশাপাশি তিনি কবি আলোক সরকারের সঙ্গে প্রকাশ করেন অনুবাদ পুস্তিকা 'ভিনদেশী ফুল' (১৯৫৭) এবং কবি শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় বিশ্বকবিতার নির্ভরযোগ্য এক সংকলন 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত' (১৯৬৩)।

কবিতার জগতে মাটি আর আকাশ ধীরে ধীরে আত্মগত আর বিশ্বগত দুই মেরুকে সমন্বিত করতে উদ্যত হয়েছিল। 'যৌবনবাউল' (১৯৫৯) কাব্যগ্রন্থের 'নামখোদাই' কবিতাটি তার প্রথম স্বাক্ষর। 'এই যে ঘুমনিবিড় মাঠ, মুখরা এই নদী / আমাকে অনায়াসেই ভোলে যদি / এখানে গত একুশে আশ্বিন / শীর্ণ এক টিলায় সারাদিন / বাটালি দিয়ে যত্নে গাঁথলাম / ক্ষণপ্রাণ আমার ছোটো নাম।' হয়তো অনেকেই জানেন, একুশে আশ্বিন তারিখের তাৎপর্য। ওই তারিখ অলোকরঞ্জনের জন্মদিন। ৬ অক্টোবর। কিছুদিন পর, সেই কবিতায় বলছেন অলোকরঞ্জন, তিনি দেখলেন সে নাম মুছে গেছে। "সহসা শুনি / অনেকদূরে অনেক সাঁওতালি / মদের পর মাদলে মাতে খালি।/ পা টিপে টিপে সেখানে গিয়ে যখুনি দাঁড়ালাম, / এগিয়ে এসে শুধালো: 'তোর নাম?/ তাদের বুকে এ নাম বুনে বলেছি: 'ভুলবি নে'/ আমাকে আমি ভুলেছি এই একুশে আশ্বিনে।"

একে যদি মরমিয়া বাউলের মেধাবী নিষ্ক্রমণ চিহ্ন হিসেবেই দেখি, তাহলে কাব্যগ্রন্থগুলির পারম্পর্যে তারই বিস্তার লক্ষ করব। 'যৌবনবাউল' উৎসর্গ করা হয়েছিল ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে, 'নিষিদ্ধ কোজাগরী' উৎসর্গ করা হল নীহারিকা দাশগুপ্ত-কে এবং 'রক্তাক্ত ঝরোখা' (১৯৬৮)-র উৎসর্গ শঙ্খ ঘোষ কিন্তু ছৌকাবুকির মুখোশ' (১৯৭৩) এর উৎসর্গ ট্রুডবার্টা হেসলিডাঁর"। ঐ কাব্যগ্রন্থের সূচনাতেই আছে,

'তুমি এসো বার্লিনের দুই দিক থেকে

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

অবিভক্ত শাদা-কালো খঞ্জন আমার
ছৌকাবুকির ছদ্মবেশে
চূর্ণ করে দাও যতো অলীক সীমান্ত—' (মুক্তি)

এখানেও সেই বহুস্তরিক নিষ্ক্রমণের চিহ্ন। শুধু ভৌগোলিক বা তর্জমা করেন অলোকরঞ্জন। প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। সেই আন্তর্জাতিক সংকটের বিস্তারই নয়, ভালোবাসা আর স্বাধীনতার। আকাশকে বাংলার পাঠকের সামনে নতুন অঙ্গীকারে উপস্থাপিত করলেন কবি। নিশ্চয়ই পাঠকের মনে পড়ছে এরিশ ফ্রীড-এর সেই বাংলা তর্জমাটির কথা লক্ষ করতেই হবে, এই ছৌ-কাবুবির সমন্বয়ী কাব্যগ্রন্থের কবিতার নামটি 'মুক্তি'। আত্মগত থেকে বিশ্বগত উড়ান। শুধু তাই নয়, সাতের দশকের গোড়ায় বার্লিনের পাঁচিলকে 'অলীক' বলবার স্পর্ধা খুব বেশি কবির ছিল না।

'ছৌ-কাবুকির' মুখোশ নামকরণে অনেকে লক্ষ করেন 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর ছায়া। কিন্তু বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা যে এলিয়টের প্রবণতায় প্রাচ্য-পাশচাত্যের অনুসঙ্গ ব্যবহার করতেন তাকে 'মননঋদ্ধ' কাব্য-সংযোগ বলা চলে। তার টীকাভাষ্য একান্তই গ্রন্থমাত্রিক। অলোকরঞ্জন কিন্তু ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক (রাজনৈতিক) একটা বিশ্বমাত্রা বা বিশ্বপ্রেক্ষিত যোগ করলেন। তাকে কেৰল 'সাহিত্যিক' বলা ভুল হবে। তিনি ক্রমাগত পাঠককে বিশ্ব নাগরিকের নানা সংকট বিষয়ে সচেতন করতে চাইছিলেন। ইংরেজি মগ্ন, কফি হাউস অভিভূত, 'শিক্ষিত', মধ্যবিত্ত 'পাড়ের ময়না' বাঙালি পরিসরের আত্মকন্ডয়ন থেকে এই 'নিষ্ক্রমণ'।

৩

গ্যোয়টের মহাকাব্য 'প্রাটা প্রতীচীর মিলনবেলার পুঁথি' 'ভাষ্যসহ তর্জমা করেন অলোকরঞ্জন। প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। সেই পরিশ্রমী, একনিষ্ঠ অনুবাদ গ্রন্থের উৎসর্গপত্রটি আবারও ২০২০ সালে নতুন মাত্রায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। 'মৌলবাদের বিরুদ্ধে, প্রেমের সপক্ষে'। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী শোনান অলোকরঞ্জন। বছর পনেরো আগে এক শরৎ সন্ধ্যায় হাইডেলবার্গ ইকবালের নামাঙ্কিত সৈকত ধরে হাঁটছি এমন সময় এক তরুণযুগলের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। মেয়েটির জন্ম শহর লক্ষ্মৌ, ছেলেটির ভিয়েনা। ওরা শুধু ইকবাল-সৈকত দেখতেই এসেছে। হাতে ইকবালের উর্দু কবিতার বই 'পয়াম-ই মশরিক' (প্রাচ্যবাণী /১৯২৩), গ্যোয়টের দেশকালজয়ী 'প্রাচী প্রতীচীর দিভান' (West -oesticher Divan / ১৮১৯) কাব্যগ্রন্থের অনুরণিত সাড়া।

অল্প বিনিময়েই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে গেল। ওদের বাড়িতে ডেকে এনে গ্যোয়টের বইটি থেকে মুখে মুখে বেশ কিছু গীতিকবিতা তর্জমা করে শোনালাম। ...তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই ভেবেছি তাদের সম্মানে দিভান অনুবাদে হাত দেব।... তারপর একদিন শুনলাম পরিণয়ের মুখে এক দাঙ্গা মেটাতে গিয়ে ওরা প্রাণ দিয়েছে। --ওরা দুজন যে

এথনিক সাম্প্রদায়িক শিবিরতন্ত্রের শিকার হয়েছে; সেই বিষাক্ত মৌলবাদের বিরুদ্ধে গ্যোয়েটে তার এই বইতে থেকে-থেকেই অঙ্গীকারবদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়েছেন.... সেলিমা আর পিটার, লখনৌ আর ভিয়েনার তরুণ তরুণী এভাবেই গ্যোয়েটের বিশ্ববীক্ষা প্রাণিত ইকবালের বই বুকে করে, এক লহমায় নিজ-নিজ সংস্কৃতির খণ্ড ক্ষুদ্র মানচিত্র ডিঙিয়ে যেতে পেরেছিল। তাদের সনির্বন্ধ নির্দেশে সম্পন্ন এই অনুবাদকাজ উৎসর্গ করা হলো তাদেরই মতো দুঃসাহসিক অন্যান্য প্রেমিক প্রেমিকাকে।

খুবই উদ্‌বেগের সঙ্গে ভাবি, ২০২০ সালের ভারতবর্ষে এই ভূমিকাটি 'লাভ জিহাদ'-এর সমর্থনকারী হিসেবে কারারুদ্ধ না হয়।

অলোকরঞ্জন অবশ্য সে সম্ভাবনার পরিখা অতিক্রম করে সম্প্রতি বহুদুরে পৌঁছে গেছেন। আজ শুধু মনে হয়, পরিবর্তমান বিশ্বে ফ্যাসিবাদী ধর্মান্ধতা, এথনিক সাম্প্রদায়িক শক্তি, বিষাক্ত মৌলবাদ প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তিনি কবে থেকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯৯৩ সালের বিশ্বভারতী পত্রিকা নবপর্যায় ২ সংখ্যাটির কথা। সেখানে প্রকাশিত হয় অনোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনূদিত 'সারা কিশের কবিতা'। সেই টীকা-ভাষ্য পরিচিতি সংবলিত একগুচ্ছ তর্জমার প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জন লেখেন 'মনে রাখতে হবে, নারীর জাগৃতি ও শান্তি আন্দোলন সমসময়েরই দুই অভিক্ষেপ এবং এ দুয়ের জন্মসূত্রে একটি অচ্ছেদ্যতা রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য এই কীভাবে ঐতিহাসিক একটি তৃতীয় বলয় ঠিকরে বেরিয়ে আসে যার বর্ণিমা সবুজ, ইকলজিকন্দ্রিক রাজনীতি। যে প্রকৃতিকে পুরুষজতি এযাবৎ স্বার্থিক চাহিদায় নিংড়ে দিয়েছে, এই সমর্থক রাজনীতি তার বিরুদ্ধে সূচিত।' সারা কির্শ (জ. ১৯৩৫) -এর কবিতায় কেমনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে এইসব অবস্থান আর 'সবুজ সংগঠন' থেকে 'গ্রিন পিস' আন্দোলন সবই তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে বলেন। আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় কেন সারা কির্শ লেখেন এইসব

'দরজা খুলে দেখি একটা ঘর সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত
হাজার বছর জুড়ে সেই আয়োজন, যাকে নষ্ট না করলে আমরা
ভালোভাবে বাঁচতে পারতাম।
বিছানায় বসে জুতোজোড়া খুলে ফেলে ভাবতে বসি
সে সমস্ত জাহাজের কথা

যাদের ডানা আছে, যাদের পাখিগুলো কেবিন থেকে তীরের
দিকে ওড়ে—' (মস্ত বড়ো একটা বাড়ি)

এই নব অবস্থানগুলি, নব্য আন্দোলনগুলি, সেই নব্যভাবনাজাত কবিতা অলোকরঞ্জনের হাত ধরে আছড়ে পড়তে লাগল বাংলা কবিতার পাঠকবৃত্তে।

এরই মধ্যে, 'দ্বিতীয় ভুবন' প্রবন্ধসংকলনের একটি আত্মজৈবনিক গদ্যে তিনি বলেন,

'যখন অস্তিত্ব নিদারুণ বিপন্ন, কবিতার গায়ে শান্ত সবুজ; অতঃপর যখন জীবন মালঞ্চে ঘেরা সৌভাগ্য শান্ত হ্রদের মতো, আমার কবিতা হয়েছে জিঘাংসু, দ্বন্দ্ববিক্ষত, প্রশ্নাত।

সাহিত্যের ইতিহাস থেকে নো-নাটক আর কাবুকির মধ্যে বিপ্রতীপ ছন্দ দেখতে পেয়ে আমার স্বভাব খুশি হয়েছে; ১৫ শতকের রক্তসায়র থেকে নো-নাট্যগুচ্ছ জেগে উঠেছিল শ্বেতপদ্মের মতো; আর ১৭ শতকের শরৎপ্রতিম সময়ে কাবুকি ফুটে বেরিয়েছিল হত্যাহিংসুক সংঘর্ষ ফেনিল উত্তেজনা নিয়ে।

৪

এক অর্থে, বিশ্বপথিক এই কবির কবিতায় প্রসঙ্গক্রমে ঢুকে পড়ে গোটা ঘূর্ণায়মান ভুবনপরিসর। কত অনায়াস রূপদক্ষতায় তিনি বাজিয়ে তোলেন ছন্দ-মিলের চমকপ্রদ সুষমা, কত সাবলীল ভঙ্গিতে সেই ঝংকারে ব্যবহার করেন 'পেস্ত্রাইকা' থেকে 'পাপারাজি'র মতো হরেক শব্দ।

আমাদের মনে পড়তে পারে, ১৯৬৩ সালে সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত অলোকরঞ্জনের অনুবাদে 'আন্তিগোনে' নাটকটির কথা। জর্মন নাট্য পরিচালক হানস গুন্টার -হাইমের নির্দেশনায় কলকাতা ম্যাক্সমুলার ভবনের প্রযোজনার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল গির্জার পেছনে বিশাল শামিয়ানা টাঙিয়ে একমাস ধরে নাটকটির অভিনয় হয়েছিল। এই একই অলোকরঞ্জন অনুবাদ করেছেন 'সুরদাস' (১৯৮০)। সঞ্চয়িতা

বিচিত্র সুর এবং স্বরে অলোকরঞ্জনের বাঁশি বারংবার আমাদের অভিভূত করে। মানববিশ্বের স্বৈরাচারী শাসন, অমানবিক রাষ্ট্রদমন শরণার্থী জীবনের ভয়াবহ যন্ত্রণা, প্রান্তিক মানুষদের অসহায় আর্তি তাঁকে বারংবার আলোড়িত করেছে। ফরাসিরা যাকে বলেন 'অগাঁজে অর্থাৎ Engage বা প্রবৃত্ত হওয়া (বাংলা জুৎসই প্রতিশব্দ পাচ্ছি না), সেই তীব্র লিপ্ততায় তিনি এই বিশ্বকম্পনগুলির রেখাবিন্যাস ক্রমাগত বাংলায় আমদানি করে চলেন।

তাঁর নিজস্ব কাব্যসংস্থানে হয়তো সেজন্যই অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গ বুঝতে অনেকসময় থমকে যেতে হয়। বিষ্ণু দে-র উত্তরাধিকার অর্থাৎ বিশ্বসাহিত্যের বহুকৌণিক সমান্তর নির্মাণের প্রবণতা তিনি যেমন বহন করেন, অন্যদিকে আবার সুধীন্দ্রনাথের মতো নিরন্তর স্বদেশ-বিদেশ-সমকাল-পুরাণের নানা ঢেউকে কবিতায় আত্মস্থ করেন। রাজনীতি-সংস্কৃতি ছাত্র আন্দোলন কিছুই সেখানে অস্পৃশ্য থাকে না। কত নতুন অবয়ব যে মুহূর্তে মুহূর্তে ভেসে ওঠে।

'আফ্রিকার একটি মেয়ে বসে রয়েছে অসীম প্রান্তরে
আকাশ থেকে নীল
ঝরছিল তার নগ্ন উদার ক্রোড়ে
সবাইকে সে শরণ দেবে, যেসব মানুষ চূর্ণ চ্যর্নবিল

কিংবা যাদের এইডস নামান্তরে
তাদের নিয়ে যে নিজে এক শাখাপত্তন বোধিকল্পলতা
তাকে দেখার পরেও আমি অন্যরকম উত্তরণের কথা
ভাবলাম কী করে?" (রক্তমেঘের স্কন্ধপুরাণ ১৬)

এইসব অনুভূতি স্ফুলিঙ্গ ধারালো কেতনের মতো উড়তে দেখা যাবে 'শরণার্থীর ঋতু ও শিল্পভাবনা' (১৯৯৩) নিবন্ধগ্রন্থ জুড়ে। কবিতায় এখনো ফুল থাক, পাখিও থাকুক, থেকে যাক আরো অপরাপর পূর্বসংস্কার। কিন্তু সেইসঙ্গে তার মধ্যে যদি সদ্য-ঘটে যাওয়া প্রলয়ের পরিমণ্ডলে উচ্চার্য শোচনা যদি বিবেচিত না হয়, তাকে আমরা কোন অর্থে সময়সন্ধির কবিতা হিসেবে দীক্ষিত করব?'

'প্রমা' পত্রিকার একটি সংখ্যায় (জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯০) অলোকরঞ্জন 'সমবায়ী, শিল্পের গরজে' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে লেখেন। তার দু-তিনটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করব—

ক) আসলে গত শতকের সূচনা থেকেই শিল্পের প্রদেশগুলি এ ওর দিকে ঝুঁকে বিনিময়ের ভাষা খুঁজে চলেছে।

খ) ইম্প্রেশনিজম থেকে কিউবিজমের বিবর্তনে ছবি ও কবিতার দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের প্রয়াস যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে তার ফলে কবি ও চিত্রকরেরা ঘরানার দরজাগুলো ভাঙতে শুরু করেছেন।

(গ) কবিতার ইমেজ ও চলচ্চিত্রের চিত্রকল্প সম্মিলিত হলেই চেতনায় এরকম বৈপ্লবিক উদ্ভাসন হয়তো সম্ভব।

বোঝা যায়, তাঁর কবিতাও এমন বহু কল্পায়তনের ভাণ্ডার থেকে অনর্গল আকরিক সংগ্রহ করেছে। ফলে তাকে আস্বাদন করতে ইশারা-তরঙ্গ আত্মস্থ করতে হবে।

অলোকরঞ্জন খুব অল্পবয়সেই চোখ বাঁধানো রূপদক্ষতার শীর্ষ আয়ত্ত করেছিলেন। মরমিয়া বিমূর্ততা, অন্তরমহলের ভূকম্পন আর অতন্দ্র প্রকৃতিকে সময়কাঠামোর নানা কৌণিক বিন্যাসের সমান্তরে উপস্থাপনা সেই আঙ্গিক নৈপুণ্যে চমৎকার পরিবেশিত হত। পরবর্তী অভিযাত্রায় নতুন বিষয় নতুন মুহূর্ত তিনি অনবরত ধরে রাখতে চেয়েছেন কুশলী আধারে। সেই আততি বা Tension তাঁর কবিতার তন্ত্রীতে বেজে উঠেছে।

দেশ-বিদেশে বাসা আমার যখনই যাই আসি
হাতে আমার বেউড় বাঁশের বাঁশি
বাজাতে গিয়ে ঠোঁট ছড়ে যায়   সুরের রক্তে বাঁশি ভেজায়
জন্মদিনের জামা আমার

রক্তে যখন ভাসি
কেউ বলে সংসারী আমি কেউ বলে সন্ন্যাসী। (মূল্যায়ন)
ঐ যে বলছিলাম, অলোকরঞ্জনের বাঁশি।

উৎস : নতুন কবি সম্মেলন, ডিসেম্বর, ২০২০

‘বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য’ একটি অভিনব সাহিত্যের ইতিহাস

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

সাহিত্য জগতে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০)-এর প্রধান পরিচয় কবি হিসেবে। ছ-দশকেরও বেশি সময় ধরে কাব্যচর্চা করেছেন। অজস্র কবিতা লিখেছেন। বহু কাব্যগ্রন্থের জনক। অন্য ভাষার কবিতা অনুবাদ করেছেন। কিন্তু এর বাইরে বহু প্রবন্ধও লিখেছেন। সাহিত্য সমালোচনা করেছেন। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে সুবিখ্যাত অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় বিশিষ্ট সমালোচক-প্রাবন্ধিক রূপে। নানান বিষয়ের উপর প্রবন্ধগ্রন্থ আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের বই—বাংলা সাহিত্যের একাল ও সেকাল’ (১৯৬৮), ‘বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য’ (১৯৬৯), ‘শিল্পিত স্বভাব’ (১৯৭০), ‘স্থির বিষয়ের দিকে’ (১৯৭৬), ‘দিকে দিগন্তরে’ (১৯৮৬), ‘ভ্রমণে নয়, ভুবনে’ (১৯৮৮), ‘জীবনানন্দ’ (১৯৮৯), ‘দ্বিতীয় ভুবন’ (১৯৯১), ‘ঘূর্ণিস্রোতে সৃজনী সংরাগে’ (১৯৯১), ‘স্মরণার্থীর ঋতু ও শিল্পভাবনা’ (১৯৯৩), ‘সুন্দরের অভ্যর্থনা’ (১৯৯৭), ‘বিকল্প একটি বইমেলার চিঠি’ (১৯৯৮), ‘সমবায়ী শিল্পের গরজে’ (২০০০), ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ (২০০০), ‘শতবার্ষিকীর আলোছায়ায়’ (২০০০), ‘পুথিপট’ (প্রথম/দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০০/২০০২), ‘যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে’ (২০০১), ‘যুদ্ধের ছায়ায়’ (২০০৩), ‘পদ্ধতি ও খণ্ড মেঘ’ (২০০৪), ‘শেষ কথা কে বলবে’ (২০০৭), ‘রিখিয়া থেকে অনেক দূরে’ (২০০৭), ‘যে আছে অন্তরালে’ (২০১০), ‘রবীন্দ্র-আলোকবর্ষে’ (২০১২), ‘আড়ভাবুকের কড়চা’ (২০১৩), ‘স্মৃতি থেকে কয়েকটি ইথার’ (২০১৫) ইত্যাদি। এর মধ্যে যেমন সাহিত্য সমালোচনা আছে তেমনি আছে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, স্মৃতিধর্মী রচনাও। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশিষ্ট জায়গা করে নিয়েছে এই গদ্যগ্রন্থগুলি। এছাড়া ইংরেজি এবং জার্মানি ভাষায়ও বহু গ্রন্থ লিখেছেন তিনি।

গদ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে সমস্ত দিক থেকে স্বতন্ত্র ‘বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য’। এটি মূলত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বই। এহেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পূর্বাপর রচিত হয়নি। বাংলা সাহিত্য রচনার প্রচলিত ধারণাকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছেন লেখক। সাহিত্যের ইতিহাসও যে মৌলিক সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তা এই গ্রন্থটি না পড়লে বোঝা যাবে না। গ্রন্থের ‘নিবেদন’ অংশে লেখক বলছেন “একটি গ্রন্থখণ্ডের পরিসরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার এই উচ্চাশী প্রয়াসে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পুঞ্জিত তথ্যের ভিতর থেকে একটি স্বচ্ছ কাঠামো ফুটিয়ে তোলা। বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক ও আধুনিক অধ্যায়ের সমস্যা ঠিক এক নয়। প্রাচীন-মধ্যযুগীয় সাহিত্যে শাখাস্বল্পতার মধ্যে রূপকল্পের সন্ধান এবং অধুনাতন পয়ারের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের গহনে শিল্পীব্যক্তিত্বের অন্তর্লীন প্রবর্তনা অন্বেষণের

আগ্রহে বইটি লেখা হল।”

প্রাচীন-মধ্যকালীন-প্রাগাধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনা আছে এই গ্রন্থে। আধুনিক যুগের আলোচনা নেই। উল্লেখ করা দরকার তখন লেখকের বন্ধু দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৃত্তান্ত লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে প্রাচীন-মধ্য যুগের সাহিত্যকে যেভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, সেখান থেকে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে। গ্রন্থটিতে মোট সাতটি অধ্যায় আছে। সেগুলি এরকম

১	বাঙালির মন	
২	পশ্চাৎপট :	ক. মাতৃভাষা ও লিরিকের জন্ম
		খ. অন্ত্যমিলের জন্ম
৩	লোকযান : চর্য্যাগীতি	
৪	লোকযান ও লোকপুরাণ	
৫	উত্তরণ :	ক. বৈষ্ণব কবিতা
		খ. জীবনীসাহিত্য
৬	অবরোহণ ও স্বপ্নপ্রয়াণ	
৭	লোকায়তন :	ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
		খ. নাথ-সাহিত্য
		গ. গীতিকা
		ঘ. সংক্রান্তি

প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এরকম সূচিবিন্যাস ইতিপূর্বে আমাদের চোখে পড়েনি। ‘বাঙালির মন’ প্রবন্ধের প্রথমেই লিখছেন “বাংলা সাহিত্যে বাংলাদেশের হৃদয় মুকুরিত হয়েছে।” পরম্পরা এবং প্রভাবের সমন্বয়ে সৃষ্ট এই সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কে কীভাবে ‘বাঙালির মানস প্রকর্ষ’কে ঋদ্ধ করেছেন তা দেখিয়েছেন। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন অন্য ভাষায় রচিত সাহিত্যেরও বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তির কারণ। যেমন বলছেন—“তরু দত্তের ইংরেজি ও ফরাসি রচনা, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা যে অর্থে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত, জয়দেবের সংস্কৃত রচনাও তাই।”

‘মাতৃভাষা ও লিরিকের জন্ম’ প্রবন্ধটি একাধারে কবিতা এবং কবিতা বিষয়ক রচনা। তাঁর কবি-সত্তা প্রকট হয়ে উঠেছে এখানে। কবির অনুভূতি থেকেই লেখা যায়—“মাতৃভাষার মধ্যেই লিরিকের খনি।” শুধু সংস্কৃত সাহিত্য থেকে নয়, ইউরোপীয় সাহিত্য থেকেও উদ্ধৃতিসহ উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অলোকরঞ্জন বার বার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

কবি ও কাব্যের উৎস এবং অনুপ্রেরণাকে সর্বদা গুরুত্ব দিয়েছেন অলোকরঞ্জন।

'অন্ত্যমিলের জন্ম' অংশে তিনি বলেছেন, অপভ্রংশ কবিতা "মনে প্রাণে এবং প্রকাশ্যে সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রশান্ত ও মেদবহুল দেহাবয়বকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল" বলেই একটা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু প্রাকৃত কাব্য তা পারেনি। চর্যাগীতির কবিরা যে জৈন কবিদের কাছ থেকেই অন্ত্যমিলের ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এমন কথা আর কেউ বলেননি।

আমরা সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে সাধারণত লিরিকমাধুর্য এবং তত্ত্বভাবনাকে আলাদা করে দেখি। সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে আমরা দেখেছি চর্যার কাব্যমূল্য এবং তত্ত্বভাবনা পৃথক পৃথক আধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অলোকরঞ্জন তা করেননি। কারণ তিনি বলছেন—"চর্যা ও দোহার মধ্যে লিরিকমাধুর্য ও তত্ত্বভাবনা এমনভাবে মিশে আছে যে তাদের স্বতন্ত্র করা যাবে না"। এভাবে একটি সাহিত্যের সামগ্রিকতাকে ছুঁতে চেয়েছেন। চর্যাপদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে কিছু চর্যার আধুনিক বাংলায় রূপান্তর। আর সেই তর্জমাগুলি তিনিই করেছেন। একজন কবিই তো সঠিকভাবে রূপান্তরিত করতে পারেন তাঁর আগের সময়ের কবিতা। অলোকরঞ্জন তো একজন কবিই শুধু নয়, তিনি একজন অনুবাদকও। এখানে সবক্ষেত্রে নিজের তর্জমা ব্যবহার করেননি। অন্যের তর্জমাকেও গুরুত্বের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কৃত চর্য্যাপদের তর্জমাকে তাঁর আলোচনায় ব্যবহার করেছেন।

অনুবাদ সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্যের আলোচনা করেছেন 'লোকযান ও লোকপুরাণ' শীর্ষক অধ্যায়ে। তিনি মনে করেন মধ্যযুগে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ "নিছক ভাবান্তর না হয়ে নির্বাচিত আন্তর ভাষ্য" হয়ে উঠেছিল এবং লোকচেতনা ভক্তিবাদের অভিমুখী হতে পেরেছিল। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বাংলা সাহিত্যে 'লোকসভাশ্রিত সাহিত্য এবং রাজসভাশ্রিত সাহিত্য' আলাদা হয়ে যায়নি। মঙ্গলকাব্যের আলোচনায়ও নতুন একটা দিশা দেখিয়েছেন লেখক। তিনি বলছেন—"মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার পটভূমিতে আত্মরক্ষার পুরাণ, নিছক দেবদেবীর মহিমাজ্ঞাপক কাহিনী নয়। যে কাব্যে আত্মপ্রত্যয়হীন যৌথ চেতনা একটি ঐতিহাসিক-পৌরাণিক পটভূমিতে বিশ্বাসের অভীপ্সা নিয়ে আত্মসমর্পিত হয়েছে তাকেই মঙ্গলকাব্য বলা যেতে পারে।" দুটিমাত্র বাক্যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমগ্র মঙ্গলকাব্যের সারাৎসার প্রতিভাত। স্থানীয় মানুষের ঐহিক আলেখ্য হয়ে উঠেছে বলেই মঙ্গলকাব্যকে তিনি লৌকিক বা পৌরাণিক কোনো বিশেষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি।

বৈষ্ণব পদাবলির আলোচনায় তিনি বলেছেন, 'বৈষ্ণব ধর্ম বৈষ্ণব কবিতাকে কখনো প্রতিহত করেনি, বরং প্রবুদ্ধ করেছে"। ধর্ম বৈষ্ণব কবিতাকে আচ্ছন্ন করেনি বলেই অবৈষ্ণব কবিদের কাব্যও বৈষ্ণব কাব্যধারায় গৃহীত হয়েছে। 'অবৈষ্ণব জীবনবোধ' কীভাবে বৈষ্ণব

জীবনবাদে' পরিণত হয়েছে তার উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সঙ্গীতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের ফলেই বৈষ্ণব কবিতা অপরূপ হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরই পদ উদ্ধৃত করেছেন—"পূর্ণচাঁদের চেয়েও অপূর্ণচাঁদের মায়া যেমন বেশি তেমনই বিদ্যাপতির ভাষাও ব্যাখ্যাসর্বস্ব নয়, দ্যোতনাময়।" এই দ্যোতনাময়তাই ব্রজবুলির প্রাণ। বিদ্যাপতির কাব্যভাষা ব্রজবুলির জন্য কবি অলোকরঞ্জন যেন একটা সিংহাসন এগিয়ে দিয়েছেন। ব্রজবুলির মাহাত্ম্যকে তুলে ধরেছেন।

আবার নাথ-সাহিত্যের আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন ধর্মাশ্রয়িতা কীভাবে সাহিত্যসত্যকে অগ্রাহ্য করেছে। 'লোকায়তন' তথা গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের নাম 'সংক্রান্তি'। সপ্তদশ শতকে জাতীয় জীবনে যে অবক্ষয় সূচিত হয়েছিল তার প্রভাব সাহিত্যে কীভাবে পড়েছিল তার আলোচনা আছে এই পর্বে। সেদিক থেকে বড় বেশি ব্যঞ্জনাগর্ভ ও কাব্যধর্মী 'সংক্রান্তি' অধ্যায়ের এরকম নামকরণ। রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির আলোচনার পাশাপাশি এই অধ্যায়ে এসেছে কবিয়ালদের কথা। তখন কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ থেকে ধ্রুপদী মহিমা অপসারিত হচ্ছে। তার দরকারও ছিল বলে মনে করেছেন তিনি। "কেননা কবির লড়াই বা এই কবিগানের মধ্যেই প্রাচীন বিষয়গুলির প্রতি এক ধরনের কৌতুকাবহ মনোভাব পাওয়া গিয়েছিল, একথা যেমন সত্য, অন্যদিকে এই স্পর্ধিত লঘুগুরু সুরের কবিতার সাংবাদিকসুলভ সপ্রতিভতা সাহিত্যকে নতুন প্রস্থানভূমি দিতে পেরেছিল একথাও তেমনই সত্য।"

অসামান্য সব উপমার ব্যবহার করেছেন লেখক। যেমন, "জয়দেবের হাতে এই অন্ত্যমিল মন্দিরার মত বেজে উঠল"। আবার, "প্রতিটি কবিকর্মেরই যেমন একটি সমকালীন ও সর্বকালীন রূপ আছে; তেমনই তার মানচিত্রে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমারেখার মতই অন্যান্য উপায়ে স্বদেশভূমিক ও বিশ্বভূমিক এই যুগ্মরূপ প্রকাশিত।" কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিশেষণ হিসেবে বলছেন 'যুগবেদনার কবি'। এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। এ-তো একজন মরমী কবির উপমা। কবিরই গদ্য। মাঝে মাঝেই কবি অলোকরঞ্জন উঁকি দিয়েছেন প্রাবন্ধিক অলোকরঞ্জনের রচনায়। কবির অনুভবি বীক্ষা এই গ্রন্থে বিশেষ মাত্রা যোজনা করেছে।

সাহিত্যের এই রেখালেখ্য রচনা করতে গিয়ে পূর্বসূরি সাহিত্য-আলোচকদের কথাও এসেছে বারবার। দীনেশচন্দ্র সেনের অনুসরণ করেছেন বহুবার। তাছাড়াও শশিভূষণ দাশগুপ্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের প্রসঙ্গও এসেছে। এসেছে সাহিত্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাও।

এই গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ততা। আর সংক্ষিপ্ত বলেই প্রতিটি লাইনই ব্যঞ্জনাবহ। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তাশীল ভাষ্য আমাদের ভাবনাকে দীপিত করে। নতুন

নতুন চিন্তা উসকে দেয়। প্রাচীন ও মধ্যকাল এবং সেই সময়ের সাহিত্যকে তিনি যেন আবিষ্কার করতে করতে এগিয়েছেন। আর পাঠকও সেই আবিষ্কারের শরিক হয়ে উঠেছেন। সংহত গদ্যশৈলীর গুণে তাঁর মননশীল আলোচনাগুলিও সপ্রাণ সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিস্তার লক্ষ করা যায়। কিন্তু এখানে কোনো আলোচনাই দীর্ঘ হয়নি। এ গ্রন্থ যেন আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গবেষণার সারাৎসার। প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাসগুলির বিস্তারের একটি কারণ, সাহিত্যের বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এবং কাহিনির বিশ্লেষণ। আঙ্গিকের আলোচনা তুলনায় কম থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে কাহিনি তো সাহিত্য নয়। সাহিত্য হয়ে ওঠে। শুধু কাহিনি বিশ্লেষণ দিয়ে সাহিত-বিচার চলে না। অলোকরঞ্জন আলোচ্য গ্রন্থে কোনও কাব্যেরই কাহিনি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেননি। তিনি কাব্যের আঙ্গিক নিয়ে কথা বলেছেন। যে ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে সেগুলি রচিত হয়েছে কাব্য হয়ে উঠেছে তার ব্যাখ্যা করেছেন। উৎস এবং অনুপ্রেরণা নিয়ে কথা বলেছেন। আর তেমনটি সম্ভব হয়েছে তিনি একজন কবি বলে।

মান্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে অন্য ভাষার সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা সাধারণত থাকে না। কিন্তু এখানে বারবার এসেছে অন্য ভাষার সাহিত্যের প্রসঙ্গ। সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে কখনও কখনও অন্য কোনও সাহিত্য-সমালোচক বা গবেষকের মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু দেশি-বিদেশি অন্য সাহিত্যের প্রসঙ্গ আসেনি। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়ও যে তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের সুযোগ আছে তা অলোকরঞ্জনই দেখিয়েছেন। আর এভাবে তিনি আলোচিত সাহিত্যটির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছেন। আর তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি কোনও সীমা মেনে চলেননি। প্রতিতুলনায় উপনিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য, প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের কথা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে ইউরোপ-অ্যামেরিকা-জার্মানির সাহিত্যও। তিনি অনায়াসে বিচরণ করেছেন বিশ্ব-সাহিত্যের অন্দরে। বিশ্বসাহিত্য মন্থন করে কলম ধরেছেন। এই নাতিদীর্ঘ আলোচনায়ও বিশ্বসাহিত্যের সেই সম্ভার অনিবার্য্য চিহ্ন রেখেছে। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় সম্ভবত এর আগে এত বিদেশি সাহিত্যের প্রসঙ্গ আসেনি। গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিতুলনার অজস্র উদাহরণ। আর এভাবেই আলোচ্য গ্রন্থটি একটি আন্তর্জাতিক ছোঁয়া পেয়েছে।

প্রায় সমস্ত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলির সূচি বিন্যাস একই রকম। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য... ইত্যাদি এরকম নামে বিন্যস্ত হয় অধ্যায়গুলি। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের অধ্যায়গুলির নামকরণ একটু অন্যরকম। অধ্যায়গুলির নামকরণকে এতোটা গুরুত্ব দিতে অন্য কোনও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিনি। 'লোকযান', 'লোকপুরাণ', 'উত্তরণ', 'অবরোহণ ও স্বপ্নপ্রয়াণ', 'লোকায়তন', 'সংক্রান্তি' এহেন ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা অলোকরঞ্জনের স্বাতন্ত্র্যের আরেকটি চিহ্ন। নামকরণের মধ্যে নিহিত

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

রয়েছে আলোচকের বীক্ষা এবং আলোচনার অভিমুখ।

সাধারণত সাহিত্যের ইতিহাস এবং সাহিত্যের আলোচনা/সমালোচনা গ্রন্থকে এক শ্রেণিতে রাখা হয় না। দু-ধরনের গ্রন্থের আঙ্গিক আলাদা। আলাদা তাদের মেজাজ ও মনোবীজ। 'বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য' গ্রন্থটি একাধারে সাহিত্যের ইতিহাস এবং সাহিত্যের আলোচনা গ্রন্থ। সাহিত্যের ইতিহাসের সঠিক সংজ্ঞায় একে চিনে নেওয়া যায় কিন্তু বেঁধে রাখা যায় না। এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার নব নিরীক্ষা করেছেন লেখক।

অলোকরঞ্জন একাধারে কবি-প্রাবন্ধিক এবং একাডেমিসিয়ান। তাঁর এই আলোচনাগ্রন্থে একাডেমিক শৃঙ্খলা আছে। একাডেমিক সীমাবদ্ধতা নেই। তাই এই গ্রন্থের পাঠক শুধু একাডেমিক স্তরে আবদ্ধ নেই। সাহিত্যপ্রেমী-কবিতাপ্রেমী মানুষদেরও বিশেষ পছন্দের। সমুগ্ধ আলোচনার সঙ্গে যে যুক্তিনিষ্ঠা, তথ্যনিষ্ঠা এবং চিন্তাশীলতার কোনও দ্বন্দ্ব নেই, তা এই রেখালেখ্য পড়লে বোঝা যায়। সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন সাহিত্য পাঠের সানন্দ উপভোগ্যতার সঙ্গে, সহৃদয়তার সঙ্গে। আর এই সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর বিশ্লেষণী সিদ্ধান্ত। 'বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য' গ্রন্থটির সূত্রে সাহিত্য সমালোচনার এবং সাহিত্যের ইতিহাস রচনার একটি নতুন অভিমুখ খুলে দিয়েছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি

১৯৩৩ : জন্ম ৬ অক্টোবর, কলকাতা। বাবা বিভূতিরঞ্জন দাশগুপ্ত, মা নীহারিকা দাশগুপ্ত। থাকতেন ৫৫ বকুল বাগানে। ছোটবেলা কখনও কেটেছে রিখিয়ায়, কখনও ওড়িশার মদনপুর-রামপুরে, কখনও বা শান্তিনিকেতনে।

১৯৩৬-৪৪ : মহানির্বাণ রোডের বাড়িতে চলে আসা

১৯৪৫-৪৯ : শান্তিনিকেতনে যাত্রা। পরে চারুবালা দের বাড়ি "হৈমন্তিকা"য় উঠে আসা। নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে 'বিউটিফুল' শব্দের ঠিক ইংরেজি বানান বলে পাঠভবনে ক্লাস সিক্সে ভর্তি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, বিভুপ্রসন্ন সিংহের মতো জ্যোতিষ্কপ্রতিম মানুষ ছিলেন তাঁর শিক্ষক। শান্তিনিকেতনে পড়াকালীন অমর্ত্য সেন ও মধুসূদন কুণ্ডুকে নিয়ে প্রকাশ করেন 'স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকা। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন অজস্র কবিতা ও অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৪৯-৫০ : কলকাতায় এসে তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা। সেখান থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ইন্টারমিডিয়েটে। সেন্ট জেভিয়ার্সে বাংলা অনার্স না থাকায় প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে আসেন।

১৯৫১-৫৫ : প্রেসিডেন্সিতে পড়াকালীন 'শতভিষা', 'কৃত্তিবাস'-এ প্রকাশিত হতে থাকে কবিতা। 'রামতনু লাহিড়ি' সহকারী গবেষক হিসেবে গবেষণা শুরু। বিষয় ছিল 'ভারতীয় লিরিক রূপকল্পের উৎস ও ক্রমবিবর্তন'।

১৯৫৭ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা শুরু।

১৯৫৯ : সুরভি প্রকাশনী থেকে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যৌবনবাউল' প্রকাশিত।

১৯৬২ : গবেষণা কর্ম শেষ। প্রথম ইংরেজি গ্রন্থ 'দ্য লিরিক ইন ইন্ডিয়ান পোয়েট্রি' প্রকাশ।

১৯৬৪ : আধুনিক বিশ্বকবিতার অনুবাদ গ্রন্থ 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত' প্রকাশিত হয়।

১৯৬৫-৬৮ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান। সিমলার অ্যাডভান্সড

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজ-এ বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ। 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস'-এর প্রকাশ। আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কিত প্রদর্শনীর আয়োজক।

১৯৭১ : আলেকজান্ডার ফন বোল্ট রিসার্চ ফেলোশিপ পাওয়ার পর পশ্চিম জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু।

১৯৭২ : রবীন্দ্র-কবিতার অনুবাদ নিয়ে আলোকরঞ্জন ও শ্রীমতি কাইজারলিঙের কথাবার্তা।

১৯৭৩ : হোল্ফগাং ফন 'গেয়েটে ও রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'গোয়েটে অ্যান্ড টেগোর' প্রকাশ।

১৯৭৫ : জরুরি অবস্থার সময়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমন্ত্রণে অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে কলকাতার রাজভবনে যান। ট্রুডবার্টা হেসেলিঙার ও অলোকরঞ্জনের পরিণয়। দার্শনিক হানস গেয়র্গ গাদামারের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূচনা।

১৯৭৭-৭৮ : ইতালি ভ্রমণ। কবি এরিশ ফ্রিডের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

১৯৭৯ : রাশিয়ায় কবি ইয়েভতুশেংকোর সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা।

১৯৮২ : 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'জার্মানির চিঠি'র প্রকাশ শুরু।

১৯৮৪ : 'লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে' কাব্যগ্রন্থের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুধা বসু পুরস্কার অর্জন।

১৯৮৫ : বিশ্বনাগরিকতা, জার্মান বাংলা ভাবার মধ্যে পারস্পরিক অনুবাদ ও দুই দেশের সংস্কৃতির মেলবন্ধনের কারণে মিউনিখের গোয়টে ইনস্টিটিউট প্রদত্ত "গোয়টে" পুরস্কার গ্রহণ। অর্পণ করেন বিসমার্কের পৌত্র ক্লাউস ফন বিসমার্ক। জীবনব্যাপী সাহিত্য কৃতিত্বের জন্য আনন্দ পুরস্কার অর্জন।

১৯৮৬ : ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ব বইমেলায় বক্তৃতা বিষয়—ভারতবর্ষ।

১৯৮৭ : স্টুটগার্টের ইন্দো-জার্মান অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সাহিত্যকর্মের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার অর্জন।

১৯৮৮ : ইরাক থেকে আগত শরণার্থীরা আশ্রয় নেয় তাঁর জার্মানির বাড়িতে।

১৯৮৯ : ভিয়েনায় অস্ট্রিয়ার লেখক টোমাস বের্নহার্ডের সঙ্গে পরিচয়।

১৯৯১ : 'জীবনানন্দ' গ্রন্থের জন্য 'শিরোমণি' পুরস্কার অর্জন।

১৯৯২ : ইউনেসকোর সঙ্গে যুক্ত ন্যুরেনবার্গের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতি উপদেষ্টা। 'বাউলগানের মধ্যে দিয়ে জীবন' গ্রন্থের মাধ্যমে জার্মানিতে বাউলগানের প্রথম বিস্তৃত পরিচয়। 'মরমী করাত' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তি।

১৯৯৩ : জার্মানিতে ভারত উৎসবকে কেন্দ্র করে ডার্মস্টাট শহরে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারে কেন্দ্রীয় ভাষণ।

১৯৯৪ : জার্মানির ডায়লগ ইন্টারন্যাশনালের পরামর্শদাতার দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৯৬ : শান্তিনিকেতনে কাননবিহারী ভাষণমালায় তিনদিনব্যাপী বক্তৃতা।

২০০০-০১ : ভারতবর্ষে আয়োজিত জার্মান উৎসবে অংশগ্রহণ। জার্মান কবিতার প্রতিভূপ্রতিম থিম হিসেবে ছিলেন গুন্টার গ্রাস।

২০০২ : এসময় থেকে আরববিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সংস্থাকেন্দ্রে নান্দনিক অ্যাকাডেমিক বিনিময়ের যোজক ও পরামর্শদাতা। বার্লিনে প্রকাশ পায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' উপন্যাসের জার্মান অনুবাদ।

২০০৩ : সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত 'মিট দ্য অথর' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

২০০৪ : 'ধুলোমাখা ঈখারের জামা' কাব্যগ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক রবীন্দ্র পুরস্কার গ্রহণ।

২০০৫ : মুম্বইয়ে প্রবাসী ভারতীয় সম্মান। টুডবার্টা দাশগুপ্তের মৃত্যু।

২০০৬ : দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ বিষয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ব বইমেলায় সেমিনার পরিচালনা ও কবিতা পাঠ। কবি এলিজাবেথ গান্টারের সঙ্গে পরিচয়। 'দ্রৌপদী' প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

২০০৯ : বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ সংকলন গ্রন্থ 'মোজেইকস অফ আ রেনবো ব্রিজ'-এর প্রকাশ।

২০১১ : জোড়হাটে অসম সাহিত্য সভার অন্যতম অতিথি। আইসিসিআর সভাগৃহে দিলীপকুমার রায় স্মারক বক্তৃতা।

২০১২ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শিবনারায়ণ রায় ও বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে জীবনানন্দ দাশ স্মারক বক্তৃতা। শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাসভবনে রবিবাসর কেশবচন্দ্র গুপ্ত স্মারক পুরস্কার গ্রহণ। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ডে অসংখ্য ভাষণ প্রদান।

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

২০১৩ : শিলচরে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের পরিকল্পনা ও বক্তৃতা। শান্তিনিকেতনে নিখিল ভারতীয় আলোচনাচক্রে গীতাঞ্জলি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভাষণ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সভাগৃহে শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার সূচনা ভাষণ।

২০১৪ : পশ্চিম সরকার কর্তৃক নজরুল পুরস্কার প্রাপ্তি।

২০১৭ : মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক কবীর সম্মানে সম্মানিত।

২০২০ : জার্মানিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১৩৭৩ 'যৌবনবাউল' : সুরভি, কলকাতা, ১ম-প্রকাশ ১৯৫৯, পুনঃপ্রকাশ : প্রতিভাস, কলকাতা,

২০০৪ 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'; সুরভি, কলকাতা,

১৯৬৯ 'রক্তাক্ত ঝরোখা' : ভারবি, কলকাতা,

১৯৭৩ 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ' : আনন্দ পাবলিশার্স,

১৯৭৩ 'প্রতিদিন সূর্যের পার্বণ' : ভারবি, কলকাতা,

১৯৭৭ 'গিলোটিনে আলপনা' : প্রতীক, কলকাতা,

১৯৭৮ 'লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে' : প্রমা, কলকাতা,

১৯৮২ 'জবাবদিহির টিলা' : নাভানা, কলকাতা,

১৯৮৩ 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে' : নাভানা, কলকাতা, পুনঃপ্রকাশ — প্রতিভাস, কলকাতা,

১৯৮৪ 'দুই বন্ধু' : শতভিষা, কলকাতা,

১৯৮৪ 'এবার চলো বিপ্রতীপে' : আনন্দ পাবলিশার্স (১ম), কলকাতা,

১৯৮৫ 'ঝরছে কথা আতস কাচে' : নবার্ক, কলকাতা, (১ম)

১৯৮৮ 'ধুনুরি দিয়েছে টংকার' : এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, (১ম)

২০০৯ 'মরমী করাত' : প্রমা, কলকাতা, ১৯৯০, পুনঃপ্রকাশ — প্রতিভাস, কলকাতা,

১৯৯০ 'নিজস্ব এই মাতৃভাষায়' : রাণী. কলকাতা,

১৯৯১ 'আয়না যখন নিশ্বাস নেয়' : প্রমা, কলকাতা,

১৯৯৩ ‘রক্তমেঘের স্কন্দপুরাণ’ : প্রমা, কলকাতা, বইমেলা

১৯৯৪ ‘নদী ও রাত্রি বন্টন হয়ে গেলে’ : প্রমা, কলকাতা, বইমেলা

‘জ্বরের ঘোরে তরাজু কেঁপে যায়,’ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,

১৯৯৫ ‘এক-একটি উপভাষায় বৃষ্টি পড়ে’ : প্রমা, কলকাতা বইমেলা,

১৯৯৬ ‘তুষার জুড়ে ত্রিশূলচিহ্ন’ : আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,

১৯৯৭ ‘অস্তসূর্য এঁকে দিল টেম্পেরা : কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা,

‘মুণ্ডেশ্বরী ফেরিঘাট পার হতে গিয়ে’ : প্রমা, কলকাতা, ১৯৯৮

১৯৯৯ ‘ধুলোমাখা ঈথারের জামা’ : প্রমা, কলকাতা, পুনঃপ্রকাশ— প্রতিভাস, কলকাতা,

১৯৯৯ ‘এখনো নামেনি, বন্ধু, নিউক্লিয়ার শীতের গোধূলি’ : আনন্দ, কলকাতা,

‘শিকড়টুকু তবু মাটির ভিতরে সলতে’ : সৃষ্টি প্রকাশনী, কলকাতা,

২০০১ ‘শুনে এলাম সত্যপীরের হাটে’ : আরুণি পাবলিকেশনস, কলকাতা, কবিতা উৎসব

‘পাতালগ্যারাজ থেকে গাড়ি খুলে সূর্য্যের সফর’ : অনুষ্টুপ, কলকাতা,

২০০৬ ‘লেখার জায়গাটায়’ : দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা,

২০০৪ ‘ওষ্ঠে ভাসে প্রহত চুম্বন’ : এবং মুশায়েরা, কলকাতা,

২০০৬ ‘সমস্ত হৃদয় শুধু ভুকম্পপ্রবণ হয়ে আছে’ : কবিতীর্থ, কলকাতা,

২০০৮ ‘দুধে আলতায় কুয়াশায় আঁকা ছবি’ : পত্রলেখা, কলকাতা,

২০০৮ ‘গোলাপ এখন রাজনৈতিক’ : বিজল্প, কলকাতা,

২০০৯ ‘আলো, আরো আলো’ : অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা,

২০১০ ‘বয়সের ছাপ মুছে ফেলি বল্কলে’ : প্রতিভাস, কলকাতা,

২০১১ ‘প্রণীত অগ্নি কাকে বলে তুমি জানো?’ : কারিগর, কলকাতা,

২০১২ ’সে কি খুঁজে পেল ঈশ্বর কণা’ : অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা,

২০১৩ ‘নিরীশ্বর পাখিদের উপাসনালয়ে’ : অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা,

২০১৪ ‘এখন নভোনীল আমার তহবিল’ : অভিযান, কলকাতা,

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

২০১৫ ‘চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদের মতো’ : অভিযান, কলকাতা,

২০১৬ ‘দোলায় আছে ছ’পণ কড়ি’ : অভিযান, কলকাতা,

২০১৭ ‘তোমরা কী চাও শিউলি না টিউলিপ’ : অভিযান, কলকাতা,

২০১৮ ‘শুকতারার আলোয় পড়ি বিপর্যয়ের চিঠি’ : অভিযান, কলকাতা,

২০১৯ ‘ঝাউ-শিরীষের শীর্ষ সম্মেলনে’ : অভিযান, কলকাতা,

২০২০ ‘বাস্তুহারার পাহাড়তলি’ : অভিযান, কলকাতা,

কবিতা সংকলন ঃ

১৯৯৯ শ্রেষ্ঠ কবিতা : ভারবি, কলকাতা, ১৯৭৩

শ্রেষ্ঠ কবিতা। নবার্ক, কলকাতা, ১৯৮৫ স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা, অভিজাত, কলকাতা,

২০০১ শ্রেষ্ঠ কবিতা : প্রমা, কলকাতা,

২০০৫ কবিতাসমগ্র ১ : প্রমা, কলকাতা, ১৯৮৮ পুনঃপ্রকাশ — দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা,

২০০৭ কবিতাসমগ্র ২ : দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা,

১৪০১ সেরা ছড়া (অখণ্ড সংকলন) : বুকফ্রন্ট, কলকাতা,

আত্মচেতনার অন্তরাল সংলাপ ঃ

১৯৯৪ ছায়াপথের সান্দ্র সংলাপিকা : আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,

১৯৬৮ বাংলা সাহিত্যের একাল ও সেকাল : পাঠভবন,

১৯৬৯ বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে) : পাঠভবন,

১৯৭০ শিল্পিত স্বভাব : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা। পুনঃপ্রকাশ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, বইমেলা

১৩৯৩ স্থির বিষয়ের দিকে : আশা, ১৯৭৬

দিকে দিগন্তরে : এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা,

১৯৮৮ ভ্রমণে নয়, ভুবনে : আনন্দ, কলকাতা,

২০০৭ জীবনানন্দ : প্রমা, কলকাতা, ১৯৮৯ পুনঃপ্রকাশ দে’জ পাবলিশিং,

১৯৯১ দ্বিতীয় ভুবন : প্রমা, কলকাতা, ১৯৯১

ঘূর্ণিস্রোতে, সৃজনী সংরাগে : প্রতিভাস, কলকাতা,

১৯৯৩ শরণার্থীর ঋতু ও শিল্পভাবনা : আনন্দ, কলকাতা,

১৯৯৭ সুন্দরের অভ্যর্থনা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,

১৯৯৮ বিকল্প এক বইমেলার চিঠি : প্রজ্ঞা কলকাতা, পুনঃপ্রকাশ — প্রতিভাস, কলকাতা,

সমবায়ী শিল্পের গরজে : থীমা, কলকাতা, ২০০০

২০০০ আমাদের শান্তিনিকেতন : কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা,

২০০০ শতবার্ষিকীর আলোছায়ায় : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা,

২০০০ পুথিপট, (প্রথম খণ্ড) : নবায়ন,

পুথিপট, (দ্বিতীয় খণ্ড) : নবায়ন, ২০০৩

পুথিপট, (অখণ্ড), প্রতিভাস, কলকাতা,২০১১

২০০১ যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে : ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা, পুনঃপ্রকাশ — বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩

২০০৪ যুদ্ধের ছায়ায় : থীমা, কলকাতা, ২০০৩

পদ্ধতি ও খণ্ড খণ্ড মেঘ; বিকল্প, কলকাতা বইমেলা

শেষ কথা কে বলবে : পত্রলেখা, কলকাতা, ২০০৭

রিখিয়া থেকে অনেক দূরে : অলকানন্দা, কলকাতা, পুনঃপ্রকাশ অন্যদিগন্ত, ২০০৭

২০১০ যে আছে অন্তরালে : গাঙচিল, কলকাতা,

২০১২ রবীন্দ্র-আলোকবর্ষে : পত্রলেখা, কলকাতা,

২০১৩ আড়ভাবুকের কড়চা : প্রতিভাস, কলকাতা,

গদ্য সংকলন ঃ

২০০৭ গদ্য সমগ্র (১ম খণ্ড) : প্রতিভাস, কলকাতা

২০০৯ গদ্যসমগ্র (২য় খণ্ড) : প্রতিভাস, কলকাতা

জীবনীগ্রন্থ ঃ

১৯৯৮ গ্যোয়েটে : অরিজিৎ কুমার, কলকাতা

২০০৫ ছয় ঋতু ছয়লাপ : দিশা সাহিত্য, হাওড়া

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

সম্পাদিত গদ্যগ্রন্থ ঃ

২০১১ আধুনিক কবিতার ইতিহাস (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে) : বাকসাহিত্য, কলকাতা, ১৯৬৫, পুনঃপ্রকাশ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,

অনুবাদ গ্রন্থ ঃ

১৯৫৭ ভিনদেশী ফুল : শতভিষা, কলকাতা

১৯৬৩ আন্তিগোনে (সোফোক্লেস) : সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, (১ম)

১৯৬৭ স্বপ্ন (গুন্টার আইশ) : দীপায়ন, কলকাতা

১৯৬৯ চিদম্বর সঞ্চয়ন ১ এবং ২ (সুমিত্রানন্দন পন্থ) : জ্ঞানপীঠ

১৯৬৯ শংকরদেব (মহেশ্বর নেওগ) : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

১৯৭০ ঈথারদুহিতা (ফ্রিডরীশ হ্যোল্ডারলীন) : চিত্রক, কলকাতা

১৯৭২ দশটি জার্মান ছোটগল্প : প্রকাশক-রেবন্তীকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৭৭ অঙ্গীকারের কবিতা (ভোল্‌ফ বীয়ারমান) : অয়ন, কলকাতা

১৯৮০ ব্রেশটের কবিতা ও গান : প্রমা কলকাতা, (১ম), পুনঃপ্রকাশ — প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৮

১৯৮০ সুরদাস সঞ্চয়িতা : প্রমা, কলকাতা

১৯৮৩ প্রেমে পরবাসে (হাইনরীশ হাইনে) : নাভানা, কলকাতা

১৯৮৪ লুসিটানিয়ার কাকতাড়ুয়া (পেটার) হ্বাইসস) : প্রমা, কলকাতা

১৯৯১ এমন কি একফোঁটা জানালা (টিয়াস) : রাণী, কলকাতা

১৯৯২ নিয়তি ও দেবযান (হ্যোল্ডারলীন) : সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি

১৯৯৫ আবার দেখার তিন তরঙ্গ (বোঠো স্ট্রাউস) : প্রমা, কলকাতা

১৯৯৬ সারা কির্ণ-এর কবিতা : প্রমা, কলকাতা

১৯৯৭ প্রাচী-প্রতীচীর মিলনবেলার পুঁথি (গ্যোয়েটে) : প্রমা, কলকাতা, পুনঃপ্রকাশ — যুক্ত, বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১২

১৯৯৯ স্তিমিত সিংহাসন (ফ্রীডরিশ এঙ্গেলস) : নবায়ন

২০০০ মাক্স ও মোরিৎস এবং আরো চিত্রকথা (ভিল্‌হেল্ম বুশ) : থীমা, কলকাতা

২০০১ শেয়াল পণ্ডিত (গ্যোয়েটে) : এবং মুশায়েরা, কলকাতা

২০০২ গুন্টার গ্রাস-এর কবিতা, থীমা, কলকাতা

২০০৬ দুটি মহাকবিতা (ইয়েট/ এলিয়ট) : এবং মুশায়েরা, কলকাতা

২০০৭ স্রষ্টার দিনপঞ্জি (ব্রের্টোল্ট ব্রেশ্ট), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৭

২০০৭ বুড়ো নাবিকের উপকথা (কোলরিজ) : থীমা, কলকাতা

অনুদিত নাট্যকোলাজ ঃ

১৯৮৬ অতন্দ্র গোলাপ (রিলকে)। প্রমা, কলকাতা

১৪০২ রঙ্গমায়া পঞ্চমুখী, রাণী, কলকাতা

অনূদিত ছড়া সংকলন ঃ

১৯৬৯ সাতরাজ্যের হেঁয়ালি (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে)। পত্রিকা সিন্ডিকেট, কলকাতা

২০০৯ ছড়া খুঁজতে তেপান্তরে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ

২০১০ 'সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত,' নতুন সাহিত্য ভবন, কলকাতা, ১৩৬৯ পুনঃপ্রকাশ—দে'জ, কলকাতা

ইংরেজি গ্রন্থ ঃ

1962 The Lyric in Indian Poetry. Firma K. L. Mukhopadhayay– Kolkata.

1969 Brahma and Grass. (in collaboration with Roland Hindmarsh) Patrika Syndicate– Kolkata.

1973 Goethe and Tagore. South Asia Institute– University of Heidelberg– Delhi Branch.

1975 Roots in the Void. K. P. Bagchi– Kolkata.

1977 Buddhadeva Bose. Sahitya Akademi– New Delhi.

1996 The Mystical Saw and Other Poems. Edited with an introduction by Roland Hindmarsh– Sahitya Akademi– New Delhi.

2012 My Tagore, Nabayan– Kolkata– 1997 Reprint-Alakananda Publishers.

2004 The Shadow of a Kite. Das Gupta & Co. (p) Ltd. Kolkata.

ইংরেজি অনুবাদ ঃ

2007 Scripted on Silvery Wings, Bilingual edition of modern poems, Anya Diganta.

2009 Mosaics of a Rainbow Bridge, Dasgupta & Company Kolkata.

1974 Gangesdelata : Bengalische Gegenwartslyrik aus Indien und Bangladesh, Mithrsg. Lothar Lutze, Erdmann, Tubingen.

1975 Rabindranath Thakur : Spate Lyrik, (in deutscher Ubers.) Mitherausgeber, Lothar Lutze, Heidelberger Sudasien Texte.

1975 Kalkuttazyklus (Gedichte, in deutscher Ubers.) in Zusammenarbeit mit L Lutze, Heidelberger Sudasien-Texte II.

1977 Krishnader liebende Hirtengott (Religioaw Volksmalerei ostindiens). In Zusammenarbeit mit Trudberta Dasgupta, Bharatiya Sangha, Munchen.

1979 Terrakota Eines Schlafes (Gedichte in deutscher Ubers.) in Zusammenarbeit mit L. Lutze, Wolf Mersch, Freiburg.

1986 Gelobt Sei der Plau (Indische Lyrik der Gegenwart, Anthologie in deutscher Ubers.) Hrsg. Schneekluth, Munchen.

1986 Ganz unten wie Shesha, bin ich, Mitherausgeber : Lothar Lutze und D. Reimenschneider.

1987 Der andere Tagore, eine Werkauswahl, Hrsg. Wolf Mersch, Freiburg.

1992 Buddhadeva Bose-Monographien indischer Autoren (Makers of Indian Literature), Sahitya Akademi, Delhi.

1992 Leben in Liedern (Baulgedichte aus Indien und Bangladesh in deutscher Ubers.), Da verlag, Das Andere, Nurnberg.

1994 Der Konig und der Barde, Literarische Begegnung mit Indien, Essaysammlung, Weber Zucht & Co., Kassel.

1999 Die Mystische Sage (Marami Karat), Gedichte aus dem Bengalischen in deutscher Ubersetzung von Hans Harder und Christian Weib, Bonner Siva Series, Bonn.

2002 Der Widerlaufer (Roman Pratidwandi von Sunil Gangopadhyay in deutscher Ubersetzung), Lotos Verlag, Berlin.

2008 Goethe and Tagore- Eine Vergleichende Studie, aus dem Englischen ubersetzt von Katja Warmuth, Draupadi Verlag, Heidelberg.

2011 Mein Tagore-Eine Annaherung an den indischien Dichter Rabindranath Tagore, Draupadi Verlag, Heidelberg.

উৎস : কৃত্তিবাস, জানুয়ারী

ISSN : 2394-4889 *Sahitya Angan* Vol : VI, Issue : XIV

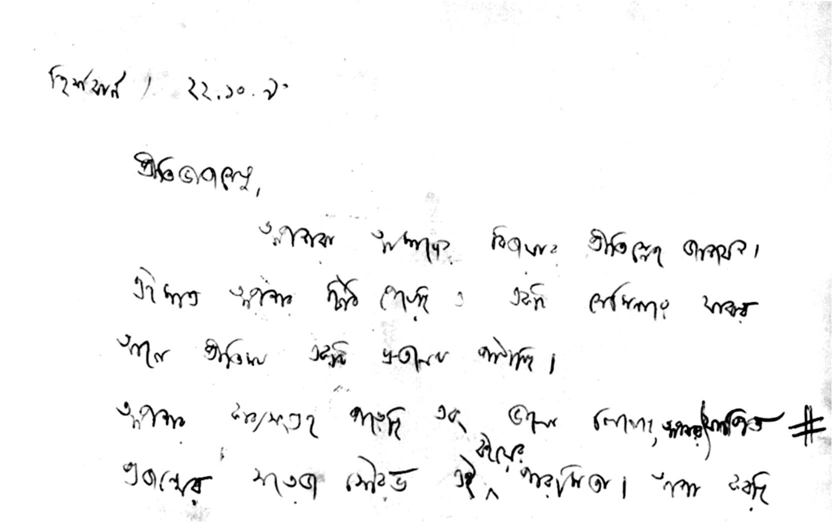

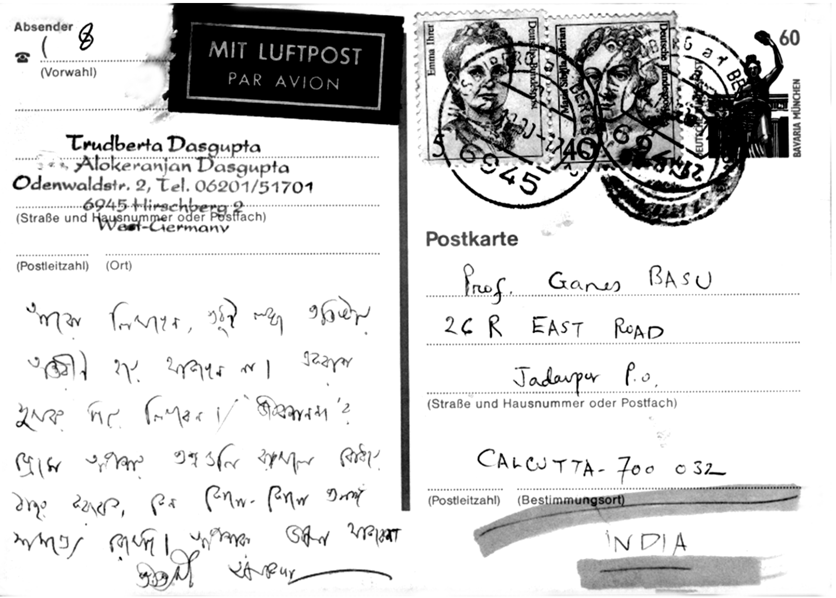
Absender
(Vorwahl)
MIT LUFTPOST
PAR AVION
Trudberta Dasgupta
Alokeranjan Dasgupta
Odenwaldstr. 2, Tel. 06201/51701
6945 Hirschberg 2
West-Germany
(Straße und Hausnummer oder Postfach)
(Postleitzahl) (Ort)
60
BAVARIA MÜNCHEN
Postkarte
Prof. Ganes BASU
26 R EAST ROAD
Jadavpur P.O.
(Straße und Hausnummer oder Postfach)
CALCUTTA-700 032
(Postleitzahl) (Bestimmungsort)
INDIA

গৌরাঙ্গপুর [illegible]

ভাই জ্ঞানেশ,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] আমাদের ছোট্ট ছুটি চলছে — সেজন্যে সম্ভবত টেলিফোনে আপনার পাইনি।

আমি আগামী সপ্তাহে ফিরবো ভাবছি। ও-সপ্তাহে শেষ দিকে শুক্রবার/শনিবার সকালে যদি আমার বাড়িতে আসতে পারেন, আপনার কাছে উল্লিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে।

আমাদের দেশীয় বক্তব্য [illegible] সমর্থন করি, [illegible] করি। কিন্তু সংস্কৃতের এ-সংক্রান্ত 'সাহিত্যশাস্ত্র'-এ সিদ্ধান্ত কেন আমরা সবাই তেমন [illegible] জানালেন না? সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি অবশ্য [illegible]।

আশা করি সমস্ত কুশল।

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।

প্রীতি নিও

[illegible]

पोस्ट कार्ड
POST CARD
साथ का कार्ड जवाब के लिए
THE ANNEXED CARD IS INTENDED FOR THE ANSWER
केवल पता
ADDRESS ONLY

INDIA
6 nP भारत

শ্রীজ্ঞানেশ [illegible]
পি-৩৮৮, বাঁশদ্রোণী পার্ক
বাঁশদ্রোণী
২৪ পরগনা
24 Parganas / West Bengal

২৬.৪.৭৮

ভাই জ্ঞানেশ,

আপনাকে আমাদের শুভ নববর্ষ জানাচ্ছি।

[illegible] আপনার এই [illegible] জেনেছি, ঠিক সঠিক বলতে পারব না। তবে যদি সম্ভব হয় দেখা হবে।

আমার 'The Lyric in Indian Poetry' (প্রকাশক Firma K. L. Mukhopadhyay / [illegible] / [illegible]: 6/1-A Banchharam Akrur Lane, Cal-12) এবং '[illegible]' ([illegible]) ও '[illegible]' ([illegible]) — এ তিনখানি বইতে আমার প্রশ্নগুলির নিরসন আছে।

'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের [illegible] প্রথম [illegible]। [illegible] 'বলাকা' [illegible], এবং প্রাচীন [illegible] — [illegible] প্রাচীন [illegible] নেই। [illegible] বলতে পারছি নে।

LUFTPOSTLEICHTBRIEF
AEROGRAMME

S

INDIA

Mr. Ganesh Basu
P-388 Bansdroni Park
Bansdroni
24 Parganas / West Bengal

MIT LUFTPOST
PAR AVION
BY AIR MAIL

7900 Ulmer Münster

2. Falz 2ème pliage 2nd fold

Der Luftpostleichtbrief darf nach Vorschrift des Weltpostvertrages keine Einlagen enthalten.
Il est interdit de joindre des annexes. No enclosures allowed.

Absender:
Expéditeur:
Sender:
Alokeranjan Dasgupta
79 ULM / DONAU
Amselweg 44
West Germany

BANSDRONI 12.15 3-5-78

1. Falz 1er pliage 1st fold

Raum für weitere Mitteilungen ▼ Place pour d'autres informations ▼ Additional writing space

[illegible]

অলোকরঞ্জন

79 ULM / DONAU
Amselweg 44
West Germany

৩.১২.৭৮

প্রিয় গণেশ,

আমার চিঠি পেয়ে তোমার [illegible] বৃত্তান্ত জানালে। [illegible] চিঠি [illegible], [illegible]।

[illegible]

অলোকরঞ্জন